শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

পঞ্চদশ ভাগ

গুরুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

পঞ্চদশ ভাগ

[জানুয়ারী, ১৯৫৮—ডিসেম্বর, ১৯৬০]

গুরুপ্রিয়া দেবী

প্রকাশকের কথা

শ্রীশ্রীমায়ের অনুগ্রহে শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবী (দিদি) লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" গ্রন্থের পঞ্চদশ ভাগ প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান গ্রন্থে ১৯৫৮ সন হইতে ১৯৬০ সন পর্যন্ত সম্পূর্ণ তিন বৎসরের শ্রীশ্রীমা'র লীলাকথা স্থান পাইয়াছে।

অনিবার্য্য কারণ বশতঃ বর্ত্তমান ভাগের প্রকাশনে বিশেষ বিলম্ব হইয়াছে, সেজন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

কাগজের দুর্ম্ল্যতা এবং বর্ত্তমান ভাগের কলেবরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি। আশা করা যায় পরবর্ত্তী ভাগগুলির প্রকাশন যত শীঘ্র সম্ভব হইতে পারিবে।

শুভ মহালয়া
সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

বিনীত—
প্রকাশক

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

পঞ্চদশ ভাগ

৩রা জানুয়ারী ১৯৫৮।

মা উপস্থিত এটোয়াতে আছেন। সংবাদ পাইলাম যে আজই ভোরে মা'র এটোয়া হইতে রওনা হইয়া দুপুরে কানপুর যাইবার কথা। সেখান হইতে বিকালে হরিদ্বার রওনা হইবার কথা। মা সম্ভবতঃ কয়েকদিনের জন্য একবার আনন্দকাশী যাইবেন। রাজমাতা বিশেষ ভাবে মাকে অনুরোধ জানাইতেছিলেন।

৭ই জানুয়ারী ১৯৫৮।

আনন্দকাশী হইতে পরমানন্দজীর চিঠি আসিয়াছে।

মা গত ৪ঠা সকালে হরিদ্বার পৌঁছিয়া যোগীভাইয়ের ধর্মশালায় যান। ভোগের পর একটু বিশ্রাম করিয়া বেলা ৫॥০ টায় মা মোটরে আনন্দকাশী রওনা হইয়া গিয়াছিলেন। টিহরীর রাজমাতা মা'র জন্য পূর্ব হইতেই সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

রমাদি এবং তাঁহার ছোট বোন কমলাও মা'র সঙ্গে আনন্দকাশী গিয়াছে। খেওড়া হইতে সতীশবাবুও শুনিলাম আনন্দকাশী গিয়াছেন। তাঁহার ডাক নাম 'ফেলা'। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া মা'র ছোট বেলার অনেক কথা হয়।

আনন্দকাশীতে গিয়াই মা একটি স্ত্রীলোককে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন ইতিমধ্যে আরও একজন পুরুষকেও দেখিয়াছেন। রাজমাতার নিকটেও মা উহাদের আকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন।

১২ই জানুয়ারী ১৯৫৮।

অনেক দিন পর আজ আবার মা'র সংবাদ পাইলাম। মা আনন্দ-কাশীতে বেশ ভালই আছেন। ইতিমধ্যে দেরাদুন হইতে কন্যাপীঠের ছোট ছোট মেয়েরা মা'র দর্শনের জন্য যোগেশদার সঙ্গে গিয়াছিল। পরদিনই আবার মা তাহাদের দেরাদুন পাঠাইয়া দিয়াছেন।

১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৮।

আজ হঠাৎ সংবাদ পাইলাম যে কাশীতে দিদিমার শরীরটা বিশেষ খারাপ শুনিয়া মা গত ১৩ই বিকালে আনন্দকাশী হইতে হরিদ্বার আসিয়া কাশী রওনা হ'ন। পরশু সন্ধ্যায় মা কাশী গিয়া পৌঁছিয়াছেন। দিদিমা উপস্থিত পূর্বাপেক্ষা ভালই আছেন।

১৯শে জানুয়ারী ১৯৫৮।

কাশীর পত্রে জানিলাম যে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন আশ্রমে মা'র উপস্থিতিতে বেশ ভালো মতই উৎসব হইয়াছে। সকাল হইতে কুমারী মেয়েরা অখণ্ড নাম রক্ষা করিতেছিল।

মায়ের উপস্থিতিতে
কাশী আশ্রমে
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি।

গত ১৬ই সকালে শ্রীশংকর ভারতীজী মা'র দর্শনের জন্য আসিয়া-

ছিলেন। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত, জ্ঞানী, তপস্বী ও সাধক সন্ন্যাসী। অনেকের-ই মতে বর্তমানে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ পণ্ডিত খুবই দুর্লভ। শংকর ভারতীজী মা'র সঙ্গে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল নিজের সাধনার কথা এবং সাধন পথে যে নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই সব বিষয়ে কথা বলিলেন। কথা বলিবার সময় সেখানে শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়, ভারতীজীর আশ্রিত ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ও তাহার ভাই উপস্থিত ছিলেন।

ঐ দিন দুপুরবেলাই স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজীও মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও অনেক কথা-বার্তা বলিলেন। তিনি তন্ত্র শাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং জপসূত্রের রচয়িতা। অনেক দিন পূর্বে মা'র সঙ্গে তাঁহার কলিকাতায় একবার দেখা হইয়াছিল। কিন্তু লোকের ভীড়ে আর কোনও কথা হয় নাই। এবার মা'র সঙ্গে কথা-বার্তা হওয়ায় তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

পরদিন ভারতীজীর শিষ্য ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদও আসিয়া মা'র সঙ্গে সাধন-ভজন সম্বন্ধীয় অনেক কথা বলিয়াছেন। গুরুর ন্যায় শিষ্যও তপস্বী ও সাধক।

মা'র শরীর কয়েকদিন হয় বিশেষ ভাল যাইতেছিল না। পেটে একটা ব্যথা চলিতেছিল। সেই জন্য সব সময় কাহারো সঙ্গে বড় দেখা-ও করেন নাই।

আগামী ২৪শে ৺সরস্বতী পূজা। এবার এলাহাবাদের ভক্তেরা সেখানে শ্রীযুক্ত গোপাল স্বরূপ পাঠকের বাড়ীতে পূজার আয়োজন করিয়াছেন। মা-ও উপস্থিত থাকিবেন সকলে আশা করিতেছেন।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৫৮।

এলাহাবাদ হইতে চিঠি আসিয়াছে। মা গত ২৩শে সন্ধ্যায় মোটরে এলাহাবাদ পৌঁছিয়াছেন। মা শ্রীযুক্ত পাঠকের বাড়ীতেই ছিলেন। ২৪শে

বেশ ধুমধাম ও আনন্দের সহিত মা'র উপস্থিতিতে পূজা সম্পন্ন হইয়াছে। কাশী আশ্রম হইতে কন্যাপীঠের মেয়েরা-ও সব মা'র সঙ্গে এলাহাবাদ গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত পাঠকের একটি বিশেষ ঘটনা।

শ্রীযুক্ত পাঠক মাকে এবার পূজার সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা শুনাইলেন। এবার তিনি যখন ভারত সরকারের পক্ষ হইতে U.N.O.-তে প্রতিনিধিত্ব করিতে গিয়াছিলেন তখন আমেরিকায় একদিন স্বপ্নে দেখেন যে খুব উজ্জ্বল একটি স্থান। সেখানে মা-ও উপস্থিত। মা'র খুবই উজ্জ্বল এবং জ্যোতির্ময়ী রূপ। মা'র সঙ্গে অপর আরও একটি দেবী মূর্তি। তখনই তাঁহার মনে সংকল্প হইল যে এবার তাঁহার বাড়ীতে মা'র উপস্থিতিতে ৺সরস্বতী পূজা করিতে হইবে। সকলেই এই দর্শনের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন।

শ্রীযুক্ত গোপালঠাকুর মহাশয়ের আশ্রমেও ৺সরস্বতী পূজা হইয়াছে। সেখানেও মাকে বিশেষ সমাদর করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

২৯শে জানুয়ারী ১৯৫৮।

মা এলাহাবাদে চার দিন থাকিয়া গত ২৭শে সন্ধ্যায় কাশী ফিরিয়া আসিয়াছেন। মা'র সঙ্গে শ্রীযুক্ত পাঠকজীর তিন কন্যাও আসিয়াছে।

আমিও ইতিমধ্যে বম্বে হইতে সোজা কাশী ফিরিয়া আসিয়াছি। এতদিন পরে মা'র চরণে আসিয়া মিলিত হইতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

আজ দুপুরে খাওয়ার পরে মা দিল্লী এক্সপ্রেসে মোগলসরাই হইতে রাজগীর রওনা হইলেন। মা'র সঙ্গে গেলেন দিদিমা, পরমানন্দ স্বামী ও

বিমলা। বখ্‌তিয়ারপুর স্টেশনে নামিয়া সেখান হইতে মা'র মোটরে রাজগীর যাওয়ার কথা। মা'র গাড়ীটি আজই রাজগীর পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

মা'র আদেশে আজ আমিও রাজগীর আসিয়া পৌঁছিলাম। আশ্রমটী খুবই ছোট—লোকে লোকারণ্য। অধীরবাবু আসিয়া তাঁহার মোটরে আমাদের লইয়া গেলেন। বখ্‌তিয়ারপুর হইতে রাজগীর মাত্র ৩৩ মাইল দূর। রাত্রি প্রায় ১০টায় মা'র কাছে গিয়া পৌঁছিলাম।

শুনিলাম অধীরবাবু মা'র বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বিহার সরিফের S. D. O। খুবই কর্ম্মিৎকর্মা। মা'র সঙ্গীয় সকলের সুবিধার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। আশ্রমের কোনও Boundary wall ছিল না। অধীরবাবুর কার্যতৎপরতায় এই সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। বাস-স্টেশন হইতে আশ্রম পর্যন্ত বেশ সুন্দর রাস্তা তৈয়ার করাইয়া দিয়াছেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

ইতিপূর্বে একদিন উদাসী সম্প্রদায়ের দুইজন সাধু শ্রীমৎ হংস মহারাজ ও শ্রীকুটস্থানন্দজী মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। মাকে তাঁহাদের আশ্রমেও লইয়া গিয়াছিলেন এবং বিশেষ সমাদর করিয়াছেন।

আশ্রমের আঙ্গিনায় খাওয়ার জন্য একটি স্থান বাঁধান হইতেছিল। সেখানে কয়েকটি বেগুন গাছ ছিল। উপেন মহারাজ বেশ যত্নসহকারে ঐ গাছগুলিতে জল দিতেন। মা প্রথমেই বলিয়া দিয়াছেন যে গাছগুলির ওপর যেন মাটি চাপা দেওয়া না হয়। কিন্তু বিশেষ খেয়াল না করায় মজদুরেরা মাটি ফেলিতে ফেলিতে গাছগুলিকে চাপা দিয়া দিল। দুইদিন পরের কথা। মা শুইয়া আছেন। হঠাৎ বাহিরে আসিয়া মজুরদের সেই স্থানটি খুঁড়িতে বলিলেন। বলিলেন,—"শীঘ্র খোঁড়। বেগুন গাছগুলো কাঁদছে।" পরে মা'র মুখে শুনিলাম, গাছগুলি আসিয়া মা'র নিকট বলিতেছিল,—"আমাদের বাঁচাও।"

রাজগীর আশ্রমে একটি অলৌকিক ঘটনা।

যখন মাটী সরান হইতেছে তখন পরমানন্দ স্বামিজী বলিলেন,—'মাটি সরাইয়া কি হইবে? গাছগুলি হয়ত মরিয়া গিয়াছে।' কিন্তু আশ্চর্য খুঁড়িবার পরে দেখা গেল গাছগুলি সেই মতই আছে; মরে নাই। মা নিজেই কতগুলি টব ঠিক করাইয়া রাখিয়াছিলেন। গাছগুলিকে উঠাইয়া বড় বড় টবে লাগান হইল। মা বলিলেন,—"গাছগুলি ফল দিক্ আর না দিক্, প্রাণ ত বাঁচবে। সাধু ব্রহ্মচারীরা এতদিন পর্যন্ত জল দিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এ শরীরের কথাতেই ঐ জায়গাটাতে মাটী ভরাট করবার কথা হয়েছিল। তাই এই শরীরই ওদের যেরূপ গতি তাতে বাধা দিল।"

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বের আর একটি ঘটনা। কাশী আশ্রমের আঙ্গিনার পূর্ব দিকের কোনে টবের মধ্যে একটি আনারসের মাথা পুঁতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জল, হাওয়া ও সূর্যের প্রভাবে উহার মধ্য হইতে একটি গাছ বাহির হইয়াছিল। আশ্রমের মিস্ত্রিদের কাজ-কর্মের সময় অসাবধানতা বশতঃ গাছটির উপরে অনেকগুলি ইট পড়ায় গাছটি চাপা পড়িয়া যায়। তাহা কিন্তু কেহই লক্ষ্য করে নাই।

আরও একটি অনুরূপ ঘটনা।

একদিন দুপুরে মা শুইয়া শুইয়া দেখিতেছিলেন, আনারস গাছটি মা'র নিকটে আসিয়া বলিতেছে যে তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিলেন,—"শীঘ্র এই জায়গাটি খোঁড়। এখানে একটা গাছ ছিল। আমার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে।"

মা'র কথায় আমরা সকলে অবাক্ হইলাম। মনে পড়িল, সত্যই ত, ওখানে ত একটি আনারস গাছ ছিল। ইঁটগুলি সরাইবার পর দেখা গেল, গাছটি তখনো মরে নাই। আশ্চর্য! মা'র কৃপায় এ যাত্রা তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। এইভাবে সর্বদাই সূক্ষ্মে মা'র নিকট, কত বৃক্ষ, লতা, পাতা, পশুপক্ষী, জীবজন্তু, সাধু-মহাত্মা, দেবদেবী আসিয়া তাহাদের সব অভাব অভিযোগের কথা জানাইতেছে, তাহার কি ঠিক আছে? আমরা তাহার শতাংশের একাংশও হয়ত জানিতে পারি না।

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

আজ মা'র কাশী ফিরিবার কথা। সকাল বেলা অধীরবাবুর মোটরে মা পাটনা আসিয়া মায়াদির বাসায় ভোগ গ্রহণ করিলেন। বেলা একটার সময় আপার ইণ্ডিয়া একস্‌প্রেসে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় মা কাশী আসিয়া পৌঁছিলেন।

রাজগীরে থাকা-কালীন মাকে একদিন স্থানীয় ইণ্টার কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে লইয়া গিয়াছিল। কলেজের কর্তৃপক্ষ কলেজের নাম মা'র নামে পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজগীর হইতে পাটনা আসিবার পথে নালন্দার Curator শ্রীযুক্ত সাক্সেনা মাকে তাঁহার বাড়ীতে অল্প সময়ের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

দুপুর বেলা ভোগের পরে মা দোতলার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নীচে মিসেস্ শিবদাসানী, রমা, কমলা, বেবী প্রভৃতি অনেকেই দাঁড়াইয়া মা'র দর্শন করিতেছে। মিসেস্ শিবদাসানীর অনেকদিন যাবৎ-ই তামাক খাওয়ার অভ্যাস। এই জন্য সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই তামাকের সাজ সরঞ্জাম রাখেন। একটি চাকরও আছে তামাক সাজিয়া দিবার জন্য। আশ্রম বা আশ্রম সংলগ্ন বাড়ীতে ধূমপান নিষিদ্ধ। কিন্তু মিসেস্ শিবদাসানী ধূমপান না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই তিনি আশ্রমের বাহিরে গিয়া অন্য বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

মা মিসেস্ শিবদাসানীকে বলিলেন,—"এই হুকা তোমাকে আশ্রম ছাড়াইতেছিল। তুমি এইটাকে ছাড়িয়া দেও। যে তোমাকে আশ্রম ছাড়ায়—সৎসঙ্গ ছাড়ায় তাহাকে রাখিতে নাই। তুমি ওটা এখানে নিয়া এসো। এই শরীর দেখুক। তারপরে প্যাক করিয়া কোনও বাড়ীতে রাখিয়া দেওয়া যাইবে।"

মা'র আদেশে তিনি বেশ সরল ভাবে হুকাটা নিয়া আসিয়া সম্মুখে রাখিলেন। সঙ্গে টিনে ভরা তামাকও ছিল। মা সব দেখিলেন এবং প্যাক করিয়া ডাঃ গোপাল দাদার বাসায় রাখিয়া আসিতে বলিলেন। ভদ্রমহিলা মাকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন,—"মা, আশীর্বাদ কর যেন এই সব আপনার কৃপায় ত্যাগ করিতে পারি।"

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

কাশী আশ্রমে শিবরাত্রি।

আজ মহাশিবরাত্রি। গত দুই বৎসর মা শিবরাত্রির সময় বৃন্দাবনে ছিলেন। এবার মা কাশীতে আছেন। এই উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত আসিয়া একত্রিত হইয়াছে।

সকাল হইতেই পূজার আয়োজন চলিতেছে। কেহ বেলপাতা বাছিতেছে, কেহ দূর্বা সাজাইতেছে, কেহ পূজার বাসন ঠিক করিতেছে, সারা আশ্রমটি যেন প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যা ঠিক সাতটা হইতে পূজা আরম্ভ হইল। মা নিজে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব ঠিক করিয়া দিতেছেন, কে কোথায় পূজায় বসিবে। এবার পূজকের সংখ্যা এত বেশী যে স্থানাভাব হইয়াছে।

চার প্রহরের পূজা চলিল। মা স্বয়ং-ই ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে আনন্দ দান করিতে লাগিলেন। কেহই যেন উপবাস কিংবা রাত্রি জাগরণের জন্য কোনও কষ্ট-ই বোধ করিল না।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

আজ আশ্রমে প্রায় দুই শত ভক্ত প্রসাদ পাইল। যাহারা যাহারা কাল উপবাস করিয়াছিল এবং পূজায় যোগদান করিয়াছে সকলেই আশ্রমে প্রসাদ পাইল।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

আজ সকাল এগারটায় শ্রীবিনোবা ভাবের প্রধান সহকর্মী শ্রীদাদাজী ধর্মাধিকারী, শ্রীসুরেনজী এবং শ্রীমতি বিমলাবেন মায়ের দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন।

মা কথায় কথায় বলিলেন,—"এই শরীরটা যখন সবরমতি আশ্রমে গিয়াছিল তখন বাপুজী এই শরীরটার কাঁধের ওপর আদরের সঙ্গে মাথা

রাখিয়া বলিয়াছিল—"তুমি বাজাজকে এমন কি দিয়াছ যে সে আমার নিকট থাকিয়াও যে শান্তি পায় নাই, তাহা তোমার নিকট পাইয়াছে?"

মা আরও বলিতে লাগলেন,—"রায়পুরে থাকিবার সময় বাজাজ এই শরীরটার সঙ্গে আসিয়া দেখা করে। দেখা করার পর হইতে আর যাইতে চাহিল না। ক্রমে ১ দিন, ২ দিন, ৭ দিন, ১৫ দিন করিয়া এক মাস থাকিয়া গেল। একমাস পরে-ও শরীরটাকে আর ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। পরে এই শরীর-ই- বলিয়া কহিয়া বাপুর কাছে তাহাকে পাঠাইয়া দিল। সেই শেষ। রায়পুর আশ্রমের পশ্চিম দিকের জমিটি সে নিয়াছিল। ইচ্ছা ছিল সেখানে একটি কুটিয়া করিয়া থাকিবে ও সাধন ভজন করিবে। বাজাজ শরীর ত্যাগ করিলে তাহার ছেলে কমল-নয়ন ও স্ত্রী জানকী বাই—ঐ জমিটি আশ্রমকে দিয়া দেয়। পরে একজন তাহার ছেলের স্মৃতি কল্পে তাহার উপর একটি সাধন কুটির তৈয়ার করিয়াছে।" এইরূপ আরও অনেক কথা মা তাঁহাদের বলিলেন। মা'র সঙ্গে কথা বলিয়া তাঁহারা খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

আজ সন্ধ্যায় আপার ইণ্ডিয়া একস্প্রেসে মা বৃন্দাবন রওনা হইলেন। হাথরাসে নামিয়া মোটরে যাইবার কথা।

কাশী স্টেশনে মা।

স্টেশনে মা বসিয়া আছেন। গাড়ী কিছু লেট। এমন সময় একটি ছেলে চুড়ি বিক্রী করিতে করিতে মা'র কাছে আসিলে মা তাহার হাত হইতে সব চুড়িগুলি নিয়া মেয়েদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। পরে ছেলেটির চুড়ির দাম কোনও একজন ভক্ত দিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে এক ডালা কমলালেবু ও কলা আনিয়া

মা'র সম্মুখে রাখা হইল। মা তাহা-ও উপস্থিত সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে গাড়ী আসিয়া পড়িল। গাড়ীর ভিতরে গিয়া মা বসিলেন। দরজার সম্মুখে বহু নরনারী দাঁড়াইয়া আছে। অনেক পুলিশও মায়ের দর্শনের জন্য দাঁড়াইয়া আছে। লোকের ভীড় দেখিয়া ও সঙ্গে পুলিশ প্রভৃতি দেখিয়া বাহিরের লোকে মনে করিল কোন গোলমাল হইয়াছে বোধ হয়। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সকলে মাকে বারবার প্রার্থনা জানাইয়া দিল, মা যাহাতে বাসন্তী পূজার সময় পুনরায় কাশীতে আসেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

বৃন্দাবন হইতে চিত্রার পত্রে মা'র সংবাদ পাওয়া গেল। গত ২২শে সকালে মা বৃন্দাবন ভাল মত পৌঁছিয়াছেন। হাথরাস স্টেশনে মথুরার ভার্গবজীর গাড়ী উপস্থিত ছিল। পথে এলাহাবাদ ও কানপুরে মা'র দর্শনের জন্য অনেকে আসিয়াছিল। কানপুর হইতে হাথরাস পর্যন্ত শ্রীযুক্ত পাল সাহেব মা'র সঙ্গে আসিয়া আবার লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া যান।

গত পরশু মা'র উপস্থিতিতে বিদ্যাপীঠের কয়েকটি ছেলের উপনয়ন ভালভাবে হইয়া গেল।

মা হরিবাবাজীর সৎসঙ্গে নিয়মিত ভাবে তিন বার যাইতেছেন।

৩রা মার্চ ১৯৫৮।

বৃন্দাবনের পত্রে জানিলাম, হোলিতে সকলেই খুব আনন্দ করিয়াছে। মা নাকি এবার খুব রং খেলিয়াছেন। সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া রং দিয়াছেন। মা'র শরীর ভালই আছে।

হোলির এক সপ্তাহের মধ্যেই মা'র হরিবাবার সহিত হোসিয়ারপুর যাইবার কথা।

৯ই মার্চ ১৯৫৮।

বুনির চিঠি আসিয়াছে। মা গতকাল খাওয়াদাওয়ার পর মোটরে দিল্লী রওনা হইয়াছেন। সেখানে একটি রাত্রি থাকিয়া আজ সন্ধ্যায় হোসিয়ারপুর যাইবার কথা।

বিদ্যাপীঠের ছেলেরা সকলে আগামীকাল আলমোড়া ফিরিয়া যাইবে।

১২ই মার্চ ১৯৫৮।

হোসিয়ারপুরে শ্রীশ্রীমা।

স্বামী পরমানন্দের পত্রে জানা গেল মা পরশু সকালে হোসিয়ারপুর পৌঁছিয়াছেন, মা'র সঙ্গে গিয়াছে স্বামিজী, বুনি, উদাস, চিত্রা, শোভা, সাধন, কেশবানন্দ, শিবানন্দ, কান্তিভাই, বিভু এবং আরও অনেকে।

মা'র থাকিবার বন্দোবস্ত সেখানে নাকি খুব ভালোই করিয়াছে। মা'র সেবার জন্য সর্বদাই লোক দাঁড়াইয়া আছে। মা'র বিশ্রাম হইতেছে। শরীরটা বিশেষ ভাল না। তাই ইচ্ছা মত সৎসঙ্গে দিনের মধ্যে ২।৩ বার যান।

চিত্রার পত্রে-ও বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া গেল। দিল্লীতে রবিবার দিন ৯-ই মা'র উপস্থিতিতে অখণ্ড নাম কীর্তন হইয়াছে। ছুটির দিন, তাই বেশ ভীড়-ও হইয়াছিল।

টিহরীর রাজমাতা কাজে আমেরিকা যাইতেছেন। তিনি আসিয়া মা'র সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যা ৭৷৷০ টায় মা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া কুচামনের রাজমাতাকে হাসপাতালে দেখিয়া এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে একটু নামিয়া স্টেশনে আসিয়াছিলেন। স্টেশনে বহু ভক্ত নরনারী মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন।

সোমবার খুব ভোরে জলন্ধর পৌঁছিয়া মা সকলকে লইয়া নামিলেন। লছমনজী ও তাঁহার ভাই মা'র জন্য গাড়ী নিয়া আসিয়াছেন। মা সেই গাড়ীতেই সোজা হুসিয়ারপুর রওনা হইলেন। হরিবাবার আশ্রমের নিকট পৌঁছিতেই দেখা গেল বাবা স্বয়ং ব্যাণ্ড পার্টি সহ মাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিতেছেন। হরিবাবা নিজে আসিয়া মাকে তাঁহার গুরুদেবের মন্দিরের সম্মুখে বসাইলেন। এক থালা ভরা গোলাপ লইয়া তিনবার মাকে নিজ হস্তে অঞ্জলী দিলেন। মনোহর মা'র স্তব স্তুতি করিল। তাহার পর হরিবাবাই মাকে লইয়া মা'র থাকিবার স্থানে গেলেন।

মা'র জন্য পৃথক একটি নূতন বাড়ী। উপরে এবং নীচে মা'র জন্য পৃথক ঘর আছে। উপরের ঘর মা'র বিশ্রামের জন্য। নিচের ঘরে সৎসঙ্গের পরে কখনো কখনো আসিয়া বিশ্রাম করেন। উপরের ঘরের তিনদিকে প্রশস্ত বারান্দা। চারদিকে ফুলের টব লাগান। ছাদ হইতে কুলুভ্যালির তুষার মণ্ডিত পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। স্থানটি নাকি বেশ মনোহর।

সৎসঙ্গ নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। প্রতিদিন সকালে রাসলীলা, দুপুরে তিন ঘণ্টার রামায়ণ পাঠ ও মহাত্মাদের ভাষণ এবং সন্ধ্যায় কীর্তন ও বাবার ভক্ত-শিষ্যদের দ্বারা গ্রাম্যলীলা অভিনয় হইয়া থাকে।

১৮ই মার্চ ১৯৫৮।

হুসিয়ারপুর হইতে মেয়েরা কয়েকজন আসিয়াছে। তাহাদের মুখে মা'র সংবাদ পাইলাম।

গত পরশুদিন-ই দিল্লী হইতে বর্মা সাহেব, সুপারী সাহেব, আম্বের রাজা সাহেব, আগা সাহেব প্রভৃতি মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন সৎসঙ্গের পরে সকলের সঙ্গে মা অনেকক্ষণ কথা বলিলেন।

মা'র আজ ভোরে জলন্ধর রওনা হইয়া যাইবার কথা। দিনের বেলা সেখানে বিশ্রাম করিয়া রাত্রির গাড়ীতে দিল্লী যাইবার কথা। মা'র সঙ্গে মাত্র পরমানন্দ স্বামী, উদাস, অধীরবাবু আছেন। আগামীকালই বিকালে বোধ হয় বৃন্দাবন যাইবেন। কারণ সেখানে ১৯শে উড়িয়া বাবাজীর তিরোধান উৎসব।

সেখানে ২।১ দিন থাকিয়া, কাশী আসিবেন আশা করা যাইতেছে। ২৬শে হইতে আশ্রমে বাসন্তী পূজা আরম্ভ হইবে।

২৪শে মার্চ ১৯৫৮।

আজ বেলা প্রায় ৫টার সময় মা কাশীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। মা এখান হইতে যাইবার সময় সকলে বিশেষ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিল, যাহাতে মা এবার বাসন্তী পূজার সময়ে কাশীতে পদার্পণ করেন। মা'র কৃপায় এবার ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

২৭শে মার্চ ১৯৫৮।

আজ সপ্তমী পূজা। এবার কুসুম ব্রহ্মচারী পূজা করিতেছে। সহায়ক বিশু ও কমলাকান্ত।

৩০শে মার্চ ১৯৫৮।

মা'র উপস্থিতিতে যথাসময়ে আজ প্রাতে দশমীর পূজান্তে দেবীর বিসর্জন হইয়া গেল। মা অনেকক্ষণ পর্যন্ত "দুর্গা" নাম করিলেন।

এবার পূজার প্রথম দিন হইতেই প্রত্যহ বিকালে আশ্রমে চণ্ডীর গান হইতেছে। গান করিতেছে কাশীর কীর্তন গায়ক শ্রীতারাপদবাবু। সহর হইতে অনেকেই এই গান শুনিবার জন্য আসিতেছে।

১লা এপ্রিল ১৯৫৮।

ইতিমধ্যে একদিন গয়া রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কুমার গুহ মা'র দর্শনে আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি আর মাকে কখনো দেখেন নাই। তিনি মাকে একটি বেশ সুন্দর ঘটনার কথা বলিলেন। একদিন তিনি শ্রীশ্রীসারদা মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন যেন তাঁহার দর্শন লাভ করেন। তাহার পরেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন একজন পরমাসুন্দরী স্ত্রী পরিধানে শুভ্রবসন, আলুলায়িত কেশদাম, মুখে মৃদু মৃদু হাসি, তাঁহার দিকে করুণার দৃষ্টিতে যেন তাকাইয়া আছেন। সেই দেবীর নিকটে একজন গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী।

একটি সুন্দর ঘটনা।

সেদিন আশ্রমে আসিয়া তিনি মাকে প্রথম চণ্ডীমণ্ডপেই দর্শন করিলেন। তিনি অবাক্ হইয়া দেখিলেন যে, যে স্থানে সেই দেবী মূর্তি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন তাহার সহিত চণ্ডীমণ্ডপের বিশেষ মিল আছে। তাহা ছাড়া স্বপ্নে তিনি হুবহু মায়ের মূর্তি-ই দেখিয়াছিলেন এবং পাশে যে সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলেন তিনি নারায়ণ স্বামী। নারায়ণ স্বামিজীও

সেই সময় মা'র পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধাও রহিল না যে তিনি স্বপ্নে মাকেই দেখিয়াছিলেন।

৭ই এপ্রিল ১৯৫৮।

শ্রীযুগল কিশোর বিড়লার বিশেষ আগ্রহে মাকে আজ হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নব-নির্মিত শ্রী৺বিশ্বনাথ মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিড়লাজী এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। এখনো কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। বিড়লাজী মা'র জন্য মন্দিরের সম্মুখেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মা মোটর হইতে নামিবামাত্র তিনি মাকে অভ্যর্থনা করিয়া মন্দিরের ভিতরে লইয়া গেলেন। মা ৺বিশ্বনাথজীর সম্মুখে বসিয়া একটু সময় "জয় শিব-শংকর" নাম করিলেন। ইহার পর বিড়লাজী মাকে নিজে সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইলেন। বেশ সুন্দর মন্দিরটি।

১১ই এপ্রিল ১৯৫৮।

আজ বিকালে দুন এক্সপ্রেসে মা কলিকাতা রওনা হইলেন। সঙ্গে অনেকেই যাইতেছে। আগামী ১৩ই কলিকাতার নূতন আশ্রমে দিদিমার সন্ন্যাস তিথি উৎসব।

কলিকাতার নূতন আশ্রমে দিদিমার সন্ন্যাস উৎসব।

১২ই এপ্রিল ১৯৫৮।

সকাল প্রায় ৭টায় মা হাওড়া আসিয়া পৌঁছিলেন। স্টেশনে বহু ভক্ত ফুল-মালা লইয়া উপস্থিত ছিলেন। মাকে স্টেশন হইতে সোজা

আগড়পাড়ার নূতন আশ্রমে লইয়া যাওয়া হইল। মায়ের আগমনের প্রতীক্ষায় দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়েরা সকলে দাঁড়াইয়াছিল। মা নূতন আশ্রমে এই প্রথম প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যার সময় মা গঙ্গার সামনে ময়দানে বেশ কিছু সময় পায়চারী করিলেন। তাহার পর সান্ধ্য কীর্তনের সময়-ও মা গঙ্গার পাড়েই বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু রাত্রে মা'র অন্যত্র থাকার কথা, কারণ পঞ্জিকা দেখিয়া দিন স্থির করা হইয়াছে যে আগামী ১৭ই বৈশাখ শুভদিন। সেইদিন মা তাঁহার নিজ ঘরে প্রবেশ করিবেন। সেইজন্য এই পাঁচ দিন মা'র রাত্রিবাস আশ্রমে হইবে না। আজ রাত্রিটা মা বেলঘরিয়ার শৈবালিনীদির মেয়ে মনুর বাসায় থাকিবেন। সে নূতন বাড়ী করিয়া মা'র আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এবার মা'র কৃপায় সেই সংকল্প পূর্ণ হইল।

১৩ই এপ্রিল ১৯৫৮।

আজ চৈত্র সংক্রান্তি। দিদিমার সন্ন্যাস তিথি। দিদিমার অনেক শিষ্য প্রাতঃকাল হইতেই আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ভোর ৫টা হইতে উষা-কীর্তন আরম্ভ হইল। বেলা ১০টার পর গুরু পূজান্তে দিদিমার আরতী ও ভোগ হইল। রাত্রি পর্যন্ত কিছু না কিছু অনুষ্ঠান চলিল।

১৪ই এপ্রিল ১৯৫৮।

কলিকাতার বিভিন্ন ভক্ত-গৃহে মা।

আজ শুভ নব-বর্ষ। সকাল হইতেই দলে দলে ভক্ত মাকে নব-বর্ষের দিনে প্রণাম করিতে আসিয়াছে। ভীড় খুবই বাড়িয়া উঠিল। মা বেলা ১০টার সময় বালিগঞ্জে ভবানীর বাড়ি চলিলেন। সেখানে মা'র তিন দিন থাকার কথা। মা'র সঙ্গে দিদিমা, স্বামিজী, মেয়েরা ও আমি চলিলাম।

ভবানীর বাড়ীতে বাগানের মধ্যে একটি ঘরে মা'র থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থানীয় ভক্তেরা সকলেই খুব আনন্দিত।

১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮।

আজ মা'র ভোগ শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাসগুপ্তের বাসায় হইল। ভোগের পর মা ভবানীর বাড়ীতে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। সন্ধ্যার পর আবার গঙ্গাচরণ বাবুর বাসায় গেলেন। আজ বৃহস্পতিবার—মৌন-মিলনীর দিন।

মৌনের পরে মা সেখান হইতে সোজা কনকবাবুর বাসায় চলিয়া গেলেন। সেইখানেই রাত্রিবাসের কথা।

১৯শে এপ্রিল ১৯৫৮।

গতকাল সমস্ত দিনটি মা কনকবাবুর বাসায় ছিলেন। আজ সূর্যগ্রহণ। ভোরবেলা মা আগড়পাড়া আশ্রমে আসিলেন। গ্রহণের সময় মাকে থাকিবার জন্য আশ্রমের পক্ষ হইতে বিশেষ করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

গঙ্গার দিকে বড় বারান্দায় মা'র ও সকলের বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। গ্রহণের মোক্ষ পর্যন্ত মা'র সম্মুখে কীর্তন চলিল। কলিকাতা হইতেও বহু ভক্ত আশ্রমে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। গ্রহণ লাগিবার সময় এবং ছাড়িয়া গেলে মা সকলের মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিলেন। উপস্থিত অনেকেই গঙ্গাস্নান করিলেন। বেলা ১১টার সময় মা আবার কনকবাবুর বাসায় ফিরিয়া গেলেন। ভোগের পরে মা শ্রীনির্মল চক্রবর্তী মহাশয়ের

বাড়ীতে গেলেন। আগামী ২১শে হইতে তাঁহাদের বাসায় ভাগবৎ সপ্তাহ সুরু হইবে। পাঠের জন্য বৃন্দাবন হইতে শ্রীনাথ শাস্ত্রীজী আসিয়াছেন।

২১শে এপ্রিল ১৯৫৮।

আজ সকালে নির্মলের বাড়ীতে ভাগবৎ পাঠ আরম্ভ হইল। বাড়ীর ছাতের উপর মূল পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং বাড়ীর সম্মুখে খোলা ময়দানে প্যাণ্ডাল করিয়া বিকালে ব্যাখ্যা ও সৎসঙ্গের আয়োজন করিয়াছে।

২৮শে এপ্রিল ১৯৫৮।

আজ শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ সমাপ্ত হইল। মা'র উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়াতে নির্মল ও তাহার স্ত্রী মহা কৃতার্থ। মা ও সঙ্গীয় সকলের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা তাহারা সর্বদাই করিতেছে।

ইতিমধ্যে একদিন সন্ধ্যার পরে সিদ্ধেশ্বরবাবু তাঁহার ছাত্রীদের লইয়া মা'র সমক্ষে খুব সুন্দর কৃষ্ণলীলা কীর্তন করিলেন। আর একদিন অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাভারতের উপর ভাষণ দিলেন। মৌনের পর প্রত্যহই মা শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারীজী ও ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বহু সুন্দর কথা বলিতেন। ঐ সময়ে এত ভীড় হইত যে আর তিলার্দ্ধ ধারণের স্থান যেন থাকিত না। প্রত্যহই মা'র মুখের কথা শুনিবার জন্য প্রত্যেকেই একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত।

আজই ভোগের পর মা যাদবপুরে শ্রীযুক্ত কিরণ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। সেখানেও এক রাত্রি থাকার কথা।

২৯শে এপ্রিল ১৯৫৮।

বৃন্দাবন হইতে শ্রীহরিবাবাজী মহারাজ আজ মা'র শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে আগড়পাড়া আসিয়া পৌঁছিলেন। সন্ধ্যার সময় তাঁহারা আসিলেন। মা তাই দুপুর বেলাই কিরণবাবুর বাসা হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন।

হরিবাবার কলিকাতা আগমন।

হরিবাবার আগমন উপলক্ষে সমস্ত আশ্রমটি বেশ সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। উপর তলার ঘর হইতে নিচ তলা পর্যন্ত আলপনা দেওয়া হইয়াছে। সুসজ্জিত মোটরে করিয়া হরিবাবাকে স্টেশন হইতে আনা হইল। বাদ্যভাণ্ড ও শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে বড় রাস্তা হইতে আশ্রমের ভিতরে লইয়া আসা হইলে মা স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে স্বাগত করিলেন। হরিবাবা মায়ের গলায় জরির মালা দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। উভয়ের এই পরস্পর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বাস্তবিকই দর্শনীয়। ইহার পর মা তাঁহাকে লইয়া উপরের ঘরে গেলেন।

মা আজি-ও রাত্রিতে আশ্রমে শুইলেন না। পার্শ্ববর্তী শিব মন্দিরের বারান্দায় গিয়া শুইলেন।

৩০শে এপ্রিল ১৯৫৮।

আজ প্রাতঃকালে শুভমূহূর্ত্ত দেখিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে মাকে নূতন আশ্রমে মা'র ঘরে প্রবেশ করান হইল। ঘরে মায়ের পূজা ও আরতী-ও হইল।

২রা মে ১৯৫৮।

আজ হইতে মা'র ৬৩ তম শুভ জন্মোৎসব আরম্ভ হইল। ভোর হইতে না হইতেই সকলের প্রাণ যেন কি এক আনন্দে মাতিয়া উঠিল। বহু দূর দূর স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া মা'র চরণে মিলিত হইয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজী মহারাজও গতকাল আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে পার্শ্ববর্তী ডালমিয়ার বাগান বাড়ীতে থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছে। বৃন্দাবন হইতে প্রসিদ্ধ রাসমণ্ডলীও আনা হইয়াছে। নিত্য প্রাতঃকালে রাসলীলা হইবে। আজ বিকালে বম্বের সন্ন্যাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমহেশ্বরানন্দজী মহারাজ আসিয়া পোঁছিলেন। তাঁহাকে-ও বিশেষ শোভাযাত্রা সহকারে স্টেশন হইতে লইয়া আসা হইল। তিনি অতি সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন। যেমন তাঁহার ভাষা তেমনই তাঁহার পাণ্ডিত্য। বলিবার ক্ষমতা অতি অপূর্ব।

কলিকাতা মহা-নগরীতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন।

সন্ধ্যা ৬টার সময় প্যাণ্ডেলে একটি সাধারণ অধিবেশন হইল। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত সভাপতিত্ব করিলেন। প্রধান অতিথি হইলেন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

প্রথমে ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম মহাশয় মা'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া একটু সময় বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বিষয় হইতেছে যে বর্তমান সময়ে জনসাধারণ যখন আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভুলিতে বসিয়াছে, সেই সময় তাহাদেরই মধ্যে পুনরায় ধর্মভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য-ই মায়ের আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন।

তাহার পর বলিলেন ব্যারিষ্টার শ্রী এন, আর, দাসগুপ্ত। তিন বিশ্বাস করেন, মা স্বয়ং মহামায়া ভগবতী। প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন মহাশয় বলিলেন যে মায়ের কথা তিনি পূর্বেও শুনিয়াছিলেন বটে কিন্তু

আজ সভায় আসিবার পূর্বে মাকে দর্শন করিয়া এবং মায়ের আশীর্বাদ লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র দাশগুপ্ত বলিলেন যে আজ মাতৃ-দর্শনে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন।

রাত্রি ৩৷৹টার সময় মায়ের মন্দিরে মায়ের পূজা হইল। মা তাঁহার নিজের ঘরেই বিশ্রাম করিতেছিলেন।

৬ই মে ১৯৫৮।

এই কয়দিন বেশ সুন্দর ভাবে সৎসঙ্গ ও রামলীলা চলিতেছে। সৎসঙ্গে নিত্য রামায়ণ পাঠ ও মহামণ্ডলেশ্বর মহেশ্বরানন্দজী মহারাজ, অবধূতজী, চক্রপাণিজী, শ্রীনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির সারগর্ভ ভাষণ হইয়া থাকে। স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর বক্তৃতাই সর্বাপেক্ষা মনোমুগ্ধকর ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আজ রাত্রি ৩৷৹টায় মায়ের তিথি পূজা। মন্দিরের বারান্দায় পূজার স্থান হইয়াছে। মায়ের খাটখানি খুব সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছে। মায়ের মাথার দিকে সাধু-মহাত্মাদের বসিবার স্থান। খাটের তিন দিকে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ ফল ও মিষ্টি সাজান।

রাত্রি ৩৷৹টায় মাকে পূজার স্থানে আনা হইলে সমবেত ভক্ত নর-নারী মায়ের জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল। মা আসিয়া খাটের ওপর বসিলেন। মা'র মাথায় একটি সোনার মুকুট পরাইয়া দেওয়া হইল। মা ইহার পর চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। সাধু-মহাত্মাগণও প্রায় সকলেই আসিয়া বসিয়াছেন। যথা সময়ে বেদধ্বনির মধ্যে মায়ের পূজা আরম্ভ হইল।

রাজোচিত উপচারে মায়ের পূজা, ভোগ ও আরতি সমাপ্ত হইতে প্রায় ভোর ৫॥৹টা বাজিয়া গেল। তাহার পর একে একে সকলে আসিয়া মাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল।

সকাল প্রায় ৭টায় মাকে নিজের ঘরে লইয়া আসা হইল।

৭ই মে ১৯৫৮।

আজ সন্ধ্যায় মহেশ্বরানন্দজীর ভাষণের পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা দিলেন। তাহার পর অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী মহাশয়ও আশ্রম সম্বন্ধে কিছু সময় বলিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বক্তৃতাই সকলের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে।

৮ই মে ১৯৫৮।

আজ শ্রীহরিবাবাজী সকালে মাকে লইয়া পাণিহাটি গিয়াছিলেন। যেখানে মহাপ্রভু গঙ্গার পারে বটবৃক্ষের নিচে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই স্থানটিও সকলে দেখিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যায় সৎসঙ্গের পরে মা'র সহিত ভক্তদের বেশ সুন্দর কথোপকথন হইতেছিল। মা হলে বসিয়াছিলেন।

কলিকাতায় মাতৃ-সৎসঙ্গ।

প্রঃ—সকলের-ই কি সব হতে পারে, না সংস্কার অনুযায়ী হয়?

মা—দুটাই হয়। এক ত সংস্কার অনুযায়ী হয়। আবার গুরুশক্তি-

পাতে সবই হ'তে পারে। অযোগ্যকেও তিনি যোগ্য করে নিতে পারেন। সেখানে লক্ষ্য, প্রকাশ ও প্রাপ্তি সবই হ'তে পারে।

প্রঃ—যন্ত্রটাত বেশ স্বাভাবিক ভাবে চলছে। কিন্তু যিনি চালাচ্ছেন, তিনি কোথায় বসে করাচ্ছেন?

মা—তিনি যে কোথায় নেই, তাই বল বাবা!

প্রঃ—ভাব সমাধি ইত্যাদি কি সাধনার দ্বারাই হয়, না আপনা-আপনিই হয়।

মা—বাবা, এক গাছের ফল পাতাও দু'টি ঠিক এক রকম হয় না। মানুষও তাই ভিন্ন। বান আস্‌লে যেমন আর কোনও স্থানে বাধা থাকে না; তেমনি যদি অসীমের কথা আসে, সেখানে সকলেই সব হ'তে পারে। সীমিতের মধ্যে চলতে চলতে যদি অসীমের স্পর্শ আসে তা হ'লে সবই হতে পারে। নতুবা সীমাবদ্ধের যে ক্রিয়া তাই চলে।

প্রঃ—পরজন্ম বা পূর্বজন্ম বিষয়ে আপনার কি মত?

মা—যেখানে জন্মান্তরবাদ আছে, সেখানে সবই আছে। পূর্বজন্ম পরজন্ম সবই আছে। আর যেখানে অজাতবাদ, সেখানে কিছুই নাই।

প্রঃ—খ্রীষ্টান মুসলমান যেখানে মানে না।

মা—সেখানে কিছু-ই নাই। তাদের একটা লাইন আছে, সেইখানে সেই কথা।

প্রঃ—সকল মুনির মত কি ভাবে মানা সম্ভব?

মা—তুমি যে মুনির মত নেবে তাঁর মত ভালভাবে মানতে পারলেই সব মুনির মত জানতে পারবে। তুমি যে ঘরে আছ, সেখান হ'তেই তোমার চলা। ঠিক মত যদি চলতে পার তবেই নানা মত সব-ই তুমি বুঝতে পারবে। একটা মেশিনে যেমন অনেকগুলি সুইচ্ লাগান আছে। যখন কাজ আরম্ভ করলে তখন সবগুলিইত আর সব সময়ে ব্যবহার কর না। একটা দিয়ে আরম্ভ করলে, তারপর ধীরে ধীরে সবই দরকারে

আসে। সবটা না হ'লে কিন্তু তোমার কাজ পুরা হ'বে না। যখন পূর্ণটা পাবে তখন তোমার মধ্যেও তারটা পাবে আর তাদের মধ্যেও তোমারটা পাবে। এইজন্যই বলা হয় তিনি কোথায় নাই?

৯ই মে ১৯৫৮।

আজ সকালে হরিবাবার সঙ্গে মা বরাহনগরে পাট বাড়ীতে গেলেন। এই আশ্রমটি পরম ভক্ত ৺রামদাস বাবাজী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমে শ্রীনিতাই-গৌর প্রতিষ্ঠিত আছেন। এবং ৺রামদাস বাবাজীর সমাধিও এখানে। আজ বৃন্দাবনের রাসপার্টি এখানেই রাসলীলা করিল। লীলা সমাপ্ত হইলে হরিবাবার কীর্তন হইল। তাহার পরে মা ও সকলে ফিরিয়া আসিলেন।

কলিকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মা।

বিকাল বেলা মাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Science College-এ নিয়া যাওয়া হইল। ডাঃ দাস নিজে কিভাবে যন্ত্রের দ্বারা মস্তিষ্কের কার্য ও হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য দেখা যায় তাহা সব বর্ণনা করিলেন।

তাহার পরে সেখান হইতে মাকে "যোগদা আশ্রম" ও "সারদা আশ্রমে" লইয়া যাওয়া হইল। দু'টি আশ্রমেই মাকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

১০ই মে ১৯৫৮।

বিকালে প্রায় ৫॥০টায় মা স্থানীয় Port Commissioner's Hospital-এ ভুবনদাকে দেখিতে গেলেন। তাহার পর মাকে বর্ধমানের মহারাজার

বাড়ীতেও নিয়া যাওয়া হইল। আজ দুপুরে বর্ধমানের মহারাণী স্বয়ং আসিয়া মাকে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পথে আগড়পাড়ায় শ্রীনির্মল মিত্রের বাড়ীতে মা অল্পক্ষণের জন্য গিয়াছিলেন। আজই সে দিদিমার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।

১১ই মে ১৯৫৮।

আজ সন্ধ্যা হইতে নিমাই-সন্ন্যাস লীলা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত তরুণ কান্তি ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে আজ আমাদের ওখানে ঐ লীলা অভিনয় হইল। মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হওয়া সত্বেও মা পর্যন্ত সেখানেই বসিয়াই রহিলেন। দর্শকবৃন্দের ভীড়ও কম হইল না।

১২ই মে ১৯৫৮।

আজ সন্ধ্যার সময় হাওড়ার প্রসিদ্ধ লোহার জিনিষের নির্মাতা শ্রীযুক্ত ডি, এন, সিংহ মাকে তাঁহার ঠাকুরবাড়ীতে লইয়া গেলেন। মায়ের সঙ্গে হরিবাবা ও মায়ের বহু ভক্ত গিয়াছিলেন। হরিবাবার কীর্তন এবং রাত্রির প্রোগ্রাম সব সেখানেই হইল।

১৩ই মে ১৯৫৮।

সকালে মাকে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র গুহরায় মহাশয় তাঁহার সরস্বতী প্রেসের নূতন শাখায় লইয়া গিয়াছিলেন।

বিকালে প্রথমে মা টালিগঞ্জে বাঙ্গর হাসপাতালে মুক্তি মহারাজ ও রমেশ বাবুকে দেখিয়া, স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জীর পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রভাদির বাসায় যান। প্রভাদি আশ্রমবাসী সকলকেই যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। আজও রাত্রির প্রোগ্রাম সেখানেই হইল। বহু গণ্যমান্য ভক্তেরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মা অনেকক্ষণ কীর্তনও করিলেন। প্রভাদি সকলকে বিশেষ আদরের সহিত জলযোগ করাইলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা ফিরিয়া আসিলেন।

১৪ই মে ১৯৫৮।

শ্রীশ্রীমায়ের রঁাচী যাত্রা।

আজ রাত্রি ৮॥০ টায় মা রঁাচী রওনা হইলেন। সঙ্গে আশ্রমেরও অনেকেই চলিল। হরিবাবা-ও সদলবলে আমাদের সঙ্গে চলিলেন। সর্বসমেত আমরা প্রায় ৪০।৪৫ জন। স্টেশনে বহু ভক্ত মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। শ্রীমান পানু আমাদের সহিত খড়্গপুর পর্যন্ত আসিয়া আবার কলিকাতা ফিরিয়া গেল।

১৫ই মে ১৯৫৮।

আজ ভোরে মুড়ী স্টেশনে গাড়ী পৌঁছিতেই দেখা গেল প্রিয়রঞ্জন, বীরেশ্বর গাঙ্গুলী, দেবী বাবু প্রভৃতি দুই খানা মোটর নিয়া আসিয়াছেন।

মা, দিদিমা, হরিবাবা ও আমি মোটরে রাঁচী রওনা হইলাম। সঙ্গীয় সকলে ট্রেনে আসিল।

অনেকদিন হয় এখানে মা'র জন্য এক খানি ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি আশ্রমের দোতলায় নির্মিত হইয়াছে। আজ মাকে লইয়া সেখানে শুভ প্রবেশ হইল।

হরিবাবা ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকেদের স্থান দেওয়া হইল "প্রিয়ধামে"। শ্রীমান দেবব্রত তাহাদের বাড়ী "প্রিয়ধাম" সম্পূর্ণটাই সাধু মহাত্মাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছে। আশ্রমের পাশেই একটি মাঠের মধ্যে দেখিলাম সৎসঙ্গ ও কীর্তনাদির জন্য একটি প্যাণ্ডেলও নির্মিত হইয়াছে।

১৬ই মে ১৯৫৮।

রাঁচীতে মা।

আজ সকালে ৮॥০ টায় হরিবাবাকে, মাকে এবং ভক্তদের শ্রীযুক্ত বক্সীদাদা তাঁহার বাগান বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সকাল বেলার সৎসঙ্গ সেখানেই হইল। তাহার পর মাকে তাঁহার সেই বিরাট ফলের বাগান ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইলেন।

কলিকাতা হইতে ডাঃ নগেন্দ্র দাস মহাশয়ও মা'র সঙ্গেই রাঁচী আসিয়াছেন। তিনি নানা প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের ব্রেণের কাজ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। সাধারণ মানুষের, রোগীর, সাধু সন্ন্যাসীর, যোগীর, সমাধি অবস্থায়, কুম্ভক অবস্থায় মস্তিষ্কের ভিতরে কি ভাবে কাজ হয় সে বিষয়েই তাঁহার গবেষণা। আজও মা'র সঙ্গে তাঁহার এইসব বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল।

আজ একজন ভদ্রমহিলা আসিয়া তাঁহার স্বপ্নের বিবরণ মাকে বলিলেন। তিনি কাহারো কথায় জাগতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে বহুদিন হইতেই সত্য-

নারায়ণ পূজা করিয়া আসিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন পূজার পর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শুইয়া আছেন, এমন সময় স্বপ্ন দেখিলেন মা আসিয়া তাঁহাকে সাদা অক্ষরে লিখিয়া একটি মন্ত্র প্রদান করিলেন। কি করিয়া জপ করিতে হয় তাহাও হাত ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন। সকালে উঠিয়া তিনি তাঁহার স্বামীকে সেই মন্ত্রটি বলিলেন। তদবধি তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সেই মন্ত্রটি জপ করিয়া আসিতেছেন। এই ঘটনাটি শুনিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম।

১৭ই মে ১৯৫৮।

রাত্রে মৌনের পর প্রত্যহই মা'র সহিত বেশ সুন্দর কথাবার্তা হয়। আজও কি প্রশ্ন প্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন,—"শব্দ হতেই এই জগতের উৎপত্তি। অবশ্য যখন তোমরা জগতের উৎপত্তির বিষয় কথা বল সেখানে। আবার যেখানে অজাতবাদ সেখানে জগতের উৎপত্তি কোথায়? অক্ষর হ'তে শব্দ। অক্ষর মানে যার ক্ষয় নাই। যার উৎপত্তি নাই, যার বিকার নাই। শব্দেরও নাশ নাই। সাধারণ মানুষ স্থূল শব্দ ধরতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম শব্দ ধরবার তার কোন ক্ষমতা নাই। এমন সূক্ষ্ম শব্দ আছে, যা তোমাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারাও ধরা যায় না।"

অনু-পরমাণুর বিষয়ে কথা উঠিলে মা বলিলেন যে সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর কোথায় নাই। তিনি সর্বত্র সমান ভাবে আছেন। সেই শক্তি নিয়া যে, যেভাবে প্রয়োগ করে তাহাই কী চমৎকার।

জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ কর্ম থাকে কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন যে, জীবন্মুক্তের কথা বলিলে সেখানে আবার কর্ম কোথায়? কর্ম-ও

থাকিবে আবার জীবন-মুক্তও ইহা হইতে পারে না। কর্ম থাকিতে মুক্ত হইতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা সব কর্ম নষ্ট হইয়া যায়, দগ্ধ হইয়া যায়।

১৮ই মে ১৯৫৮।

রাঁচীস্থ যোগদা মঠে মা।

আজ সকালে মাকে স্থানীয় যোগদা মঠে নিয়া গেলেন। তাঁহাদের নূতন অতিথি শালার উদ্‌ঘাটন মা'র দ্বারা করাইলেন। যোগদা মঠের একজন স্বামিজী মা'র সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতাও দিলেন।

বিকালবেলা সৎসঙ্গের পরে হরিবাবা ও মা স্থানীয় Mental Hospital-এ দিল্লীর বর্মা সাহেবের ছেলেকে দেখিতে গেলেন। এই ছেলেটি বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছিল। সেখানেই তাহার মাথা খারাপ হইয়া যায়। হরিবাবা ও মা তাহার ward-এর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, তাহাকে আনা হইল। সে আসিয়াই মাকে এবং হরিবাবাকে হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিল। পূর্বাপেক্ষা ছেলেটি কিছু প্রকৃতিস্থই মনে হইল। কিন্তু তাহার মুখে যেন একটি বিষাদের ছায়া। প্রশ্নের উত্তরে সে বেশ বলিল যে পাঁচ মাস হয় সে এখানে আসিয়াছে। তাহার পিতা কয়েকদিন পূর্বে তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাহার দিল্লী যাইতে ইচ্ছা হয়। পূর্বাপেক্ষা সে এখন ভালই আছে। হাসপাতালে বেশ খাইতে দেয়। মাকে পূর্বে সোলনে দেখিয়াছে। ইত্যাদি অনেক কথা বলিল। তাহাকে দেখিয়া পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসা হইল।

১৯শে মে ১৯৫৮।

আজ সকালের সৎসঙ্গ স্থানীয় একজন মাড়োয়ারীর বাড়ীর নূতন হলে হইল। হরিবাবাকে তাহারা সৎসঙ্গ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিল। বাড়ীটির নাম "গোবিন্দ ভবন"।

মৌনের পর মা'র সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলার বেশ সুন্দর কথা-বার্তা হইল।

প্রশ্নোত্তরিকা।

প্রঃ—মৌনের অর্থ কী?

মা—"অ-মন" হওয়ার-জন্যই মৌন হওয়া।

প্রঃ—সর্বদাই ত প্রণব ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা শুনতে পাই না কেন?

মা—মনটা সংসারের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধে ছুটাছুটি করছে, সেইজন্যই সেই সূক্ষ্ম ধ্বনি কানে প্রবেশ করছে না। সূক্ষ্ম শব্দ ধরবার জন্যে যেমন সূক্ষ্ম যন্ত্রের প্রয়োজন—সেই রকম এই প্রণবের ধ্বনি শুনবার জন্য মনটাকে স্থির ও একাগ্র করতে হয়।

প্রঃ—ভক্তি, ভাব ও উচ্ছ্বাসে তফাৎ কী?

মা—ভগবানে বিশেষ অনুরক্তিই ভক্তি। ভক্তের হৃদয়ে কোনও একটি কারণকে আশ্রয় করে ভাবের প্রকাশ হয় এবং সেই হৃদয়ের ভাবটি যখন বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাকেই উচ্ছ্বাস বলে।

প্রঃ—কোনও কোনও সাধুদের দেখা যায় লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করেন না। এর কারণ কি?

মা—দেখ, সাধনার পথে সকলের সঙ্গে মেলামেশায় অনেকের ক্ষতি হ'তে পারে। সেইজন্য আহারের শুদ্ধিও রাখতে হয়। পথে থাকাকালে এই সব নিষ্ঠা দরকার হয়। পরে সেই পূর্ণকে পেয়ে গেলে তখন তিনি সকল বস্তুতে ও সকলের মধ্যে সেই এক ভগবানকেই দেখতে পান।

এইরূপ কথাবার্তা প্রায় রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলিল। তাহার পর মাকে উঠাইয়া আনা হইল।

২০শে মে ১৯৫৮।

আজ সকালে মা হলঘরে আসিয়া বসিলেন। হাজারীবাগের মনোজ মাধব রায়ের বৃদ্ধ পিতা আট মাসের মধ্যে উপযুক্ত দুইটি পুত্র হারাইয়া বিধবা ছোট পুত্রবধূকে সঙ্গে করিয়া মায়ের দর্শনে আসিয়াছেন। বৃদ্ধ মাকে প্রণাম করিয়া শোকে অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, আমার কান্না কি মায়ের কাছে পৌঁছায় না?"

মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,—"নিশ্চয়ই পৌঁছায় বাবা। এই অশ্রুরূপেও ত তিনিই প্রকাশিত। বাবা, এই সংসারের এই-ই রূপ। জগৎ মানেই যা গতিশীল—পরিবর্তনশীল। এই আছে, এই নাই—এই-ই জগতের রূপ।"

আজ বিকালে স্থানীয় শ্রীরাম সীতা মন্দিরে "রাম অর্চার" আয়োজন হইয়াছিল। মা ও হরিবাবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মৌনের পর আজও মা'র সঙ্গে নানা প্রকার কথাবার্তা হইল।

প্রঃ—যে রূপে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, সেভাবে আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারি কি?

মা—বাবা, ভগবানের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব না, সবই সম্ভব।

প্রঃ—কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগলে নিদ্রা হয় কিনা?

মা—এ প্রশ্নই আসে না। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগবে আর নিদ্রাও হবে, এক সঙ্গে দুইটি সম্ভব না। কুণ্ডলিনী শক্তির একটু ছোঁয়া লাগলেও মানুষ বদলিয়ে যায়। তার ঢং ঢাং, কথাবার্তা, চলাফেরা সব বদল হয়ে যায়।

প্রঃ—যদি তিনি আমাদের হৃদয়েই আছেন তবে আর তাঁকে ডাকার প্রয়োজন কি?

মা—(হাসিয়া) ঐ 'যদি' নাশ করার জন্যই ডাকার প্রয়োজন—জপ ও নামের প্রয়োজন। এ সব ত শোনা কথা, পড়া কথা। ঠিক ঠিক কি অনুভব করছ যে ভগবান তোমার হৃদয়ে আছেন? প্রকৃত অনুভব চাই, বাবা।

মা'র মুখে প্রকাশ পাইল, মা দেখিতেছিলেন এক স্থানে অখণ্ড ভাবে মহামন্ত্র নাম কীর্তন করিতে গিয়া খণ্ডিত করিয়া ফেলিতেছে, তখন মা নিজে নাম রক্ষা করিয়া উহা খণ্ডিত হইতে দেন নাই। পরে মা পুষ্পকে মৌন থাকিয়া নাম রক্ষা করিতে বলেন। পুষ্পর কাছ হ'তে বুনি নাম নিল। মধ্য রাত্রে আমার ছোটবোন উষা নাম রক্ষা করিতে করিতে শুনিতে পাইল কোথাও যেন খুব জোরে খোল-করতাল বাজাইয়া মহামন্ত্র নাম কীর্তন হইতেছে। এইভাবে ঐ নাম-রক্ষা ২৪ ঘণ্টা চলিয়াছিল। মায়ের নিকট কত অলৌকিক ব্যাপার সর্বদা ঘটিয়া যাইতেছে।

মৌনের পর রাত্রে বেশ কিছু সময় কথাবার্তা হইল—

প্রঃ—এই সংসারে এত দুঃখ কেন?

মা—যার যা স্বরূপ সে তা দেখাবে না? সংসারের স্বরূপই যে দুঃখময়।

প্রঃ—মন্ত্র-চৈতন্য কাকে বলে?

মন্ত্র-চৈতন্য অর্থ কী?

মা—যেমন বীজ মাটিতে লাগাবার পরে জল দিলে তার থেকে অঙ্কুর ও পাতা আস্তে আস্তে প্রকাশ হয়, তেমনি মন্ত্র বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করতে করতে সেই মন্ত্রের দেবতা আবির্ভূত হ'ন। তাকেই মন্ত্র-চৈতন্য বলে।

মা'র কথা শুনিবার জন্য রাত্রিতে সমস্ত প্যাণ্ডেল একেবারে ভরিয়া যায়। কিন্তু আমি ত সব সময় মা'র কাছে থাকিতে পারি না। তাই মা'র মুখের সব অমূল্য কথা শুনিতে পাই না।

আরও একজন কে প্রশ্ন করিলেন—'মা কি সন্তানের উপর কখনও রুষ্টা হ'ন?'

মা বলিলেন,—"মা কখনো রুষ্টা হ'ন না বটে। কিন্তু সন্তানের মঙ্গলের জন্য অনেক সময়ে রুষ্টার মত ব্যবহার করেন। তার দ্বারা সন্তানের ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট হয় না।"

২৫শে মে ১৯৫৮।

আজ কয়েকদিন হয় মা কালী মন্দিরের পশ্চিমে যে একটু বারান্দার মত আছে সেখানেই দুপুর বেলা বিশ্রাম করেন। কখনও কখনও সেখানেই স্নানও করেন। আশ্রমে উপরে মা'র জন্য নূতন ঘর বানান হইয়াছে। কিন্তু সেখানে না থাকিয়া, নীচে ঐ ছোট্ট একটি গলির মধ্যে কেন থাকেন তাহা রহস্যময়ী মা ছাড়া আর কে বলিতে পারে?

আজও দুপুর বেলা ভোগের পর মা সেখানেই বিশ্রাম করিতে গেলেন। অধীর ব্যানার্জী বলিয়া একজন ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী মা'র সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলিতেছিলেন। কথায় কথায় অধীরবাবুকে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, —'আর কিছু কথা আছে কি?'

রাঁচীস্থ কালী মন্দির সংক্রান্ত একটা স্বপ্ন।

তখন অধীরবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ মা, একটা কথা আছে। আমার এক বন্ধু তোমাকে বলতে বলেছেন। বন্ধুটির বাড়ী বরিশালে। বর্তমানে এখানেই থাকেন। তাদের বরিশালের বাড়ীর সামনে একটি ৺কালী মন্দির আছে। তারা নিত্য সকালে উঠেই সেই মন্দিরের ৺কালী মূর্তির দর্শন করতেন। তার মা-ও কাজকর্ম সেরে প্রায়ই সেই কালী মন্দিরের সামনে গিয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু এখানে চলে আসার পর আর মা কালীর দর্শন পান না। একদিন আমার বন্ধুটি স্বপ্নে দেখছেন যে মা কালী এসেছেন। নূতন একটি মন্দির রাঁচীতে তৈয়ারী করা সম্বন্ধে মা কালী বলছেন,— "আমি এখানকার আনন্দময়ী আশ্রমেই আছি। যা ইচ্ছা সেখানেই বলতে পার।"

এই কথার উত্তরে মা বলিলেন যে কয়েকদিন হয় যে তাঁহারও খেয়াল হইতেছিল যে কাশীর গোপাল ত অনেককে অনেক কিছু দেখাইয়াছেন, কিন্তু মা কালী লোকালয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কৈ কিছু জানাল না ত।

মা অধীরবাবুকে বলিলেন,—"তোমার বন্ধুকে মা কালী দর্শন দিয়েছেন। তাকে কাল আশ্রমে নিয়ে এস। আমরাও সকলে তার দর্শন করব।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে রাঁচীতে আমাদের আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত ৺কালীমূর্তি এত সুন্দর হইয়াছে যে তাঁহাকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ না হইয়া কেহই পারে না। বহুলোক প্রত্যহ দর্শন করিতে আসেন।

রাত্রিতে সৎসঙ্গে মাকে একজন প্রশ্ন করিল—'সাধন অবস্থায় ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা?'

মা উত্তর দিলেন,—"তুমি যেমন কলকাতা রওনা হয়েছ। কলকাতা না পৌঁছান পর্যন্ত কি কলকাতা দেখা যায়? তেমনি সাধনার সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের দর্শন হয় না।"

আর একজন প্রশ্ন করিলেন,—'সাধনার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় কি না?'

মা স্পষ্ট জবাব দিলেন,—"না। সাধনার দ্বারাই যদি ভগবানকে পাওয়া যেত তবে ত তিনি সাধনার অধীন হয়ে পড়েন। তিনি স্বয়ং প্রকাশ বস্তু। তিনি সর্বত্র এবং সব সময়েই আছেন। সাধনার দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ মুক্ত হ'লেই তুমি তাকে দেখতে পাবে। সাধনার কাজ আবরণ সরান।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মা আপনি কি ভগবানকে দেখিয়াছেন?'

মা হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"বাবা, তুমি যা বল তাই। তবে এ যে সবই তাঁর মূর্তি। তিনি অনন্ত—অনন্ত তাঁর রূপ।"

রাত্রে প্রসিদ্ধা গায়িকা শ্রীমতী রেণুকা সেন মাকে তাঁহার গান শুনাইলেন। অতি সুমিষ্ট স্বরে মাকে তিনখানা ভজন শুনাইলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার পর মা সৎসঙ্গ হইতে ফিরিলেন।

২৬শে মে ১৯৫৮।

বিকালে সৎসঙ্গের পরে মা স্থানীয় Accountant General-এর স্ত্রী মিসেস্ বর্ধনের অনুরোধে তাহার বাসায় গেলেন। সঙ্গে নারায়ণ স্বামী ও বুবা গেল। মা সেখানে গিয়া খোলা মাঠের মধ্যে বসিলেন। বুবা দুইটি গান করিল। সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছিল। তাহার পরে বর্ধন সাহেবের দুইটি মেয়েও মাকে গান শুনাইল। সেখানে কিছু সময় বসিয়া মা আশ্রমে ফিরিলেন।

আজ রাত্রে সৎসঙ্গে নারায়ণ স্বামীজী মাকে প্রশ্ন করিলেন—"ইষ্টের ধ্যান হৃদয়ে বা ভ্রূ-মধ্যে করার নিয়ম আছে। কিন্তু গুরুর ধ্যান মাথায় করতে হয়। এর কারণ কী?"

মা—"তোমাদের শাস্ত্রই নাকি বলে যে গুরুর স্থান সকলের উপরে। গুরুই ত মন্ত্র দিয়ে ইষ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তবে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে, সবার সামনে সব কথা-ত বলা আসে না।"

কথা প্রসঙ্গে মা ৺কালীমা'র সম্বন্ধেও অনেক কিছু বলিলেন। অধীর-বাবুর বন্ধুও যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছেন তাহাও মা বলিলেন। মা'র মুখে আরও শুনিলাম যে আজ মা দেখিতেছেন—একটি ছোট গ্রাম্য বালক মস্ত্ হইয়া গাহিতেছে—

"নাম করে যা, নাম করে যা, নাম করে যা, (ও মন)
নামে রুচি, ভাবে পুষ্টি, নাম করে যা॥"

সঙ্গে সঙ্গে মা-ও ভাবে বিভোর হইয়া ঐ পদগুলিই গাহিতেছিলেন। আর ইহার সঙ্গে

—"হরি নাম করে যা,
দুর্গা নাম করে যা,
কালী নাম করে যা,

শিব নাম করে যা,

মা নাম করে যা। ইত্যাদি আখর মা লাগাইতেছিলেন।

বিভূকেও বলিয়া দেওয়া হইল আশ্রমে নাম করিবার সময় যেন ঐ পদগুলিও গাওয়া হয়।

আজ রাত্রে অধীরবাবু সেই বন্ধুটিকে লইয়া মা'র নিকট আসিলেন। তাঁহার নাম শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মাকে স্বপ্নে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছেন সব কথা বলিলেন। তাঁহার বহুদিনের ইচ্ছা যে দেশের মা কালীর মন্দিরটিকে পাকা করিয়া দেন। কিন্তু এখন ত পাকিস্থান হওয়ায় তাহা কিভাবে সম্ভব। তাঁহারা বর্তমানে রাঁচীতেই বসবাস করিতেছেন, কয়েকখানা বাড়ীও করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছিলেন যেন মা কালীর মন্দির নির্মাণ করাইতেছেন। তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন মা ৺কালী তাঁহাকে বলিতেছেন,—"আমি ত এইখানেই আছি।" এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চোখের সম্মুখে আমাদের আশ্রমের এই ৺কালী মন্দিরের দৃশ্যটি যেন ভাসিয়া উঠিল। তিনি আমাদের আশ্রমে বড় আসেন না। মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর একবার মাত্র আসিয়া দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

এখন এই কালীমন্দির নির্মাণ করা সম্বন্ধে কি করা উচিত তাহা মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন,—"বাবা, চেষ্টা করে দেখ কি হয়।"

২৭শে মে ১৯৫৮।

স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে মা।

এখানকার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে আজ মা ও হরিবাবাকে লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে অনেক ভক্তও গেলেন। মিশনের সেক্রেটারী স্বামী সুন্দরানন্দজী মহারাজ মা'র যাওয়া বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেখানে পৌঁছিবামাত্র সুন্দরানন্দজী মাকে ও হরিবাবাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া

ঠাকুর মন্দির দেখাইয়া নিয়া হল-ঘরে বসাইলেন। গলায় মালা-ও পরাইয়া দিলেন। হরিবাবা তাঁহার সন্ধ্যার কীর্তন ও সৎসঙ্গ সেখানেই করিলেন।

কীর্তন অন্তে সুন্দরানন্দজী মাকে প্রশ্ন করিলেন,—"ভগবান কি করে পাওয়া যায়?"

মা উত্তর দিলেন,—"তাঁকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ডাকলেই ভগবানকে পাওয়া যায়।"

আবার তিনি মাকে প্রশ্ন করিলেন,—"ভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা কি ভাবে আসে?"

মা,—"বাবা, সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্গ আর যার যার গুরু যাকে যা দিয়েছেন, তা নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাওয়া। তিনি ত সর্বত্র প্রকাশিত আছেনই। তাঁকে পেতে বিশেষ কষ্ট করতে হয় না,—আবার অপর পক্ষে তাঁকে পেতে হ'লে অত্যন্ত কষ্ট করতে হয়, দুই-ই সত্য। বাবা, তাঁকে জানলেই নিজেকে জানা হয়; আবার নিজেকে জানলেই তাঁকে জানা হয়। একমাত্র তিনিই তো আছেন—স্বগুণে, স্বরূপে, নির্গুণে, নিরূপে। নিজেকে পেলেই ভগবানকে পাওয়া যায়।"

মা'র মুখের কথা শুনিয়া সুন্দরানন্দজী বলিলেন যে, তাঁহার মা'র ঐ শেষ কথাটি খুবই ভাল লাগিয়াছে। মিশন হইতে রাত্রি ৮৷০টার সময় রওনা হইয়া মা "প্রিয়ধামে" আসিয়া মৌনের সময় বসিলেন। মৌনের পর নানা কথাবার্তা হইবার পরে মা আশ্রমে বিশ্রাম করিতে আসিলেন।

২৮শে মে ১৯৫৮।

আজ দুপুর বেলা মা বসিয়া আছেন। নানা প্রকার কথা হইতেছে,—একজন ভদ্রমহিলা আগড়পাড়া আশ্রমের বিষয়ে বলিলেন যে ঐ স্থানটি

বহু সাধু-মহাত্মার তপস্যা-স্থান। অপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, রাঁচী আশ্রমের কোনও বিশেষত্ব নাই?"

এই কথার উত্তরে মা বলিতেছিলেন,—"একদিন দেখছি যে এই স্থানটি একটি ঘোর জঙ্গল। চারিদিকে কোনও লোকালয় নাই, কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে একটি দেবীর স্থান। সেখানে পাঁঠা বলি হয়। ঐ জঙ্গলের মধ্যে একটু স্থান হরিবাবা যেন পরিষ্কার করে কীর্তনের জায়গা করে নিয়েছেন। এর মধ্যে ৪।৫জন লোক বেশ দীর্ঘকায় সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। ঐ লোকেরা যেন তোমাদের এখানকার মহারাজ কুমারদের বংশের।"

শ্রীমতি পারুল বলিয়া উঠিল—"মা, আমরাও দেখেছি। এই সব জায়গা জঙ্গলে ভরা, আসতেও ভয় করত। এই সব জায়গা কোন-ও সময় মহারাজ কুমারদের জমিদারীর মধ্যেই ছিল।"

মা আবার বলিতেছেন—"ঐ ৪।৫জন লোক এসে যেন হরিবাবাকে বলছে,—'আমাদের এই জায়গাটা খালি করে দিন, আমরা দেবী পূজা করব ও বলি দিব'।"

এই শরীরটাও বাবাকে বলছে,—"বাবা, জায়গাটা খালি করে দেও। ওরা ত বেশী সময় এখানে থাকবে না।"

উত্তরে বাবা বললে,—"মা, জায়গাটা আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে কীর্তন আরম্ভ করেছি, এইভাবে জায়গা ছেড়ে দিলে আমরা কী ভাবে কীর্তন করব?"

মা'র মুখের এই সব কথা হইতে বুঝিলাম যে এই স্থানে পূর্বে দেবী পূজা ও কীর্তনাদিরও ব্যবস্থা ছিল। মা'র যত আশ্রম আছে, প্রায় সব স্থানেরই কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছেই।

২৯শে মে ১৯৫৮।

ইতিমধ্যে মা একদিন দেখিয়াছিলেন যে ছোটনাগপুরের মহারাজ কুমার আশ্রমে আসিয়া যেন বলিতেছেন,—আমরা আশ্রমে প্রসাদ পাইব। সেইজন্য আজ মহারাজকুমারের বাড়ীর সকলকেই আশ্রমে প্রসাদ পাইতে বলা হইল। তাঁহারা যখন ভোজন করিতেছিলেন, তখন মা নিজে দাঁড়াইয়া উপরোক্ত ঘটনাটি তাঁহাদের নিকট বলিলেন। তাঁহারা ইহা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

মা'র আদেশে আজ বিকালে দিদিমা, নারায়ণ স্বামিজী, সতী, উদাস, পুষ্প, বিমলা প্রভৃতিকে লইয়া আমি কলিকাতা রওনা হইলাম। মা'র কাল সকালে পুরী যাওয়ার কথা। মা'র সঙ্গে পরমানন্দ প্রভৃতি ৮.৯জন আছেন।

৩১শে মে ১৯৫৮।

গতকাল সকালে আমরা আসিয়া আগড়পাড়া আশ্রমে পৌছিয়াছি। মণীন্দ্র ব্রহ্মচারী খড়্গপুর হইতে আজ এখানে আসিয়াছে। তাহার মুখে শুনিলাম যে খড়্গপুর স্টেশনে ঘুরিতে ঘুরিতে সে হঠাৎ দেখে যে প্লাটফর্মের ওপর একটা বেঞ্চিতে মা শুইয়া আছেন। গাড়ী তিন ঘণ্টা লেট থাকায় মা আসিয়া খড়্গপুরে পুরী এক্সপ্রেস পান নাই। পুরী প্যাসেঞ্জারে মা রওনা হইবেন তাই সকলে স্টেশনে প্রতীক্ষা করিতেছিল। সুতরাং আজ সন্ধ্যায় মা'র পুরী পৌছিবার কথা।

মা'র কলিকাতায় প্রত্যাগমন।

আজ এখানকার নূতন আশ্রম সম্বন্ধে অনিলের সঙ্গে কথা হইতেছিল।

কথায় কথায় তাহাকে বলিলাম যে কলিকাতার বাহিরে গঙ্গার পাড়ে মা'র আশ্রমের জন্য জায়গা আমরাও অনেকদিন যাবৎ-ই খুঁজিতেছিলাম, কিন্তু পছন্দমত জায়গা কিছুতেই পাওয়া যাইতেছিল না। বরাহনগরেও একটা বাড়ী গঙ্গার পাড়ে দেখা হইয়াছিল কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা মত না দেওয়ায় সেটাও কেনা হয় নাই।

কলিকাতার নূতন আশ্রম বিষয়ে কথাবার্তা।

গত ৺কালী পূজার সময় মা'র ভক্ত চামেলী বসু কাশীতে গিয়াছিলেন। তিনি কথায় কথায় বলেন যে আগড়পাড়ায় তাঁহার ভাসুর পুত্রের একটি বাগান বাড়ী আছে। তাহাদের সেই বাড়ীটি বিক্রয় করিয়া ফেলার ইচ্ছা আছে। তাহারা এক লক্ষ টাকা চায়, কিন্তু আশ্রমের জন্য নেওয়া হইতেছে জানিলে কিছু কমও হয়ত করিতে পারে। এই সব কথা যখন মা'র সম্মুখে হইতেছিল, তখন চামেলীদি স্পষ্ট দেখিতেছিলেন যে মা সেই আগড়পাড়ার বাড়ীর পশ্চিমের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অবশ্য এই ঘটনাটি আমরা তাঁহার নিকট হইতে পরে শুনিয়াছি। ঘটনা চক্রে শেষ পর্যন্ত ঐ বাড়ীটিই আশ্রমের জন্য কেনা ঠিক হইল।

৫ই জুন ১৯৫৮।

পুরীতে চারদিন থাকিয়া মা আজ সকালে কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। গাড়ী আজও প্রায় তিন ঘণ্টা লেট ছিল। মা স্টেশন হইতে সোজা কয়েক বাড়ী ঘুরিয়া দুপুরে বিনয় ব্যানার্জীর বাড়ীতে ভোগ গ্রহণ করিলেন। সেখান হইতে বিকালে বাঙ্গুর হাসপাতালে গিয়া কাশীর চন্দ্রভালজীর পুত্রবধূ কুসুমলতাকে দেখিতে গেলেন। সেখান হইতে সন্ধ্যাবেলা আগড়পাড়া

আশ্রমে আসিলেন। মা'র দর্শনের জন্য বহু ভক্ত এখানে সারাদিন অপেক্ষা করিতেছিল।

করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের করুণা।

গঙ্গার ধারে মা গিয়া বসিবেন, হঠাৎ দেখেন দুইটি যুবক বিড়ি পান করিবার জন্য আগুন জ্বালাইতেছে। মা এমন সময় তাহাদের কাছে গিয়া হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। মাকে দেখিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি বিড়ি নিভাইয়া ফেলিল। মা পয়সা চাহিতেছেন মনে করিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহা হইতে পয়সা খুলিতে খুলিতে বলিল,—'আমরা গরীব মানুষ। আমরা আপনাকে আর কি দেব?' মা বলিলেন,—'পয়সা চাই না। ঐ যে দিয়াশেলাই দিয়ে কি ধরাচ্ছিলে তাই চাই।' তাহারা থতমত খাইয়া পকেট হইতে বিড়ির বাক্সটি বাহির করিয়া মা'র হাতে দিল। উহারা দুইজন যেন পলাইতে পারিলে বাঁচে। তাহারা চলিয়া গেলে, মা এক বাক্স সন্দেশ তাহাদের দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা কিছুটা দূর চলিয়া গিয়াছিল, কেহ গিয়া উহা তাহাদের হাতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। এই ভাবে মা কত লোককে যে কত শিক্ষা দিতেছেন তাহার কি শেষ আছে?

৭ই জুন ১৯৫৮।

সন্ধ্যার পরে মাকে রামকান্ত বোস লেনে "নব-বৃন্দাবনে" লইয়া গিয়াছিল। মা সেখানে যাইবেন, এই সংবাদ খবরের কাগজে ছাপাইয়া দেওয়ায় সেখানে মাকে দর্শন করিবার জন্য বহু লোক একত্রিত হইয়াছিল। সেখানে রাত্রি প্রায় ১০টা পর্যন্ত কীর্তন চলিল। তাহার পর মা আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৮ই জুন ১৯৫৮।

আজ স্থানীয় সব ভক্তদের আশ্রমে প্রসাদ লইবার জন্য বলা হইয়াছে। কলিকাতা হইতেও বহু ভক্ত আসিয়াছেন। সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলে মা স্বয়ং ঘি-ভাত পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময় মা স্থানীয় ভক্ত বলাইবাবুর বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহার বাসায় গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

৯ই জুন ১৯৫৮।

আজও সন্ধ্যাবেলায় আশ্রমের নিকটেই শান্তিবাবুর বাসায় মাকে লইয়া গেল। তাঁহারা মা'র আগমন উপলক্ষে মা'র বসিবার স্থানটি খুব সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায় সব কিছু নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে ভদ্রলোক এত দুঃখিত হ'ন যে, তিনি একেবারে কাঁদিয়া ফেলেন। যাহা হউক বৃষ্টি থামিয়া গেলে মা তাঁহার বাসায় গেলেন। সেখানে মা'র উপস্থিতিতে সান্ধ্য কীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণ হইল।

১০ই জুন ১৯৫৮।

আশ্রম প্রাঙ্গনে গঙ্গার পাড়ে শশধরদা'র আগ্রহে একটি ছোট খড়ের ঘর বানান হইয়াছে। ঘরের চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়া বেশ সুন্দর

করিয়া ফুলের গাছ-ও লাগান হইয়াছে। বেলা ১০ টার সময় দিদিমা, পরমানন্দজী, নারায়ণ স্বামী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া মা সেই কুটিরে প্রবেশ করিলেন। শশধরদা মাকে ও দিদিমাকে মালা চন্দন দিয়া পূজা ও আরতি করিলেন। মা'র কথামত অবনীদাদা সেখানে নারায়ণ শিলা আনিয়া মা'র কথামত নারায়ণকে তুলসী দান করিলেন।

আজ সন্ধ্যার পর কালকা মেলে মা সোলন রওনা হইলেন। বিকাল বেলাই মা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক বাড়ী ঘুরিয়া হাওড়া স্টেশনে আসিতে প্রায় ৭॥০টা বাজিয়া গেল। মা'র জন্য Air conditioned comptt. রিজার্ভ করা হইয়াছিল। দীর্ঘ পথ, গরমের দিন Air conditioned comptt. ছাড়া মা'র খুব কষ্ট হইবে এই জন্য এই ব্যবস্থা। মা'র সঙ্গে অনিল, তাহার স্ত্রী সতী, বেবী ও অধীর ব্যানার্জী চলিল। অধীর বর্ধমানে নামিয়া গেল। অনিল, সতী ও বেবী আসানসোল পর্যন্ত মা'র সঙ্গে আসিয়া মা'র নিকট হইতে বিদায় লইল।

সোলনের পথে শ্রীশ্রীমা।

১১ই জুন ১৯৫৮।

গত রাত্রি ৩টার সময় ট্রেন গয়াতে পৌঁছিলে, হরিবাবাজী ও তাঁহার দলের লোক সকলে মা'র গাড়ীতেই উঠিলেন। হরিবাবার জন্য হাওড়া হইতেই Air conditioned coach রিজার্ভ করা ছিল। সকলে মা'র সঙ্গে সোলন যাইতেছেন। সকাল ৭টায় গাড়ী মোগলসরাই স্টেশনে পৌঁছিল। আমার সঙ্গে ঊষা ও বুনি যাইতেছে। মাকে দর্শন করিবার জন্য কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং, পটল, ব্যাসজী, কমল, পানু, মাখন প্রভৃতি

অনেকেই আসিয়াছিল। অল্প সময়ের জন্য হইলেও তাহারা মাকে দর্শন করিয়া খুবই আনন্দ লাভ করে। পানু আমাদের সঙ্গে মির্জাপুর পর্যন্ত চলিল। সেখানে বেলু মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিল। এলাহাবাদ ও কানপুরে বহু ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ মা'র দর্শনের জন্য আসিলেন। মা সকলকে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া মালা ও ফল দিয়াছেন। মা'র হাত হইতে তাহা পাইয়া কি আনন্দ। এটোয়া ও আলীগড় স্টেশনেও বহু নরনারী মাতৃদর্শনে আসিয়াছিল। আলীগড়ে হরিবাবার-ও অনেক ভক্ত আসিয়াছিল।

রাত্রি ৯টায় গাড়ী দিল্লী স্টেশনে পৌঁছিল। মা'র comptt. এখানে কাটিয়া রাখিল। মাকে platform-এ চেয়ারে বসাইয়া ভক্তগণ মা'র সম্মুখে বসিল। বহু ভক্ত মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিল. রাত্রি ১০৷৷০ টায় মা'র গাড়ী কালকা অভিমুখে যাত্রা করিল। সকলে প্রণাম করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় লইল।

১২ই জুন ১৯৫৮।

পূর্ব হইতেই কথা ছিল হরিবাবা ও মা অন্যান্য কয়েকজনকে লইয়া চণ্ডীগড়ে নামিবেন আর সকলে সোজা সোলন যাইবে। ভোর ৫৷৷০টায় ট্রেন চণ্ডীগড় পৌঁছিতেই দেখা গেল বর্মা সাহেব, সন্ত লক্ষ্মণজী প্রভৃতি অনেক পাঞ্জাবী নরনারী মাকে অভ্যর্থনা জানাইতে আসিয়াছেন। মা'র সঙ্গে সঙ্গে পরমানন্দ স্বামী, বিভু, কান্তি ভাই, সদানন্দ, বুনি, উদাস ও হেমিদি নামিলেন। আমরা সোজা কালকা আসিলাম। কালকা স্টেশনে যোগী ভাইয়ের গাড়ী ছিল। তাহাতে আমরা প্রায় ১০ টায় আসিয়া সোলনে পৌঁছিলাম। মা'র আগামীকাল সকালে আসিবার কথা।

১৩ই জুন ১৯৫৮।

বেলা প্রায় ৫৷৹ টায় মা চণ্ডীগড় হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। যোগী ভাই গতকালই তাঁহার মোটর মা'র জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পথে গাড়ী খারাপ হইয়া যাওয়ায় মাকে একটি ট্যাক্সিতে আনা হইয়াছে। হরিবাবা ও তাঁহার সঙ্গীয় সকলেও আজই আসিয়া পৌঁছিলেন।

মা আসিয়া পৌঁছিলে শুনিলাম গতকাল মাকে লক্ষ্মণজীর কুটিয়াতে লইয়া যাওয়া হয়। সৎসঙ্গেরও বেশ সুন্দর আয়োজন করা হইয়াছিল। রাত্রিতে মা সেখানকার Circuit House-এ ছিলেন। বর্মা সাহেবই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের গভর্নরও মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম সকলে সেখানে বেশ ভালই ছিল।

১৫ই জুন ১৯৫৮।

হরিবাবার গুরুদেবের জন্মোৎসবে মা।

আজ হরিবাবার গুরু শ্রীমদ্ স্বামী সচ্চিদানন্দজীর জন্মতিথি। সকালে গুরুস্তোত্র পাঠ ও গুরুবিষয়ক গান হইল। হরিবাবাও তাঁহার গুরুর বিষয়ে কিছু বলিলেন। তপনকে দিয়া মা হরিবাবাকে বস্ত্র দেওয়াইলেন। উপস্থিত সকলকে মিষ্টি বিতরণ করা হইল।

ভোগের পর মা বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় কাশী হইতে পানুর telegram আসিল। গত কাল বিকালে শ্রীমৎ স্বামী শংকর ভারতীজী দেহরক্ষা করিয়াছেন। আজ তাঁহার জল সমাধি।

মদ্ শংকর ভারতীজীর দেহ-রক্ষার সংবাদ

একটু পরে কাশী আশ্রম হইতে ব্রহ্মচারী দত্তাত্রেয়ের চিঠি আসিল

যে শংকর ভারতীজী পেটের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ ঐ চিঠির সঙ্গে ভারতীজী নিজ হস্তে মাকে একখানা চিঠি দিয়াছেন। তাঁহার সাধনায় আগেকার উপদ্রব তখনও চলিতেছিল। মা'র নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

ভারতীজী কাশীতে মা'র সঙ্গে কয়েকবার দেখা করিয়াছেন। তাঁহার মত বিদ্বান, ত্যাগী ও সাধক আজকাল খুব-ই বিরল। মা-ও তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্যের খুব প্রশংসা করিলেন। তের দিনের দিন কাশীতে তাঁহার স্মৃতিকল্পে সন্ন্যাসীদের ভাণ্ডারা দিবার জন্য লিখিয়া দেওয়া হইল।

১৬ই জুন ১৯৫৮।

শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত দেওগণজীর মুখে কয়েকটি ঘটনার কাহিনী।

আজ বিকালে মা'র পুরাতন ভক্ত শ্রীদেওগণজী মা'র দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি মা'র সম্মুখে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন।

কিছুদিন পূর্বে তাঁহার ছেলে কঠিন এগ্‌জিমা রোগে ভুগিতেছিল। সব রকম চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল না হওয়ায় মাঝে মাঝে খুব দুঃখ করিয়া মা'র চরণে প্রার্থনা জানাইতেন। এবার মা ও হরিবাবা ছেলেটিকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

দেওগণজী যেখানে ছিলেন সেখানকার একটি মন্দিরের পূজারী পাহাড়ের উপরে থাকিত। পূজারীর দেওগণের সহিত পরিচয় ছিল না। এমন কি নামও জানিত না। একদিন পূজারী স্বপ্নে দেখিতেছেন, একটি মোটরে একজন খুব সুন্দরী মহিলা, সাদা পরিষ্কার কাপড় পড়িয়া আসিয়া তাঁহার

নিকটে দাঁড়াইয়াছেন। সঙ্গে আরও দুইটি মেয়ে আছে। মহিলা আসিয়া পূজারীকে বলিলেন,—"শুয়ে আছ কেন? ওঠো, এই ঔষধ দিয়ে দেওগণের ছেলের চিকিৎসা কর।" এই বলিয়া তিনি একটি ঔষধের নাম করিলেন। সেই পূজারী দেওগণ বলিয়া কাহাকেও জানিত না। অতি কষ্টে খোঁজ করিয়া দেওগণজীর সঙ্গে দেখা করিল। পূজারীর মুখে স্বপ্ন-দৃষ্ট মহিলার বর্ণনা শুনিয়া দেওগণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে ঐ মহিলা মা ভিন্ন আর কেহই নহেন।

সেই পূজারী প্রদত্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেওগণের ছেলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। আমরা ইহা শুনিয়া খুবই আশ্চর্য হইলাম।

দেওগণজী আর একটি ঘটনার বিষয় বলিলেন। তাঁহার স্ত্রী মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের উপর কোনও এক সাধুকে দেখিতে যাইতেন। একদিন তিনি অপর এক মহিলার সঙ্গে সেই সাধুটির নিকট যাইতেছেন, এমন সময় একটি খুব বড় সাপ দেওগণজীর স্ত্রীর শরীর ও পা জড়াইয়া ফেলিল। সঙ্গের স্ত্রীলোকটি ইহা দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। দেওগণজীর স্ত্রী মা'র নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। আশ্চর্য একটু পরে সাপটি নিজ হইতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সঙ্গের স্ত্রীলোকটি খানিক পরে চৈতন্য লাভ করিলে তাঁহারা দুইজনে পাহাড়ের উপর সাধুর নিকট যাইতেই সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেমন আছ?'

তাহার পর তিনি বলিলেন যে তিনি সেখানে বসিয়াই দেখিতেছিলেন যে আনন্দময়ী মা তাঁহাদের নিকট আসিয়া সাপটিকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিতেই সে ধীরে ধীরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এই দুইটি ঘটনার পর হইতেই দেওগণজী ও তাঁহার স্ত্রীর মা'র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

১৮ই জুন ১৯৫৮।

যোগী-ভাইয়ের ইচ্ছায় আজ হইতে দেবী ভাগবৎ পারায়ণ আরম্ভ হইল। সিমলা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত আচার্য্য দিবাকর দত্ত শর্মা পাঠ করিলেন।

১৯শে জুন ১৯৫৮।

"কল্যাণের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত হনুমান প্রসাদ পোদ্দারজী "মানব অংক" প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে মা'র কিছু বাণীর জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিয়াছেন। কিন্তু মা ত সাধারণতঃ কাগজ-পত্রে প্রকাশিত করিবার জন্য কোন-ও কথা বলেন না। কিন্তু হনুমান প্রসাদজীর অনুরোধের কথা শুনিয়া হঠাৎ হাসিতে হাসিতে যাহা বলিয়া উঠিলেন, তাহাই পাঠাইয়া দেওয়া হইল—

"অতিমানব, মহামানব, অনুকূল ক্রিয়াসে আপনা আবরণ আপনি হটায় কে প্রকাশ হো। নিত্য স্বয়ং প্রকাশ তো হ্যয় হী।"

২৬শে জুন ১৯৫৮।

মায়ের নিকট হিমাচল প্রদেশের গভর্ণর।

আজ সন্ধ্যার পর হিমাচল প্রদেশের গভর্ণর ভদ্রির রাজাসাহেব সপরিবারে মা'র দর্শনের জন্য সিমলা হইতে আসিয়াছিলেন। নিভৃতে মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাও বলিলেন।

২৬শে জুন ১৯৫৮।

আজ দেবী ভাগবৎ পাঠের সমাপ্তি। পাঠ সমাপ্তির পরে যেমন ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অমনি ঘন মেঘ করিয়া প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়া গেল।

এবার বৃষ্টির অভাবে সোলন-সিমলাতে জলের জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ এইভাবে হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায় সকলেই একবাক্যে রাজাসাহেবের পুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গতকালই কেহ কেহ আসিয়া মায়ের নিকট কাতরভাবে বর্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া গিয়াছেন।

১লা জুলাই ১৯৫৮।

কয়েকদিন হয় আমি পুনরায় বম্বে আসিয়াছি। আমার শরীর সোলনে একপ্রকার ভালই ছিল। যোগীভাইয়েরও ইচ্ছা ছিল যে আমি সোলনে গরমের ২।১ মাস থাকি। কিন্তু হঠাৎ মা'র খেয়াল হইল আমাকে বম্বে পাঠাইবেন। মা'র নির্দেশে অগত্যা আমাকে বম্বে চলিয়া আসিতে হইল। স্বামী পরমানন্দজী আমাকে বম্বে পৌঁছাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। এখানে আসিবার পরেই শরীরটা যেন ধীরে ধীরে খারাপ হইয়া পড়িল। জ্বর ও মাথার যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল।

৭ই জুলাই ১৯৫৮।

সোলনে গুরু-পূর্ণিমা।

সোলনের পত্রে মা'র সংবাদ আসিল। গত ১লা রাজাসাহেবের ওখানে গুরু-পূর্ণিমা উৎসব বেশ ভাল মত হইয়া গিয়াছে। মা নারায়ণ শিলাকে নিজের কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই বেশ সুন্দর মত পূজা হইয়াছে। গুরু-

পূর্ণিমা উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত গিয়া সোলমে সমবেত হইয়াছিল। উৎসবে সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিল।

২১শে জুলাই ১৯৫৮।

কাশীর পত্রে জানিলাম মা গত ১৬ই সন্ধ্যায় হঠাৎ কাশী রওনা হইয়া আসিয়াছেন। সেখানে আজ হইতে কানিয়া ভাই বিষ্ণুযজ্ঞ, রুদ্রাভিষেক ও শ্রীমদ্ভাগবৎ সপ্তাহ পারায়ণ করাইবেন। সেইজন্যই মা এই গরমের মধ্যেও কাশী চলিয়া গিয়াছেন। কানিয়া ভাই-ও এই উপলক্ষে কাশী গিয়াছেন। আজ আমি বম্বে হইতে দিল্লী আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম।

কাশী আশ্রমে কানিয়া ভাইয়ার যজ্ঞ, পারায়ণ আদি এবং তৎসংক্রান্ত ইতিবৃত্ত।

১লা আগষ্ট ১৯৫৮।

কাশী হইতে চিঠি আসিয়াছে যে সেখানে মা'র উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান বেশ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। যদিও কানিয়া ভাই কাশীতে বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই, তিনি অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার পরদিনই বম্বেতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই অনুষ্ঠানের পিছনে কিছু ইতিহাস-ও আছে। কানিয়া ভাইয়ের পরিচিত একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কামনা ছিল কাশীতে গঙ্গাটতে এইরূপ অনুষ্ঠান করান। কানিয়া ভাই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তাঁহার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করিবার প্রতিশ্রুতি কানিয়া ভাই তাঁহাকে দিয়াছিলেন। মায়ের নিকটেও এই বিষয়ে প্রার্থনা জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই কোন অনুষ্ঠান করান সম্ভবপর

হয় নাই। মা-ও চুপ করিয়াই ছিলেন। ইতিমধ্যে সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত-ও খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। হঠাৎ এবার মায়ের খেয়ালে সেই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা এই তীব্র গরমের মধ্যেও কাশীতে স্থির হইয়া গেল।

পরম আশ্চর্যের সংবাদ এই যে কাশীতে অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়া মাত্র কানিয়া ভাই তার যোগে সেই বৃদ্ধকে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করেন। মুমূর্ষু বৃদ্ধ এই সংবাদ পাওয়ার পরই পরম শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মায়ের অসীম কৃপায় সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অন্তিম বাসনা এই ভাবে পূর্ণ হইল।

৪ঠা আগষ্ট ১৯৫৮।

চিঠিতে সংবাদ পাইলাম মা গত ৩১শে দুপুরে কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গিয়াছেন। কয়েকদিন সেখানে থাকার কথা।

আর একটি ঘটনার বিষয়েও জানিলাম। ইতিমধ্যে মা একদিন সূক্ষ্মে দেখিয়াছেন ভোলানাথের বড় ভাই ৺রেবতী মোহন চক্রবর্তীকে। বয়স খুব বেশী না। এমন স্থানে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন যেখান দিয়া মা চলিয়া যাইতেছেন। মাকে আশুর বাবা খুবই স্নেহ করিতেন। মা-ও বধু অবস্থায় যথাসম্ভব তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহার কাছ দিয়া যাইবার সময় মা'র মুখ দিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহামন্ত্র বাহির হইল। এই নাম শুনিয়াই রেবতীবাবু বলিয়া উঠিলেন,— "ইহা তোমার মুখ হইতে শুনিবার জন্যই ত এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

একটি ঘটনা।

কত ভাবে যে মা কত লোককে কৃপা করিয়া উদ্ধার করিতেছেন, তাহা কে বলিবে!

৭ই আগষ্ট ১৯৫৮।

কাশীর পত্রে জানিলাম মা গত ৪ঠা সকালে কাশী ফিরিয়া আসিয়াছেন মা'র সঙ্গে ডাঃ পান্নালাল, বম্বের জিতেন দত্ত প্রভৃতি কেহ কেহ আছেন। কাশীতে একদিন মাত্র থাকিয়া পরশু সকালে মা দেরাদুন রওনা হইয়া গিয়াছেন। সঙ্গে মাত্র নারায়ণ স্বামী, ভরত, অনুসূয়া এবং অন্যান্য ২।১জন। বিন্ধ্যাচল হইতে আসিবার পূর্বের দিন শ্রীযুক্ত তুষার কান্তি ঘোষ মহাশয় মাকে তাঁহার নূতন বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে মা'র সম্মুখে কীর্তন ইত্যাদি হইল। পাহাড়ের নীচে পুষ্করিণীর ধারে বেশ সুন্দর বাড়িটি করিয়াছেন।

১০ই আগষ্ট ১৯৫৮।

দেরাদুন হইতে চিঠি আসিয়াছে মা সেখানে বেশ একান্তে আছেন। কিষণপুর আশ্রমেই থাকেন। মাঝে মাঝে একবার কল্যাণ বনে ঘুরিয়া আসেন।

ইতিমধ্যে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছিলেন। তিনি স্যর আশুতোষের দৌহিত্র। পূর্বে আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বর্তমানে পাকিস্থানে ভারতের উপরাষ্ট্র-দূত হিসাবে শীঘ্রই ঢাকা যাইতেছেন।

রমনা আশ্রমের ইতিহাস।

মা'র সঙ্গে নাকি রমনা আশ্রম সম্পর্কে অনেক কথা হইয়াছে। কথা-প্রসঙ্গে মা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে বর্তমানে যেখানে রমনা আশ্রম অবস্থিত সেখানে পূর্বে ঘোর জঙ্গল ছিল। কোনও এক সময় লোহাগড়ের রাজা সেখানে শিকার করিতে গিয়া দেখিতে পান যে একজন জটাজুটধারী সাধু ধুনী

জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে বাঘ এবং হরিণ পাশাপাশি বসিয়া আছে। সেই সাধুকে দর্শন করিয়া রাজা খুবই আনন্দিত হ'ন।

উত্তরকালে যখন আশ্রমের বুনিয়াদ খনন করা হইতেছিল, তখনও সাধুদের সমাধি ঐখানে পাওয়া যায়। একজন সাধুর সমাধি ত পদ্মাসনে বসা অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতেই নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সেখানে বহু বৎসর পূর্বে সাধুদের স্থান ছিল। সেই সমাধি এবং অস্থি-সকল যে-ভাবে ছিল সেইভাবেই রাখিয়া তাহাদের উপরেই আশ্রম নির্মিত হয়। একস্থানে ত পোড়ামাটিও পাওয়া গিয়াছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম যে ঐ স্থানে হয়ত কোন যজ্ঞ হইয়াছিল। ঠিক সেই স্থানেই মায়ের নির্দেশে অগ্নি স্থাপনা করিয়া নিত্য যজ্ঞ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই অগ্নিই এখনও ৩০।৩২ বৎসর পরে কাশী আশ্রমে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

১৬ই আগষ্ট ১৯৫৮।

আজ সকালে মা মুসৌরী একস্‌প্রেসে দিল্লী আসিয়া পৌছিলেন। স্টেশনে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বর্মা সাহেব তাঁহার গাড়ীতে মাকে আশ্রমে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন।

১৭ই আগষ্ট ১৯৫৮।

বিকাল বেলা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদজীর ভগ্নী মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। বৃদ্ধার বয়স প্রায় ৮৫ বৎসরেরও অধিক, চোখেও কম দেখেন,

কানেও কম শোনেন। কেহ ধরিয়া না উঠাইলে, উঠিতেও পারেন না। কিন্তু মায়ের এমনই আকর্ষণ যে এই অবস্থাতেও মা'র দর্শনে না আসিয়া পারেন না। প্রায় দুই ঘণ্টা মা'র কাছে বসিয়াছিলেন। পরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

অন্তরসাক্ষী মা।

সন্ধ্যাবেলা মা হল-ঘরে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ ছুটিয়া যেন বাহির হইয়া আসিলেন। সঙ্গে কাহাকেও আসিতে নিষেধ করিলেন। দেখা গেল বাহিরে মোটরের মধ্যে মহারতনজী বসিয়া আছেন। তিনি খুবই অসুস্থ। পায়ে হাঁটিয়া আশ্রমের ভিতরে আসিয়া দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই। মাকে তাঁহার আসিবার খবর কেহই দেয় নাই অথবা ভিতর হইতে মোটর দেখাও যায় না। তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতায় মা নিজেই ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া গেলেন।

২৪শে আগষ্ট ১৯৫৮।

দিল্লীতে ঝুলন উৎসব।

আজ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব আরম্ভ। এবার দিল্লীর ভক্তদের ঐকান্তিক আগ্রহে ঐখানেই ঝুলন উৎসব হওয়া স্থির হইয়াছে। নাম-ব্রহ্ম মন্দিরের পূর্বদিকে আধুনিক রুচি অনুসারে ঝুলন মঞ্চ খুব সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। ব্রহ্মচারী সুশীলই পরিশ্রম করিয়া সব করিতেছে। ঝুলার দুই ধারে খুব সুন্দর করিয়া আলপনা দেওয়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় কয়েকটি বিগ্রহকে বস্ত্র ও অলংকার দ্বারা সাজাইয়া ঝুলায় স্থাপন করিয়া কুসুম ব্রহ্মচারী মায়ের উপস্থিতিতে পূজা করিল।

২৫শে আগষ্ট ১৯৫৮।

আজ ঝুলন দ্বাদশী। আজ-ই ভাইজীর তিরোধান তিথি। বেলা পৌনে তিনটা হইতে সোয়া তিনটা পর্যন্ত আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা মায়ের সান্নিধ্যে ধ্যান করিল।

সন্ধ্যা বেলা শ্রীযুক্ত সুবিমল দত্ত মহাশয় মা'র দর্শনে আসিয়া মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা-বার্তা বলিলেন। ভদ্রলোকও ভাইজীর দেশেরই, চট্টগ্রামেই বাড়ী। বেশ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। চেহারাতেও ভাইজীর সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যাইবার সময় অনেকক্ষণ হাত জোড় করিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

বিকালে মা'র উপস্থিতিতে হল-ঘরে ভাইজীর জীবনী এবং উপদেশ আলোচনা হয়। সোলনের রাজা সাহেব ভাইজীর বিশেষ অনুরক্ত। ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত, নারায়ণ স্বামিজী প্রভৃতি কয়েকজন ভাইজীর জীবন আলোচনা করিলেন।

২৮শে আগষ্ট ১৯৫৮।

ঝুলন পূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষে সকাল হইতেই সকলে সাজাইবার ও গুছাইবার কাজে ব্যস্ত। সর্দার যোগেন্দ্র সিং বহুমূল্য সোনা-রূপার কাজ করা কিংখাবের তাকিয়া ও মস্‌নদ লইয়া আসিয়াছেন। খুব-ই সুন্দর ভাবে ঝুলন উৎসব হইয়া গেল।

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

আজ বিকালে আপার ইণ্ডিয়া একস্‌প্রেসে মা কাশী রওনা হইলেন। জন্মাষ্টমীতে মাকে সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য কন্যাপীঠের মেয়েরা বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছে। ডাক্তাররা বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন আমি যাহাতে এখানে কয়েক মাস বিশ্রামে থাকি। তাই মা আমাকে এখানে রাখিয়া গেলেন। যাইবার সময় মা আমাকে শরীর সম্বন্ধে বার বার বলিয়া গেলেন। আরও বলিলেন,—"দিদি, ডাক্তারদের একেবারে চমক্ লাগিয়ে দেও।"

মা'র সঙ্গে আগা সাহেব সস্ত্রীক কাশীতে যাইতেছেন। তাই মাকে তাঁহারা তাঁহাদের সেলুনেই লইয়া গেলেন। অবশ্য বলা বাহুল্য তাঁহাদের সকলের ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট কিনিয়া নেওয়া হইল।

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

আজ কাশী হইতে মা'র পৌঁছান সংবাদ আসিল। মা'র শরীর কাশীতে গিয়া একপ্রকার ভালই আছে। মেয়েরা এবং আশ্রমবাসী সকলেই মাকে পাইয়া খুব আনন্দিত।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

চিঠিতে জানিলাম গত ৭ই বিকালে মা বিন্ধ্যাচলে গিয়া পরশু আবার কাশীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গতকাল দিল্লী হইতে মণ্ডির রাজাসাহেব

ও টিহরীর রাজমাতা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সোলন হইতে যোগীভাইও আসিয়াছেন, আজ আনন্দময়ী করুণার একটি বিশেষ মিটিং আছে। সেই উপলক্ষেই তাঁহারা সকলে আসিয়াছেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

বিন্ধ্যাচলের পত্রে জানিলাম গত ১২ই সকালেই মা বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে কাশী হইতে টিহরীর রাজমাতা, মণ্ডীর রাজা সাহেব, টিহরীর মহারাজা, অনিল গাঙ্গুলী, যোগীভাই প্রভৃতি সকলকে লইয়া পানু বিন্ধ্যাচলে গিয়াছিল। সেইদিন রাত্রে বেলু কালী পূজার আয়োজন করিয়াছিল। মা-ই তাহাদের সকলকে যাইতে বলিয়াছিলেন। পূজা নাকি খুবই সুন্দরভাবে হইয়াছে। মা, কবিরাজ মহাশয় এবং আরও অনেকে পূজার শেষ পর্যন্ত বসিয়াছিলেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

কাশীর চিঠিতে জানিলাম মা গত ১৭ই ভোরে কাশী ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই কয়টি দিন মা বিন্ধ্যাচলে বিশ্রাম করিয়াছেন।

পূর্বের প্রোগ্রাম অনুসারে মা খুব সম্ভবতঃ ২১শে কি ২২শে কলিকাতা যাইতেছেন। সেখানে দ্বিজেন নাগের গৃহ-প্রবেশ উৎসব হইবার কথা। আবার ইহাও শুনিলাম যে একটি বিশেষ কারণে গৃহ-প্রবেশ উপস্থিত স্থগিত হইতে পারে এবং তাহা হইলে হয়ত মা এখন আর যাইবেন না।

গতকাল সংবাদ আসিয়াছে যে আগামী ২২শে বম্বে হইতে ডাঃ শেঠ দিল্লী আসিতেছেন। পুনরায় আমার লাম্বার পাংচার করা হইবে পরীক্ষার জন্য।

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

আজ দিল্লী মেলে কাশী হইতে মা হঠাৎ রাত্রে আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে ভাইয়া, পরমানন্দ, কমল ও বুনি আসিয়াছে। মাকে আকস্মিক ভাবে পাইয়া আমাদের খুবই আনন্দ।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

দিল্লী আশ্রমে প্রায় ৯ দিন থাকিয়া মা আজ সকালের ট্রেনে দেরাদুন রওনা হইয়া গেলেন। কোথায় যাইতেছেন, কাহাকেও সংবাদ দেওয়া হয় নাই। মা'র সঙ্গে পরমানন্দ স্বামী, বুনি, ভরতভাই এবং আর মাত্র ২।১ জন লোক গেল।

২রা অক্টোবর ১৯৫৮।

দেরাদুন হইতে বুনির চিঠি আসিয়াছে। মা পরশু সন্ধ্যার পর দেরাদুনে পৌঁছিয়া সোজা কল্যাণ বনে চলিয়া যান। সেখানেই আছেন। শরীর এমনি মোটামুটি ভালই আছে।

৭ই অক্টোবর ১৯৫৮।

হরিবাবাজী মহারাজ মাকে হুসিয়ারপুর যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইতেছিলেন। মা তাই এইরূপ খারাপ শরীর লইয়াও গতকাল দেরাদুন হইতে সোজা হুসিয়ারপুর রওনা হইয়া গিয়াছেন। সঙ্গে কে কে গিয়াছে সংবাদ পাই নাই।

১৩ই অক্টোবর ১৯৫৮।

মা গতকাল হুসিয়ারপুর হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। আজ সকালেই আবার কালকা মেলে কাশী রওনা হইয়া গেলেন। ১৪ই এলাহাবাদ পৌঁছিবার কথা। এবার এলাহাবাদের ভক্তেরা মা'র উপস্থিতিতে ৺দুর্গা-পূজার আয়োজন করিয়াছেন।

১৬ই অক্টোবর ১৯৫৮।

এলাহাবাদ হইতে বুনির চিঠিতে জানিলাম মা গত ১৩ই রাত্রি প্রায় ১১টায় কাশী আশ্রমে গিয়া ভাল মত পৌঁছিয়াছেন। ট্রেনে মা বেশ ভালই ছিলেন।

১৪ই সকালে আশ্রমে ডাঃ গোপাল দাশগুপ্তের ইচ্ছায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গরম জামা ও মিষ্টি দেওয়া হয়। বিকালেই মা মোটরে এলাহাবাদ রওনা হইয়া যান। এলাহাবাদে পৌঁছিয়া প্রথমে মা বিন্দুদের বাড়ী যান। সেখানে মা'র জন্য নূতন একটি বাড়ী বানাইয়াছে। তাহার

গৃহ-প্রবেশ করিয়া মা পরে এলেনগঞ্জে সত্যগোপাল গীতাশ্রমে চলিয়া যান। সেখানে পূজার পূর্বে তিন দিন থাকার কথা।

২০শে অক্টোবর ১৯৫৮।

এলাহাবাদে দুর্গাপূজা।

সংবাদ পাইলাম মা গত ১৭ই সকালে বিন্দুর বাড়ীতে চলিয়া আসেন। কিন্তু ঘরটি নূতন বলিয়া খুব ঠাণ্ডা থাকায় মা'র জন্য বাগানে পৃথক তাঁবু লাগাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও মা'র ঠাণ্ডা লাগিয়া কোমড়ে একটা ব্যথা হয়। ১৮ই ষষ্ঠী পূজার দিন মা বালেশ্বরী প্রসাদজীর বাড়ীতেই ছিলেন।

পূজার জন্য নাকি বালেশ্বরী প্রসাদজীর বাড়ীতে বিরাট প্যাণ্ডেল করা হইয়াছে। এলাহাবাদের ভক্তদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পূজার প্যাণ্ডেল ও সাজসজ্জা নাকি খুবই সুন্দর হইয়াছে। পূজা উপলক্ষে কাশী হইতে কন্যাপীঠের মেয়েরা এবং আলমোড়া হইতে বিদ্যাপীঠের ছেলেরাও সকলে আসিয়াছে। তাহা ছাড়া নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী আসিয়া মা'র চরণে উপস্থিত হইয়াছে।

২৭শে অক্টোবর ১৯৫৮।

কাশী হইতে বুনি চিঠি লিখিতেছে এলাহাবাদে পূজা খুব ভাল মত শেষ হইয়া গিয়াছে এবং মা ২০শে কাশী ফিরিয়া গিয়াছেন।

সপ্তমীর দিন রাত্রিতে সকলেই খুব আনন্দ পাইয়াছে। কিন্তু অষ্টমীর

দিন সন্ধ্যায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সকলেই বৃষ্টির জন্য মা'র কাছে বারবার কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। মা'র ত কথা,—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। দেখ কি হয়।"

প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য নীরজবাবুর বাড়ীতে তাঁবুতে থাকা অসম্ভব বলিয়া মা নিজেই খেয়াল করিয়া শ্রীযুক্ত গোপাল স্বরূপ পাঠকজীর বাসায় চলিয়া যান। সেখানে মা'র থাকার উপযুক্ত পৃথক ঘর আছে। গত ৺সরস্বতী পূজায় মা সেই ঘরটিতেই ছিলেন। কিন্তু ৺দুর্গা পূজায় মা নীরজবাবুর বাসায় না থাকিয়া তাঁহাদের ওখানে আসিয়া থাকিবেন ইহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাই মাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

নবমীর দিন সকালে বৃষ্টি থামিয়া সব পরিষ্কার হইয়া গেল। পূজার প্যাণ্ডেল জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। তাই মা'র নির্দেশ মত সমস্ত প্যাণ্ডেলে তক্তপোষ বিছান হইয়াছিল, তাহাতে কা'রো আর অসুবিধা হয় নাই।

দশমীর দিন মা খুব সুন্দর লাল চওড়া পাড় একটি সিল্কের শাড়ী পড়িয়া মণ্ডপে বসিয়াছিলেন। বিসর্জন হইয়া যাওয়ার পরে মা হঠাৎ পুষ্পাঞ্জলির ফুল বেলপাতা মুঠি মুঠি করিয়া ছড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে পূজক কুসুম ব্রহ্মচারীর উপরে। তাহার পর, যাহারা নিকটে ছিল, তাহাদের সকলের উপরেই দুই হাতে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে নাকি আর ভুলিবে না। সর্বশেষে মা দিদিমার গায়ে ফুল ছিটাইয়া, দিদিমাকে দুই হাতে জড়াইয়া তাঁহার কোলে মুখ রাখিয়া যেন প্রণাম করিলেন। পরে মা বলিলেন,—"এই শরীরে ত পুষ্পাঞ্জলি হয় না। তাই এ হয়ে গেল।"

দশমীর দিন সন্ধ্যায় ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রমের অনেকেই আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে মা'র আশ্রমে তিন-রাত্রিবাসের সূত্রপাতের ইতিহাস লইয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়।

অনেক বৎসর আগের কথা। বেরেলি হইতে মহাষ্টমীর রাত্রে মা একবার সত্যগোপাল আশ্রমে হঠাৎ রাত্রি একটার সময় গিয়া উপস্থিত হ'ন। মা উপর তলাতেও গিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু এমন যোগাযোগ যে মাকে রাত্রিটা আশ্রমে থাকিতে অনুরোধ করিতে ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয় ভুলিয়া গেলেন। মা সেখান হইতে মধ্য রাত্রির পরে আসিয়া জিতেন দাদার বাড়ীতে গাড়ী বারান্দায় শুইয়া থাকেন। মা-ত বাড়ীর ভিতরে যাইবেন না। পরে ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের খুবই মনে কষ্ট হয় যে তাঁহার কেন এমন ভুল হইল। পরদিন তিনি মাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানান যে,—"তুমি এলে আর আমি তোমাকে থাকতে দিলাম না। এ আমি কি করলাম? এবার থেকে প্রতি বছর জন্মাষ্টমীর পর ও ৺পূজার আগে তিন রাত্রি তুমি এখানে এসে তোমার ঘরে থাকবে।"

শ্রীশ্রীমায়ের সত্যগোপাল আশ্রমে তিন-রাত্রিবাসের ইতিহাস।

সেই হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই মা'র ৺পূজার পূর্বে তিন রাত্রি থাকা হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। অবশ্য মা'র ত কোনও বন্ধন নাই। মা'র এক কথা,—"যা হয়ে যায়।"

আরও কয়েকটি কথা মনে পড়িয়া গেল। কান্তিভাই ভাগবৎ পাঠ করে। তাহাকে মা একদিন বলিতেছিলেন,—"পাঠের সময় যদি আমি বক্তা, এই ভাব থাকে তাহলে তা নিষ্কাম ভাবে করা হলো না। যিনি বলেন, তিনিই শোনেন, এবং তিনিই সেই রসে তৃপ্ত হ'ন। গঙ্গায় স্নান করে যেমন পবিত্র হওয়া, তেমনি ভাগবৎ মহাসাগরে তুমি নিজে স্নান করে আরো পাঁচজনকে স্নান করবার সুযোগ দিলে। আমি তার যন্ত্র হিসাবে বলছি, এই ভাবটি নিলে বলবার প্রকাশটি আরও সুন্দর হবে। ভাগবৎ সাগরে ডুব দাও।"

মায়ের শ্রীমুখে নানা কথা।

আর একদিন মা আরতি করা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন,—"আরতি করা মানে তাঁতে রত হওয়া। তোমার ইষ্ট বিশ্বব্যাপক, তাই চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আরতি করা হয়।"

বাজিতপুরে মা'র যখন সাধনার খেলা চলিতেছিল, তখন মা বাইরের কোনও উপকরণ নিয়ে আরতি করিতেন না। মা'র কথায়,—"এই শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আরতি করা হতো। ছন্দ-বদ্ধ হয়ে শরীর তরঙ্গে তরঙ্গে দুলত। এক একটা পঞ্চতত্ত্বের ক্রিয়া শরীরে হয়ে যেতো। তোমরা যে যে দ্রব্য নিয়ে আরতি করো, সেগুলি পঞ্চতত্ত্বের প্রতীক রূপ। যেমন দীপ অর্থাৎ দৃষ্টি; এ শরীরের দৃষ্টি দিয়েই আরতি করা হ'তো। আবার ধূপ, অর্থাৎ গন্ধ, শঙ্খের জল, কাপড় অর্থাৎ আবরণ, চামর অর্থাৎ বায়ু এই সব দিয়ে আরতি হয়ে যেতো। আর আরতির শেষে যে শঙ্খ ধ্বনি হয় তাতে নিজেকে আহুতি দিয়ে তার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।"

৩০শে অক্টোবর ১৯৫৮।

বিন্ধ্যাচল হইতে চিঠি আসিয়াছে। মা গত ২৮শে খাওয়া-দাওয়া করিয়া পরে মোটরে বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া যান। তাহার পূর্বদিন কাশী আশ্রমে মেয়েরা লক্ষ্মী পূজা করিয়াছে। কন্যাপীঠের ঠাকুর ঘরে মাকে সিংহাসনের উপরে বসান হইয়াছিল। মেয়েরা সেখানে পৃথক ভাবে পূজাও করিয়াছিল। একটি মেয়ে মাকে পূজার সময় বলিয়াছিল,—"মা, তুমি যে এ ঘরে আছ তা যেন আমরা বুঝতে পারি"। মা হাসিয়া উত্তর দেন, "আমি সব সময়ই এখানে থাকি।"

২রা নভেম্বর ১৯৫৮।

মা এখনো বিন্ধ্যাচলেই আছেন। নানা স্থান হইতে অনেকেই গিয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাশী হইতে গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এবং অমূল্যদাদাও আসিয়াছেন।

চিত্রার পত্রে জানিলাম, একদিন ডাঃ পান্নালালজীর সঙ্গে প্রভাসে গিয়া মা'র যে ভাবান্তর হইয়াছিল সেই বিষয় লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। মা বলিয়াছেন প্রভাসে যে গাছের তলায় শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ হয় সেখানে গিয়া মা'র শরীরের ভিতর একটা গতি আরম্ভ হয়। মা'র কথা,—"তাহাকে ক্রিয়াও বলিতে পার। শরীরের প্রতি শিরায় শিরায় একটা শব্দ হ'তে থাকে। তার পরে যেন একটা শান্ত ভাব। এই যে চলা-ফেরা, কথাবার্তা বলা আদি জাগতিক ব্যবহার তা আর না হওয়ার দিকটা এখন এসে পড়তে পারত।"

প্রভাসতীর্থ দর্শনে শ্রীশ্রীমায়ের ভাবান্তর প্রসঙ্গ।

মা'র নিজের খেয়ালেই ঐ ভাবটি আসিয়াছিল আবার নিজের খেয়ালেই তাহা চলিয়া গেল। মোটরে উঠিয়া মা হঠাৎ হরিবাবার হাতখানি নিয়া তাঁহার হাতের পাতায় নিজের ৫টি আঙ্গুল একত্রিত করিয়া কিছু দিবার মত মুদ্রা করিয়াছিলেন। জাগতিক বস্তু অবশ্য মা কিছুই দেন নাই। পরে অবধূতজীর নিকট হরিবাবা বলিয়াছিলেন যে মা'র নিকট হইতে তিনি যাহা পাইয়াছিলেন তাহা তিনি রাখিতে পারেন নাই। তিনি ঐদিন নাকি বেশ কয়েক ঘণ্টা নিজেকে এক বিশেষ ভাবে অভিভূত বোধ করিয়াছিলেন।

মা'র কয়েকটি কথা পৃথক ভাবে আমার নিকট লেখা ছিল। তাহা এই—একবার কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন,—"আমি অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপ। যতটা তোমার শক্তি ততটা করে যাও। কোনও একটা শক্তি লাগাতে

লাগাতে ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যে পড়াশোনা করে তাহার কথা বলার ভঙ্গীই একটু আলাদা হয়। সেই রকম পরমার্থের দিকে যাত্রা করলে, চলতে চলতে শক্তির সৃষ্টি হয়। এই যাত্রায় যা সরে যাবার তা সরে যাবে আর ধীরে ধীরে যা নিত্য, সত্য; বুদ্ধ, মুক্ত তা প্রকট হয়ে যায়। লক্ষ্যে সর্বদা দৃষ্টি রাখা। লক্ষ্যভেদের জন্য যেমন তীর লাগিয়ে রাখা। 'তুমি' 'তুমি' করে আপনাকে ডোবাও আর 'আমি' 'আমি' করে তোমাকে ডোবাও।" এই প্রসঙ্গেই মা'র দেওয়া আর একটি উপমা :—

হাঁড়িতে যখন চাল ফোটে তখন একটা প্রেসারের সৃষ্টি হয়, যাহার দরুণ উপরের ঢাকনা আপনা হইতেই খুলিয়া পড়িয়া যায়। জোর করিয়া তাহা আর খুলিতে হয় না। সেইরূপ আমাদের যতটুকু শক্তি তাহা কাজে লাগাইলে বাকীটা তিনিই করিয়া নেন। ভাব অভাব হইতে ব্যাকুলতা আসে, তাহাতেই স্বরূপ প্রকাশের রাস্তা খুলিয়া যায়।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি একটি অভিযোগ : "সকলের জন্য সব কিছু করিয়াও তাহাদিগকে জানিতে দেন না কেন ?"

একজন মাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিল,—"আপনি লোকের জন্য এত করেন, অথচ তাহাদের কিছু বুঝিতে দেন না। তাহাদের অকৃতজ্ঞ হইতে দেন আপনিই।"

মা হাসিয়া,—"এ ত স্বাভাবিক কথা। পিতা মাতা বন্ধুদের জন্য করা এটা আবার বলে করতে হবে? এ শরীর তো তোমাদের জন্য আছেই, সদা সর্বদার জন্য ; এ তোমরা বোঝ আর না বোঝ। এ শরীরটার শিক্ষা বলো কি খেয়াল বলো, শিশুকাল থেকেই আজ অবধি কোনও কাজ করে বলা আসে না।"

একদিন পান্নালালজী হঠাৎ মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মা, আপনি কি মহাপ্রভু ?"

মা হাত দুইটি জোড় করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তুমি যা বোঝ তাই। সকলের মধ্যেই ত মহাপ্রভু রয়েছেন।"

৭ই নভেম্বর ১৯৫৮।

কাশী হইতে চিঠি আসিয়াছে, মা গত ৫ই বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী আসিয়াছেন। আগামী ১১ই অন্নকূটের পূর্ব দিন মা'র কানপুর রওনা হইবার কথা। এবার কানপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীসীতারাম জয়পুরিয়ার অনুরোধে সেখানেই সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হইবে।

১৪ই নভেম্বর ১৯৫৮।

কানপুর হইতে বুনির পত্রে জানিলাম ৺কালী পূজার পূর্ব দিন হইতেই মা'র কোমরে একটা অসম্ভব ব্যথা সুরু হইয়াছে। এপাশ ওপাশ ফিরিতেও কষ্ট এবং শুইয়া শুইয়াই মুখ ধুইয়াছেন। ৺কালীপূজার দিন মা একেবারে শয্যাগত ছিলেন, কাহারও মনে তাই কোন আনন্দ ছিল না। ঠিক পূজার সময় তুলার প্যাড বাঁধিয়া বহু কষ্টে একটু গিয়া বসিয়াছিলেন। অন্নকূটের সব কিছু মা স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে নিজে দাঁড়াইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া দেন। কিন্তু এবার কিছুই করা হয় নাই। মা'র অন্নকূটে এবার যাবার কথা ছিল না। ১১ই রাত্রে রওনা হইয়া অন্নকূটের দিন মা'র কানপুরে পৌঁছিবার কথা ছিল। কারণ ১৩ই হইতে সেখানে সংযম মহাব্রত আরম্ভ। কিন্তু মা'র শরীরের এইরূপ অবস্থা লইয়া ১১ই রাত্রে কিছুতেই রওনা হওয়া সম্ভব হইল না।

পরদিন অন্নকূটের আরতির সময় মা একটু সময় গিয়া মন্দিরে বসেন। পরে তাড়াতাড়ি রওনা হইয়া বেলা ১২॥০টায় মোগলসরাই হইতে দিল্লী একস্‌প্রেসে কানপুর যাত্রা করিলেন। কানপুরে রাত্রি ৮॥০টায় পৌঁছিলে জয়পুরিয়াজী গাড়ী করিয়া মাকে তাঁহাদের বাসায় নিয়া গেলেন।

বাড়ীর নাম "স্বদেশী হাউস্।" বিরাট বাগান ইত্যাদি। তাহার মধ্যে একেবারে রাজপ্রাসাদ। বাড়ীর লনে বিশাল এক প্যাণ্ডেল বসান হইয়াছে। প্রায় ৫০০০ লোক সেখানে বসিতে পারে। উহা এত সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে সাজান যে, তাহার বর্ণনা সম্ভব না।

প্যাণ্ডেলের পাশে আর একটি বাগানের মধ্যে মা'র জন্য ঘাস দিয়া অপূর্ব একটি কুঠিয়া বানাইয়াছেন। তাহার সঙ্গে রান্না-ঘর, বাথ-রুম ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থা আছে।

শুনিলাম কানপুরে পৌঁছিয়া অবধি মা একটু ভালই আছেন। স্টেশন হইতে গিয়াই প্যাণ্ডেলে কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন।

১৭ই নভেম্বর ১৯৫৮।

কানপুর সংযম-সপ্তাহে শ্রীশ্রীমা।

স্বামিজীর পত্রে জানিলাম যে কানপুরে সংযম সপ্তাহ খুব ভালো মত চলিতেছে। ব্যবস্থা খুবই ভালো। এত সুন্দর ভাবে সপ্তাহ ইতিপূর্বে নাকি আর কোথায়ও হয় নাই। বাহির হইতে স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী প্রভৃতি এবং দুই শতের অধিক ভক্ত ভারতের নানা স্থান হইতে আসিয়াছেন। এবার সিমলার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীদিবাকর দত্ত শাস্ত্রী ব্রহ্মপুরাণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সংযম সপ্তাহে এক একবার এক একটি পুরাণের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

মা আজকাল ভালই আছেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ বুনির পিতা খুব অসুস্থ টেলিগ্রাম আসায় বুনিকে মা সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

পত্রে জানিলাম যে ২০শে বিকালে মা'র লক্ষ্ণৌ যাওয়ার কথা। সেখান হইতে ২৩শে সকালে মা'র দিল্লীতে আসার কথা। এখানে কালকাজী আশ্রমে তিন চারদিন থাকিয়া হয়ত আনন্দকাশী যাইবেন।

২০শে নভেম্বর ১৯৫৮।

আজ সকালে প্রায় ৮॥•টায় মা আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলাম ডাঃ পান্নালালজীর জামাতা ও কন্যা লীলার বিশেষ অনুরোধে মা লক্ষ্ণৌ গিয়া Forest Rest House-এ ছিলেন। স্থানটি নাকি খুবই সুন্দর এবং একান্ত-ও। বাড়ীর চারিদিকে বিরাট বাগান। Rest House বলিয়া মা'র থাকিতেও কোন আপত্তি নাই। বাড়িটিও বেশ বড়। সৎসঙ্গের জন্য তাঁহারা আবার ভিন্ন করিয়া বাগানের মধ্যে প্যাণ্ডেলও বানাইয়াছিলেন। সেখানে মা দুই রাত্রি ছিলেন।

২৪শে নভেম্বর ১৯৫৮।

আজ রাত্রির গাড়িতেই মা হরিদ্বার গেলেন। সেখান হইতে দুই-তিন দিনের মধ্যে মা'র আনন্দকাশী যাওয়ার কথা।

৩০শে নভেম্বর ১৯৫৮।

আনন্দকাশী হইতে লেখা পুষ্পের পত্রে জানিলাম গত ২৬শে সকাল ৮টায় মা হরিদ্বার হইতে দেরাদুন মোটরে যান। মা'র সঙ্গে শুধু স্বামিজী, অজিত ও পুষ্প গিয়াছিল। প্রথমেই মা রায়পুর আশ্রমে যান। সেখানে গিয়াই তপালয়ে অজিত ও নরেশের থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন। পূর্বে বীরেনবাবু সেখানে ছিলেন। তাঁহাকে সেইদিনই মা কাশীতে পাঠাইয়া দেন। রায়পুর হইতে মা কিশনপুর আশ্রমে যান। কল্যাণবনও ঘুরিয়া

হরিদ্বার, দেরাদুন ঘুরিয়া আনন্দকাশী গমন।

আবার কিশনপুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া একটু খাওয়া দাওয়া করেন। সামান্য একটু সময় বিশ্রাম করিয়া আবার হরিদ্বার আসেন।

হরিদ্বারে বেশ ঠাণ্ডা। মা'র মাথার আওয়াজ নাকি আবার শুরু হইয়াছে।

গত ২৭শে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে প্রায় দুইটার সময় মা মোটরে আনন্দকাশী রওনা হন। টিহরীর রাজমাতার আগ্রহেই মা'র সেখানে যাওয়া। যোগীভাইও মা'র সঙ্গেই আছে।

২রা ডিসেম্বর ১৯৫৮।

আনন্দকাশী হইতে নারায়ণ স্বামিজীর পত্রে মা'র সংবাদ পাইলাম। মা সেখানে বিশ্রামে বেশ ভালই আছেন। কোনও প্রকার প্রোগ্রাম বা ভীড় নাই। সকালে ১০টায় মা বাহিরে আসিয়া রৌদ্রে বসেন। আবার খাওয়া-দাওয়ার পরে আসিয়া রৌদ্রে বিশ্রাম করেন। সকলেই আমার কথা লিখিতেছে যে ওখানে আমি থাকিলে খুবই আনন্দ পাইতাম। সকলেই ওখানে মাকে লইয়া খুব আনন্দে আছে।

৯ই ডিসেম্বর ১৯৫৮।

আনন্দকাশী হইতে ছবি চিঠি লিখিতেছে—মা'র শরীর ভালই আছে। মা'র ১১শে দেরাদুন রওনা হইবার কথা। সেখান থেকে দিল্লী আসিবেন মনে হয়। ৬ই হইতে মুজঃফরনগরের একজন সঙ্গীতাচার্য নিত্য সেখানে রামায়ণ গান করিতেছেন। টিহরীর রাজমাতাই তাঁহাকে আনাইয়াছেন।

১২ই ডিসেম্বর ১৯৫৮।

পুষ্পের পত্রে জানিলাম মধ্যে কয়েকদিন মা'র মাথার আওয়াজটা আবার হইতেছিল। শোয়ার ভাব একেবারেই ছিল না। মা'র শরীরের এই সংবাদে মনটা বেশ খারাপ হইয়া গেল। বাহির হইতে শুনিলাম ডাঃ পান্নালালজী, তাঁহার মেয়ে জামাই প্রভৃতি কেহ কেহ আসিয়াছেন। আগামী ১৯শে মা'র দেরাদুন যাওয়ার কথা।

২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫৮।

আজ সন্ধ্যায় মা দিল্লী পোঁছিলেন। শুনিলাম ১৯শে দেরাদুন গিয়া সেখানে দুইদিন ছিলেন। ২১শে বৈকালে হরিদ্বার আসিয়া সেখানেও দুই রাত্রি ছিলেন। তাহার পর আজ দুপুরে মা যোগী ভাইয়ের মোটরে রওনা হইয়া আসিয়াছেন। আগামী ২৬শে ঝালাওয়ার যাইবার কথা। সেখানে কমলার বড় ছেলে আনন্দ Collector-এর পদে আছে।

মা'র শরীরের অবস্থা স্বাভাবিক নয় দেখিলাম। আনন্দকাশী হইতেই নাকি মা'র এই ভাব সুরু হইয়াছে। দেরাদুনে উহা আরও বাড়িয়া যায়। কথা বলা বা চলা ফেরার খেয়ালটা খুবই কম। মা তাই দেরাদুনেই পড়িয়া থাকিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরমানন্দ স্বামিজী দেখিলেন সেখানে খুবই ঠাণ্ডা। তিনিই প্রার্থনা করিয়া মাকে দিল্লীতে আনিয়াছেন। এখানে কয়দিন বিশ্রামে থাকিতে পারিলে দেখা যাইত শরীরটা কি রকম থাকে।

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫৮।

দিল্লীতে আসিয়া মা'র শরীরটা আরও খারাপ হওয়ায় ২৬শে ঝালাওয়ার যাইবার প্রস্তাব স্থগিত হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় মা নিজের ভাবেই

পড়িয়া থাকেন। লোকের দর্শনের ভীড়ও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে বিকাল ৫৷৷৹ ঘটিকার পূর্বে মা'র দর্শন হইবে না।

আমিও বিছানায় শুইয়াই আছি। উঠিয়া গিয়া মাকে দেখিতে পারি না। তাই মা'ই নিজে কৃপা করিয়া আমার ঘরে আসিয়া দর্শন দেন। কখনও কখনও আমার কাছে আসিয়াও চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। কথা বলার কোন ভাবই দেখা যায় না। শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলে একটু হাসিয়া বলেন,—"এ শরীরটার কোনও অসুবিধা নাই। যখন যা হয়ে যায় তাই ঠিক।"

আজ সন্ধ্যাবেলা মা আমার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন এমন সময় দুই জন কাশ্মীরি ভদ্রলোক আসিয়া মা'র কাছে বসিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন শুনিলাম foreign service-এ বড় post-এ আছেন। সম্প্রতি বিদেশ হইতে আসিয়াছেন। তিনি কথায় কথায় মাকে বলিতেছিলেন যে তাঁহার আশ্রম ইত্যাদি স্থানে আসিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ তিনি দেখেন যে এমন সব লোকও আশ্রমে আসেন যাঁহাদের পথের উপর জুতা মারা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আশ্রমে আসিয়া তাঁহারা মায়ের নিকট বেশ আদর যত্ন পান।

কাহার সম্বন্ধে এই সব কথা তাহা প্রথমেই মা এবং আমি অনুমানে বুঝিয়াছিলাম। মা আস্তে আস্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি লেখাপড়া করিয়াছ?"

ভদ্রলোক এম-এ পাশ বলিলেন। মা এবার বলিলেন,—"আচ্ছা দেখ যদি কোনও ভদ্রলোক একটা বিশেষ দোষই করিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে তুমি, এইরূপ শিক্ষিত হইয়া, তোমার কি এই জাতীয় ভাষা ব্যবহার করা উচিত। সকলেই ত সেই একই পিতামাতার সন্তান। সর্বরূপে তিনিই ত ইহা মনে রাখা ভালো। কখন কাহার মনের ভাব কি রকম হয়, কে

মাধুর্যময়ী মায়ের মাতৃত্ব।

কোন সময় কোন দুষ্কর্ম করিয়া ফেলে তাহা ত বলা যায় না। আবার ইহাও ভাবিয়া দেখ, যদি তাহার ভিতরে একটুও ভাল হইবার ইচ্ছা না থাকে তবে সে এখানে আসিবে কেন? তাহাকে অবহেলা করিয়া তাড়াইয়া না দিয়া তাহাকে আদর যত্ন দেখাইয়া ভাল পথে রাখার চেষ্টা করাই কি তাহার পক্ষে মঙ্গলকর নয়? এইরূপ ব্যবহারের জন্য অনেক সময় ভালো লোকও খারাপ হয়, এবং খারাপ লোকও ভাল হয় না কি? সকলেই একই ঘরের লোক। এই শরীরটার কাছে কেহই দূর বা ভিন্ন না।"

ভদ্রলোক মা'র কথা বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাই যে যুক্তি যুক্ত তাহা স্বীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৫ই জানুয়ারী ১৯৫৯।

মা'র শরীরের অবস্থা এখন-ও ভালো দেখা যায় না। তবে কথা বলা ও চলাফেরা পূর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। এদিকে ঝালাওয়ার হইতে আনন্দ ঘন ঘন telephone ও telegram করিতেছে তাই মা আজ Frontier Mail-এ রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে গেল চিত্রা, পুষ্প, স্বামিজী ও চৈতন্য। শিবানন্দ, প্রফুল্ল, গোপালু, শোভা প্রভৃতি কয়েকজন পূর্বেই রওনা হইয়া গিয়াছে।

৭ই জানুয়ারী ১৯৫৯।

আজ বিকালে ঝালাওয়ার হইতে চিত্রার পত্র পাইলাম।

মা পরশু ভোরে স্টেশনে যাইবার পথে সুকেতের মহারাজার বাড়ী

হইয়া গিয়াছিলেন। মা দিল্লী হইতে Air-conditioned coach-এ যান। গাড়ীতে পুষ্প মাকে মাতৃবাণী বলিয়া বইটি পড়িয়া শুনাইয়াছে। সবটাই নাকি মা শুনিয়াছেন। গাড়ী ৪-১৫ মিঃ কোটা স্টেশনে পৌছে। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বে গাড়ী পৌছিয়াছে বলিয়া তখনও স্টেশনে মাকে নিতে কেহ আসে নাই। মাকে waiting room-এ বসান হয়। ঠিক ৪-৩০ মিঃ আনন্দ, মোহনলালজী ও তাঁহার মেয়ে মাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া পৌছিল। ঝালাওয়াড়ের মহারাজের বিশাল গাড়ীতে মাকে বসাইয়া সকলে রওনা হইল। মধ্যপথে চম্বা নদীর উপরে একটি নূতন বাঁধ নির্মিত হইতেছে। আনন্দ সেখানে একটু গাড়িটি ঘুরাইয়া লইয়া মাকে সব দেখাইল।

ঝালাওয়াড়ে শ্রীশ্রীমা।

প্রায় ৬॥০ টায় মা ঝালাওয়াড় রাজ্যে প্রবেশ করেন। গাড়ী গেটে প্রবেশ করা মাত্র মহারাজের পক্ষ হইতে ৬ বার বন্দুকের আওয়াজ করা হইল। সম্মুখেই ব্যাণ্ড পার্টি ছিল। ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে মাকে নিয়া সকলে ভিতরে প্রবেশ করিল। মা'র জন্য নাকি খুবই ভাল ব্যবস্থা করিয়াছে। বাড়ীর বাগানের মধ্যেই প্যাণ্ডেল বানান হইয়াছে। অপর পাশে মা'র জন্য সুন্দর একটি কুটিয়া। বাহিরে কাগজের দেয়াল ভিতরে কাগজ দেওয়া। সব কিছু সুন্দর গুছান। খুবই একান্ত স্থান। ঠাণ্ডা দিল্লী অপেক্ষা অনেক কম।

১০ই জানুয়ারী ১৯৫৯।

ঝালাওয়াড় হইতে চিত্রা ও পুষ্পের পত্র পাইলাম। মা'র শরীর নাকি ওখানে অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। এত একান্ত স্থান যে মা'র খুবই

বিশ্রাম হইতেছে। ঠাণ্ডা একেবারেই নাই। মা যখন যেখানে ইচ্ছা বিশ্রাম করেন। বাহিরের কাহাকেও বিশেষ সংবাদ দেওয়া হয় নাই। কেবল ঝালাওয়াড়ের রাজমাতা, Supdt. of Police, Civil Surgeon প্রভৃতি বড় বড় অফিসারগণ মধ্যে মধ্যে আসেন।

মা একদিন বড় মেয়েদের কিছু কিছু সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন, পত্রে তাহাও জানাইয়াছে। মা কথায় কথায় বলিয়াছিলেন,—"গৃহস্থাশ্রমে কথা কমিয়ে বাড়িয়ে বলা হয়। কিন্তু এ পথে এসে তোমরা কখন-ও মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। মান অপমান সমান করা, নিন্দা প্রশংসা এক দেখা। এখানে কি মান পেতে, প্রতিষ্ঠা পেতে তোমরা এসেছ? মান অপমান বরাবর করতে হবে। এখানে মরতে এসেছ, মারতে নয়। এ শরীর যেটা বুঝছে যে মিথ্যা সেখানে চুপ করে থাকতে পারবে না। তবে পরে তোমাদের মধ্যে আলোচনা হতে পারে যে মা ঐ ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় দিয়েছিলেন। সত্য গোপন করাই মিথ্যা।"

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের কয়েকটি সুন্দর কথা

আরও বলিয়াছেন,—"এই শরীরটা কি জন্য কি করে সব সময় বলার খেয়াল আসে না। চিত্রাকে আনন্দকাশীতে নেওয়া হ'ল না। কেন তা ওকে বলা হয় নি। আনন্দকাশী যাওয়ার সময় ওর পায়ে একটা চোট পাওয়া দেখেছিলাম। পাহাড়ে পড়ে আঘাত পাওয়া। তাই সে-দিনই পরমানন্দকে বলা হয়েছিল, এবার ও না যাক্। তাই কখন যে কী করা হয় তোমরা বোঝ না।"

আবার মেয়েদের চুলকাটা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"এলোমেলো যে মনের গতি, তা এলোমেলো চুল দেখেই বোঝা যায়। কাপড়ের ছাপ, পড়বার ধরণ, সবটাতে মনের ছাপ স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। মনের সঙ্গে সাজসজ্জার অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে।"

১৪ই জানুয়ারী ১৯৫৯।

চিত্রার পত্রে জানলাম মা'র শরীর ভালই আছে। ইতিমধ্যে বম্বে হইতে মোটরে লীলাবেন, সুশীলাবেন, সুনয়না প্রভৃতি কয়েকজন মা'র নিকট আসিয়াছেন। তাঁহারা উদয়পুরে আছেন। মা'র বম্বে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়া হইল না দেখিয়া তাঁহারা খুবই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। মা তাঁহাদের বলিলেন—"যদি সোজা বম্বে যাওয়া হ'ত তবে হয়ত যাওয়া হ'ত। কিন্তু আহমেদাবাদ ও ভীমপুরায় এই দুই জায়গায় ওরা বিশেষ করে বলেছে। কিন্তু এখন আর ঘুরবার খেয়াল একদম আসছে না। শরীরের মাঝে চলা-ফেরা কথা বলা একদম আসছিল না। অখণ্ড শব্দ-ত মাথায় সর্বদা আছেই।"

১০ তারিখ হইতে ওখানে অখণ্ড জপ চলিতেছে। দুপুরে ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত আনন্দের বোন চিত্রা জপ করিতেছিল। মা গিয়া সেখানে চুপ করিয়া বসিলেন। মা সেখানে জপের স্থানে গিয়াই গম্ভীর হইয়া সুখাসনে বসিয়া ধ্যানস্থ মূর্তি ধারণ করিলেন। চিত্রা লিখিতেছে যে সে-ও সেখানে ছিল। তাহারও বিক্ষিপ্ত মন যেন ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিল। প্রায় আধ ঘণ্টা কি যে হইল তাহাও তাহার স্মরণে নাই। মনটা এত শান্ত বোধ হয় আর কখন-ও হয় নাই। শিবানন্দ এবং ব্রহ্মচারী ভরতও নাকি বলিয়াছে যে সেদিন এক অদ্ভুত vibration ছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের একটি লীলা।

মাকে পরে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছেন—"সন্ধিক্ষণের সময় ছিল। স্থানটির ভাবও ভাল ছিল।" পরে মা আরও বলিয়াছেন যে সকলের জপ হোক্ এই ভাবটি নিয়াই মা সেদিন বসিয়াছিলেন। তাই সকলের মধ্যে কিছু কিছু অনুভব হইয়াছিল।

মা'র ঝালাওয়াড়ে আর বেশী থাকা হইবে না। শুনিলাম মা'র এবার

রাজগীরে যাইবার খেয়াল হইয়াছে। আনন্দ ও কমলাদিরা মাকে থাকার জন্য খুবই অনুরোধ করিতেছে।

একদিন রাত্রে ঝালাওয়াড়ের রাজমাতা মাকে প্রশ্ন করেন যে, "মেয়েদের প্রণবে অধিকার আছে, কি নাই?"

প্রণবের অধিকার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা।

মা উত্তরে বলিয়াছেন যে, "এই শরীরের মতে পুরুষ বা স্ত্রী যার মুখ থেকে ঠিক ঠিক প্রণব এসে যায়, তারই অধিকার আছে। প্রণব ঠিক ঠিক উচ্চারণ হলে দুনিয়ার দিকে আর মন যাবে না। আর গুরু যদি প্রণব বা গায়ত্রী দেন তবে ত কথাই নেই। এই শরীর বলে পুরুষ ও স্ত্রী দুনিয়ার ভেদ। স্ত্রীর মধ্যেও পুরুষত্ব আছে, পুরুষের মধ্যেও স্ত্রীত্ব আছে। তবে যার গ্রন্থি ভেদ হয়েছে তার স্ত্রীপুরুষের প্রশ্ন নেই। আত্মারাম—আত্মস্থিতি যেখানে সেখানে স্ত্রী-ই বা কে পুরুষ-ই বা কে?"

১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৯।

ঝালাওয়াড়ের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীমা।

আজ রাত্রি প্রায় ৮টার সময় মা দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঝালাওয়াড়ে প্রায় ১১ দিন থাকিয়া আসিলেন। শুনিলাম গত ১৩ই সন্ধ্যায় মাকে সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে একটি স্থানে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিল। ঝালাওয়াড়ের মহারাজা সেখানে একটি কাঠের বাড়ী বানাইয়াছিলেন। বাড়ীটি যেখানে খুশী লইয়া যাওয়া যায়। উহার সম্মুখেই একটি সুন্দর হ্রদও আছে। মা বাড়ীটির ভিতরে গিয়া সব ভাল করিয়া দেখিয়াছেন। ফিরিবার সময় মাকে স্থানীয় মহাবীরের মন্দিরেও নিয়া গিয়াছিল। মূর্তিটি প্রায় ৭ ফিট উঁচু। চক্ষু ২টি জ্বল্ জ্বল্ করে।

তাহার পর দিন বিকালে মায়ের সঙ্গে সকলে পাটন দেখিতে গিয়াছিল। শুনিলাম উহাই ঝালাওয়াড় রাজ্যের পুরাতন সহর। বর্তমান সহর উহা হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। চন্দ্রভাগা নদীর উপরে বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখন-ও বিদ্যমান। মোহম্মদ ঘোরীর রাজত্বকালে এই সমস্ত মন্দির ধূলিস্যাৎ করা হইয়াছিল। কত শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু এখন-ও নাকি মূর্তিগুলির মুখের ভাব কি সুন্দর সুস্পষ্ট। বিন্ধ্যাচল আশ্রম তৈয়ারী করিবার সময়ও প্রাচীন বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরের যে সব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল তাহার সহিত এই সব ভগ্নমূর্তি ও কারুকার্য খচিত পাথরের মধ্যে নাকি যথেষ্ট মিল আছে।

প্রবাদ যে ঝালাওয়াড়ের মহারাজের একজন পূর্ব-পুরুষের কুষ্ঠ রোগ হয়। তিনি নিত্য এই চন্দ্রভাগা নদীর জলপান করিয়া কুষ্ঠ রোগ মুক্ত হ'ন। তাহারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি এই নদী-তটে ঐ মন্দিরগুলি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

মা সিঁড়ি দিয়া নদীতে নামিয়া জলস্পর্শ করিয়া সকলের গায়ে ছিটাইয়া দেন। ফিরিবার পথে মা আরও ২।৩টি মন্দির ঘুরিয়া আসেন।

গতকাল বিকালে শুনিলাম মাকে মহারাজার বাড়াতে নিয়া গিয়াছিলেন। রাজমাতা নিজে আসিয়া বিশেষ আগ্রহ করিয়া মাকে নিয়া গিয়াছিলেন। রাজ-প্রাসাদের ভিতরে বাগানের মধ্যে একটি সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া মা'র বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাজমাতা মাকে নিজে আরতি করেন এবং একটু খাওয়াইয়া দেন।

আজ সকাল ৮টায় মা কোটা রওয়ানা হ'ন। অধিকাংশ লোক ও মালপত্র বাসে আসিতেছিল, কিন্তু বাস ঠিক সময় মত স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিতেছে না দেখিয়া মা বলিলেন যে তাহারা যেন মালপত্র সহ মথুরা হইয়া কাশী চলিয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাস আসিয়া পৌঁছিল এবং একত্রেই সকলে রওনা হইল।

ঝালাওয়াড়ের সৎসঙ্গের মধ্যে কিছু কিছু ভাল কথা হইয়াছিল।

প্রশ্ন—"জপ করি কিন্তু কিছু অনুভব করিতেছি না।"

মা—"তুমি নিয়মিত জপ করে যাও, জাগরণ হবেই।"

কথা প্রসঙ্গে মা বলিয়াছেন—"আবেশ খেলা করিয়া যেখান হইতে সুরু সেখানেই রাখিয়া যায়। কিন্তু শরীরে চঞ্চলতা থাকে কারণ অন্তঃশক্তির সঙ্গে কোনও যোগ নেই। কিন্তু আত্মশক্তির যেখানে ক্রিয়া সেখানে শান্ত ভাব। আপনাতে যে আপনি স্থিত, আপনার দিকে আপনাকে টানে।

প্রঃ—গুরুকে আমরা যতটা ভালবাসি, গুরুর তাহা অপেক্ষা বেশী ভালবাসা উচিৎ নয় কি?

মা—"যিনি তোমাকে পরমার্থ কল্যাণের দিকে যাত্রা করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান সেটাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা।"

প্রঃ—অনেকেই বলেন যে শীঘ্রই জগতের আমূল পরিবর্তন হবে। সে সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।"

মা—"এ জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এ শরীর কিছু বলে না। তবে এ শরীরের কথা এই যে কালের মধ্যে থেকে যে বলা, তা অনেক সময়ই মেলে না। কালের অতীত না হলে পরে যা কিছু বাধা আসতে পারে তা দেখবার ক্ষমতা থাকে না, তাই হয়ত হল না।

১৯শে জানুয়ারী ১৯৫৯।

এখানে তিন রাত্রি থাকিয়া মা আজ কালকা মেলে এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেলেন। পরে কাশী হইয়া তিন-চার দিনের মধ্যেই রাজগীর যাইবার কথা।

২২শে জানুয়ারী ১৯৫৯।

আজ পুষ্পর পত্রে জানলাম মা পরশু বিকালে মোটরে কাশী আশ্রমে পৌঁছিয়াছেন। মা'র শরীরটা বিশেষ ভাল না—চেহারায় একটা ক্লান্তির ভাব দেখা যায়।

২৫শে জানুয়ারী ১৯৫৯।

শ্রীশ্রীমায়ের রাজগীর হইয়া কলিকাতা গমন।

চিত্রার পত্র পাইলাম। মা গত ২৩শে দুপুরে রাজগীর রওনা হইয়া গিয়াছেন। মা'র সঙ্গে শোভা, উদাস, চিত্রা, ভরতভাই ও স্বামিজী গিয়াছেন। আরও কয়েকজন পূর্বেই গিয়াছে।

৩০শে জানুয়ারী ১৯৫৯।

স্বামিজীর পত্রে মা'র প্রোগ্রাম জানা গেল। মা'র আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী পাটনা যাওয়ার কথা। সেখান হইতে পরদিবস কলিকাতা যাইবেন। দিদিমা প্রভৃতির কাশী হইতে পাটনা গিয়া মা'র সঙ্গে একত্রে কলিকাতা যাওয়ার কথা।

মা'র ওখানে নিত্য নূতন অতিথি যাইতেছে। এখন প্রায় ৪০ জনের ওপরে লোক সংখ্যা। পার্শ্ববর্তী ধর্মশালায় ও সরকারী Rest House-এ থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯।

চিত্রার পত্রে জানিলাম শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কাশী হইতে রাজগীর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওখানে খুব ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার জন্য মা তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

মা'র শরীর একপ্রকার ভালই আছে, তবে মধ্যে একটু হজমের গোলমাল হইয়াছিল। লোকের ভীড় খুবই কম। বেশ হাসিখুশী ভাবে মা বিশ্রামেই আছেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯।

এই কয়দিন মা'র আর কোন সংবাদ পাই নাই। আজ স্বামিজী ও চিত্রার পত্র পাইলাম। মা গত ৫ই ওখানে শ্রীযুক্ত বক্সির মোটরে পাটনা আসিয়াছিলেন। পাটনায় শম্ভুদার বাসায় রাত্রিটা থাকিয়া গতকাল কলিকাতা রওনা হইয়া গিয়াছেন। মা'র সঙ্গে গিয়াছে প্রায় বিশ-বাইশ জন। কাশী হইতে দিদিমা প্রভৃতিও পাটনায় গিয়া মা'র সঙ্গে গিয়াছেন।

মা'র শরীরটা পাটনায় একটু এলোমেলো ছিল। রাজগীরেই শেষ দিন রাত্রে মাথার আওয়াজ একটু বাড়িয়াছিল।

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯।

কলিকাতার পত্রে জানিলাম মা'র শরীরটা ভালো না। পাটনায় এবং কলিকাতা যাইবার সময় বোধ হয় ট্রেনে ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। মাথার

আওয়াজটাও সেজন্য বাড়িয়াছে। তবে এখন-ও লোকের ভীড় সেরূপ নাই। তাই মা একটু একান্তেই আছেন।

আগড়পাড়া আশ্রম নাকি এখন খুবই সুন্দর হইয়াছে। চারিদিকে ফুলের বাগান এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ৺সরস্বতী পূজা আশ্রমেই হইবে। বম্বে হইতে ভাইয়াও নাকি ওখানে দুই-তিন দিনের জন্য গিয়াছেন। আশ্রমেই আছেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯।

আগড়পাড়া আশ্রমে ৺সরস্বতী পূজা।

বুনি লিখিয়াছে যে গত ১২ই আশ্রমে বেশ বিরাট ভাবে ৺সরস্বতী পূজা হইয়া গেল। প্রায় এক হাজারের উপর লোক প্রসাদ পাইয়াছে। সমস্ত ব্যবস্থাটাই নাকি রেখা ও কানু করিয়াছে। মা'র শরীর এখন ভালই আছে। নিয়ম একটু কড়াকড়ি করা হইয়াছে। তাই বিশ্রাম কিছু হইতেছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯।

স্বামিজী ও চিন্ময়ানন্দের পত্রে জানিলাম যে মা আশ্রম হইতে গত ১৭ই কনকদার বাসায় গিয়াছিলেন। সেখানে রাত্রিটা থাকিয়া ১৮ই সকালে দ্বিজেন নাগের নূতন বাড়ীতে গিয়াছেন। তাহার গৃহ প্রবেশ হইয়াছে।

২৪শে সকালে মা'র সেখান হইতে বর্দ্ধমান গিয়া সেইদিন রাত্রেই কাশী রওনা হওয়ার কথা। কাশীতে তিন দিন থাকিয়া ২৮শে মা'র দেরাদুন রওনা হওয়ার কথা। আমাকেও ওরা দেরাদুন যাইতে লিখিয়াছেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯।

কলিকাতা হইতে পান্নুর পত্রে জানিলাম যে সে ইতিমধ্যে মায়ের কাছে আগড়পাড়া গিয়াছিল। এখন মায়ের সঙ্গেই আছে। দ্বিজেনদের বাসায় নাকি খুবই সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থানের কোনও অভাব নাই। তাহা ছাড়া সৎসঙ্গের জন্য ছাতের ওপর বিরাট প্যাণ্ডেলও করিয়াছে।

তবে মা'র শরীরটা ভাল যাইতেছে না। সর্দি-কাশি খুব আছে। তবুও এই লইয়াই বেশ আনন্দে কলিকাতার ভীড়ে চালাইয়া লইতেছেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯।

বুনির পত্রে জানিলাম যে মা'র শরীর বিশেষ ভাল না। তাহার উপর অসম্ভব ভীড়। বড় রাস্তার উপরে বালীগঞ্জে বাড়ী, কাজেই সমস্ত কলিকাতা সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গত ২১শে ওখানেই নাম যজ্ঞ হইয়াছে। সেই দিন রাত্রেই হঠাৎ সংবাদ আসে যে নীতিশ দাদা (বুনির কাকা) মারা গিয়াছে। পরদিন সকালে মা নিজে সেই বাসায় যান। মৃতদেহও মা'র সম্মুখ দিয়াই নিয়া যাওয়া হয়।

নীতিশ দাদার মৃত্যু।

নীতিশ দাদার অকস্মাৎ পরলোকগমনে আমরা খুবই দুঃখিত ও মর্মাহত হইলাম। তিনি মা'র অতি প্রাচীন এবং বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। মায়ের কৃপায় তাঁহার পরলোকগত আত্মা মায়ের চরণে চিরশান্তি লাভ করুক এই প্রার্থনা।

কাশী হইতে স্বামিজীর পত্রে জানিলাম মা বর্দ্ধমান হইয়া কাশীতে ভাল মত পৌঁছিয়াছেন। সেখান হইতে ২৮শে দেরাদুন রওনা হইয়া

১লা সকালে সেখানে পৌঁছিবেন। মা কমলকে আমার সঙ্গে যাইবার জন্য এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি মা'র নির্দেশ মত আগামীকাল রওনা হইতেছি।

৩রা মার্চ ১৯৫৯।

মা'র আদেশে আজ দেরাদুন রওনা হইলাম। সন্ধ্যায় দেরাদুন পৌঁছিব। মা'র কৃপায় রোগের এত অচল অবস্থার পরেও মা'র ব্যবস্থাতে কোনও অসুবিধা বোধ করিতেছি না। সর্বত্রই সুব্যবস্থা। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মা'র অসীম কৃপার কথাই মনে জাগে। পাঁচ বৎসর হইয়া গেল রোগে ভুগিতেছি, কিন্তু তিনিই যেমন রোগও দিয়াছেন, আবার আরামের ব্যবস্থাও তিনিই করিতেছেন। তাঁর কৃপার কথা আমি আর কত লিখিব —লিখিবার শক্তিই বা কোথায়। দিল্লী হইতে সব ব্যবস্থা করিয়া মায়ের ভক্তগণ আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। সন্ধ্যায় দেরাদুন পৌঁছিয়া দেখি মা'র নির্দেশে স্টেশনে সব ব্যবস্থাই তৈয়ার। ৺সের সিংহের দৌহিত্র মুন্নাই আমাকে গাড়ী করিয়া কিশনপুর নিয়া গেল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখি শিব প্রতিষ্ঠার বিরাট আয়োজন চলিতেছে। বাহির হইতেও অনেকেই আসিয়াছেন, আরও অনেকে আসিতেছেন শুনিলাম। মা হলে বসিয়া আছেন। ভক্তরা অনেকেই আছেন।

কিশনপুরে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা।

শিব মন্দিরের বেদী মর্মর পাথর দিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা কিছু উঁচু হইয়া যাওয়ায় আবার ভাঙ্গা হইতেছে। মার কাজ ত, একেবারে নিখুঁত চাই। দিন-রাত কাজ করিয়া ৬ই মার্চ বেদী তৈয়ার চাই।

আমি যাহাতে একান্তে বিশ্রাম পাই, সে কারণে আমাকে কল্যাণবনে রাখা স্থির হইয়াছে। মৌনের পরেই মা আমাকে কল্যাণবনে পাঠাইয়া দিলেন। আমাকে দুইজনে ধরিয়া ধরিয়া একটু হাঁটাইয়া হাঁটাইয়া চলার অবস্থাতেই যতটা সম্ভব শিবের মন্দিরটি মা দেখাইয়া দিলেন। শিব মন্দিরের পাশেই শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একটি মন্দির করা হইয়াছে। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় একটি বড় বেদী করিয়া যজ্ঞ করা হইয়াছিল। এই যজ্ঞ স্থানেই ৺ভাইজীর মায়ের মন্দির করিবার ইচ্ছা ছিল—এইরূপ একটি কথা আমি শুনিয়াছিলাম। তাই শিব মন্দির তৈয়ারী হইবার সময়ই মায়ের মন্দিরও তৈয়ারীর বন্দোবস্ত আমি করিয়াছিলাম। ক্রমে দুইটি মন্দিরই প্রস্তুত হইল। মন্দির দুইটিই খুব সুন্দর হইয়াছে। মন্দিরের ভিতর এবং বারান্দা সবই শ্বেত পাথরের তৈয়ারী।

মন্দিরের একটু নিচেই প্রশস্ত আঙ্গিনা। আঙ্গিনা দেখিয়া অনেকেই বলিতেছে, "এত বড় জায়গা কোথা হইতে বাহির হইল?" এতটা জায়গা এখানে ছিল বলিয়া তো পূর্বে আমাদের ধারণাই হয় নাই।

৪ঠা মার্চ ১৯৫৯।

আজ সকালেই মা কল্যাণবনে আসিয়াছেন। সঙ্গে রাজমাতা টিহরী, রণজিৎ, ভবানী, পান্নালালের মেয়ে জামাতা, প্রভাদি এবং আরও অনেকে আছেন। রণজিৎ ভাইয়ের ভগ্নী এবং ভগ্নীপতিও সঙ্গে আছেন। মা আসিয়াই সকলকে নিয়া কল্যাণবনস্থিত কুটিয়ার বারান্দায় বসিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দিদি শোন, রঞ্জিত মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয় কি বলে। বেশ, দেখ কেমন যোগাযোগ। এই শরীরটাকে এত শিব প্রতিষ্ঠা করিতে দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত মনে করে,—মা খুব

শিব-ভক্ত। কিন্তু এই শরীরটার কাছে যে সবই সমান। নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই করা হয় না। এক একটা উপলক্ষ্যে সবই হইয়া যাইতেছে। দেখ, মনমোহন বাবা (মনাদা ইঞ্জিনিয়ার) যখন বৃন্দাবনের আশ্রমে কুঠিয়া ইত্যাদি করিতেছিল, তখন সে মেয়েকে দেখিতে আহমেদাবাদ গেল। এই শরীরটাও তখন সেখানে। বলা হইল, বাবা এতদূরে যখন আসিয়াছ, এই শরীরটা দ্বারকায় যাইতেছে, তুমিও চল দর্শন করিয়া আসিবে। তুমি ত আর দর্শনের জন্য আসিবে না। তাই চলিল। দ্বারকা হইতে আমাদের প্রভাস যাওয়া হইল। সেখান হইতে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গাছে হেলান দিয়া শুইয়া ছিলেন ও ব্যাধের বাণ লাগিয়াছিল, সেই স্থানে এই শরীরটাকে নিয়া গেল সকলে। সেই স্থানে গিয়া গাছটিও দেখাইল। সেখানে দেখি কি একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পর বলরামের ঐ স্থানেও নিয়া গেল, দেখি, সেখানেও শিব স্থাপিত। তখন এই শরীরের খেয়াল হইল, বাঃ, এসব স্থানেও দেখি শিব স্থাপিত।

তারপর দ্বারকা ফিরিয়া আসা হইল। মনমোহন বাবা ভোরেই রওনা হইয়া চলিয়া যাইবে। এদিকে মনোমোহন বাবা শুইয়া আছে রাত্রি প্রায় ১২টা কি ১টা হইবে। তখন দিদিকে (আমাকে) ডাকিয়া বলিলাম, মনমোহন বাবাকে ডাকিয়া নিয়া আয়। বাবা আসিলে বলা হইল, তুমি ত বৃন্দাবন আশ্রমে কুঠিয়া করিতেছ। এদেশে যেমন রাস্তার ধারে জলসত্র থাকে না, গরমের সময় পথিকদের জল দেওয়ার জন্য;—আশ্রমের জন্য ঐ জমিতে ঐরূপ একটি ছোট্ট ঘরের মত রাস্তার ধারে ছিল। ঐটিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা হইল, ঐ ঘরটি একটু ঠিক করিয়া একটি বেদী বানাইয়া রাখিও। তিনটি শিব এখানে বসিতে পারেন এইরূপ করিও। নীচে এক একটি কাঁসার বাটী রাখিয়া দিও, এমন ভাবে রাখিও যেন উপর হইতে দেখা না যায়। এখন এখানেই শিব বসিবেন। যদি শিবের ইচ্ছা হয় তবে

বৃন্দাবনে শিব-মন্দিরের সূত্রপাতের ইতিহাস।

নিজেই মন্দিরের ব্যবস্থা করিয়া নিবেন। তাহাই হইল। পরে শিবরাত্রির সময় এ শরীরটা কাশী গেল। এদিকে যোগীভাই হরিদ্বারে শিব স্থাপিত করিবার সময় কয়েকটি শিব (নর্মদেশ্বর) বেশী আনিয়াছিল। এতদিন তাহা কাশীতেই ছিল। তাহা হইতে তিনটি শিব নিয়া কুসুম ও দিদিকে শিব-রাত্রির সময় বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেওয়া হইল ঐখানে স্থাপিত করিবার জন্য।

পরে দিদির সঙ্গে কথায় কথায় পরশুরাম খুব আগ্রহ করিয়া ঐস্থানে শিব মন্দির করিয়া দিবার কথা বলিল। সে বলিল, তাহার অনেকদিন হইতেই একটি শিব মন্দির করার ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছাতেই ঐ শিব মন্দির তৈয়ারী হইল, এবং এখন পাঁচটি শিব এই বড় মন্দিরে বসিলেন।

বৃন্দাবনের আশ্রমের মহাপ্রভুর মন্দিরের নির্মাণ কথা।

মহাপ্রভুর মন্দিরের কথা, পূজার কথাও একজন বলিল। পরে কিছু টাকা আসায় ঐ মন্দির আরম্ভ করা হইল, কিন্তু টাকা না থাকায় মন্দিরের উপরের অংশ বাকিই রহিয়া গেল। কোন চিন্তা নাই, যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে তখন হইবে। আর না হইবার হইলে হইবে না, কোন গোলমাল নাই।

একদিন পরশুরাম বৃন্দাবনে দিদিকে বলিল যে সে মা'র ঘরে পাখা লাগাইতে চায়। তখন দিদি বলিল,—মা ত পাখা চালাইতে দেন না, বরং যদি তুমি পার মহাপ্রভুর মন্দিরের উপরের অংশটুকু বাকী আছে তাহা করিয়া দিতে পারিলে বিগ্রহ স্থাপিত হইতে পারে। সে খুবই আগ্রহের সহিত তাহা করিয়া দিল। পরে পান্নালাল পিতাজী গৌর নিতাইয়ের মূর্তি স্থাপিত করিলেন। এই ভাবেই সব হইয়া যাইতেছে।

কিশনপুরের শিব-মন্দিরের কথা।

এখানেও শিব মন্দিরের কোন কথাই ছিল না। কলিকাতার এক প্রফেসরের স্ত্রী ভোলানাথকে জীবিত অবস্থায় দেখে নাই। সে একবার একটি ঘটনা বলিল।

ঘটনাটি এই: একদিন নাকি সে স্বপ্নে দেখিতেছে যে ভোলানাথ আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন যে তুমি আমার নিকট দীক্ষা

নেও। সে ভোলানাথের ছবি দেখিয়াছিল, তাই সে ভোলানাথকে চিনিতে পারিল। সে প্রথম দিনের স্বপ্নের কথা খেয়ালই করিল না। দ্বিতীয় দিনও আবার সেই স্বপ্নই দেখিল। অবশেষে একদিন জাগ্রত অবস্থায়ই সে দেখিতেছে ভোলানাথ আসিয়া তাহাকে বলিতেছে,—তুমি স্নান করিয়া শীঘ্র আস। এখনই তোমাকে দীক্ষা দিব। সে তাড়াতাড়ি তাহার স্বামীকে বলিল, ভোলানাথ আসিয়াছে, দেখিতেছ না? এদিকে সে ত কিছুই দেখে না।

যাক্ স্ত্রী গিয়া স্নান করিয়া আসিয়া ভোলানাথের কাছে আসিয়া বসিল এবং তিনি দীক্ষা দিলেন। এবং পরে নাকি সেখানেই মিলাইয়া গেলেন।

ইহার পর হইতেই তাহার মনে ইচ্ছা হইল ভোলানাথের একটি স্মৃতি এখানেই রাখিবে। কারণ এখানেই ভোলানাথ দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কাজকে উপলক্ষ্য করিয়া সামান্য কিছু টাকা উঠিল। উহাতে কিছুই হয় না, কাজেই ক্রমে ঐ বিষয়ের কথা বন্ধ হইয়া রহিল।

এদিকে ভবানী একটি শিব এখান হইতেই চাহিয়া নিয়াছিল। সে কলিকাতা গিয়া রঞ্জিৎকে (তাহার স্বামীকে) বলিল একটি মন্দির করিয়া দাও।'

মা এই পর্যন্ত বলার সঙ্গে সঙ্গেই রঞ্জিত বলিতে আরম্ভ করিল,—"মা'র নিকট হইতেই চাহিয়া শিব নিয়া গিয়াছে, আমাকে গিয়া বলে মন্দির করিতে।

আমি বলিলাম, 'দেখ আমাদের পূর্ব পুরুষের কালী মন্দির ছিল। তাহা নানা গোলমালে আমাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। এই জন্য আমার ঠাকুরদাদা আমার পিতাকে ঐ মন্দির ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। আমার পিতা আমাকেও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা কিছুতেই সে মন্দির নিজেদের কাছে ফিরাইয়া আনিতে পারি নাই'।

এখন, আবার এক মন্দির করিব; ভবিষ্যতে কি হইবে কে জানে। পুত্র

পৌত্রাদিক্রমে পূজা হইবে কিনা কে জানে। আর পূজা না হইলে এই পূজা বন্ধের জন্য পাপের ভাগী হইতে হয়। তাহার চেয়ে যেখানে পূজা হওয়া সম্ভব, আশ্রম ইত্যাদি স্থানে, সেখানে এই শিব স্থাপিত করা যায় কিনা ?"

ইহার পর ভবানী মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'আমরা কি আশ্রমে শিব মন্দির করিতে পারিব' ? ইত্যাদি।

এই কথার পর মা বলিলেন, "তখন এই শিব মন্দিরের কথাই হইল। স্থির হইল একসঙ্গেই ভবানীর গঙ্গেশ্বরও বসিবেন। কাজ আরম্ভ হইল। কিন্তু মন্দির আর সম্পূর্ণ হইতেছে না। এদিকে দিদি মা'র মন্দিরের জন্য যাহা সংগ্রহ করিয়াছে, এখন তাহা দিয়াই মন্দির সম্পূর্ণ করিতে দিদিকে বলা হইল। পরে মহারতন পাঁচ হাজার টাকা দিয়া বলিল, মা'র যাহাতে খেয়াল হয় এই টাকা তাহাতেই খরচ হইবে।

এই শরীরটার বলা আসিল, 'শিবই আনিয়াছেন। শিব-মন্দিরে দেও।' তারপর সের সিংহের স্ত্রী শান্তির মৃত্যুর পর তাহাদের আত্মীয়েরাও এই কাজের জন্য পাঁচ হাজার দিল। এই ভাবে শিব মন্দির হইয়া গেল।

আরও আশ্চর্য দেখ ভবানী শিব নিয়া আসিয়াছে প্রতিষ্ঠা করিতে। আসিয়াই মন্দির দেখিয়া বলে, 'আমি ঠিক এই রকমই দুইটি মন্দির এক জায়গায় (একটি মা'র ও একটি শিবের) আর একটি মন্দির একটু দূরে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। তারপর এই কল্যাণবনেও এই শিব মন্দিরটি দেখিয়া বলে—ঠিক এই রকমটিই দেখিয়াছি'।

কল্যাণবন ত কিশনপুর আশ্রম হইতে কিছু দূরেই। কল্যাণবনটি শচীবাবু বিদ্যাপীঠের ছেলেদের জন্য খরিদ করিয়া যায়। এই স্থানটিতে মা'র মন্দির

কল্যাণবনের কথা।

করিবে বলিয়া উপনিষদ গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি কি কি সব নীচে দিয়া ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। এই শরীরকে আনিয়া উৎসবও করিল। কিন্তু তাহার পরেই দেরাদুন আশ্রমে সে মারা যায়। তাহার বোন মনোরমাও ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমে আসিয়াছিল।

ঐ শিব মন্দির করার সময় বলা হইল এইখানেও একটি ছোট শিব মন্দির ঐ ভিত্তি খুদিয়া সেইখানে কর।

শচীবাবু ও মনোরমা—দুই ভাই-বোনকে এই বাগানেই সৎকার করা হইয়াছে। তাঁহাদের দুইজনের নামেই এখানেও একটি শিব বসিবেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে মা'র মন্দির করার ইচ্ছা ছিল, শিব মন্দির করিলেই হইবে। নীচে ঐ সব জিনিষ আছে, তাহার উপরে হাঁটা চলা করা ত ঠিক নয়। এই রকম করিয়াই সব হইতেছে। এই শরীরের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রশ্নই নাই।"

তখন রঞ্জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ইনি Martin Co. এর বিখ্যাত R. N. Mukherjee-র দৌহিত্র) মুখে আরও শুনিলাম যে তিনি তাঁহাদের বংশ পরিচয়ের কাগজ পত্রাদি সব বাহির করিয়া দেখিয়াছেন যে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহাদেরই পূর্বপুরুষ।

৫ই মার্চ ১৯৫৯।

কিশনপুরে শিব প্রতিষ্ঠা।

আজও সকালে মা কল্যাণবনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আর বেশী সময় বসিতে পারিলেন না। শিব প্রতিষ্ঠার পূজাদির কার্য আজ হইতেই আরম্ভ হইবে তাই আচার্য (বাটুদা) মাকে নিয়া যাইতে ঐ আশ্রম হইতে আসিয়াছেন।

মা চলিয়া গেলেন। একটু পরেই সব ব্যবস্থা করিয়া মোটর পাঠাইয়া আমাকে নেওয়াইলেন। গিয়া দেখিলাম শিব মন্দিরের সম্মুখের আঙ্গিনায় ও আশ্রমের বারান্দায় পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। আরও অনেকে এই মন্দিরেই

শিব প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহারাও সকলে বসিয়াছেন। শুনিলাম ৭টি শিব এখানে বসিবেন এবং একটি কল্যাণবনে।

১। ভোলানাথজীর নামে	...	ভোলানাথ
২। ভবানীর নামে	...	গঙ্গেশ্বর
৩। ৺কাশীনাথ তন্‌খার নামে	...	কাশীশ্বর
৪। সেবার পিতার নামে	...	মামুলেশ্বর
৫। নলিনী ব্রহ্মের পুত্রের নামে	...	কল্যাণেশ্বর
৬। ৺সের সিংহ ও তাহার স্ত্রী শান্তির নামে	...	শান্তিশ্বর
৭। রামেশ্বর সহায়ের ছেলের নামে	...	কীর্তিশ্বর
কল্যাণবনে		
৮। শচীদা ও মেজদির নামে	...	মহেশ্বর

আজ হইতেই পূজা আদি আরম্ভ হইল। আগামী পরশু ৭ই মার্চ শিবরাত্রির দিন শিব প্রতিষ্ঠা হইবে। অনেকেই বসিয়া আছেন। মা ও দিদিমা একখানি চৌকিতে বসিয়া আছেন। আচার্য বাটুদা পূজা করাইতে করাইতে একটি পাতা মুড়িয়া একেবারে আশ্রমের বাহিরে ফেলিয়া দিবার জন্য একজনের হাতে দিলেন। 'ইহা কি ?'—প্রভৃতি প্রশ্ন করিতেই মা ও সঙ্গে সঙ্গে আচার্য ও নারায়ণ স্বামী বুঝাইতে লাগিলেন যে ইহা দ্বারা কার্যের বিঘ্ন নাশ করা হইল।

মা বলিতে লাগিলেন,—"দেখ সব কাজেই সব আছে। যেমন কোন কোন মন্ত্র দ্বারা বিঘ্ন ঘটান যায়, তেমনি আবার কোন কোন মন্ত্র দ্বারা বিঘ্ন নাশও করা যায়। সর্বরূপেই তিনি। তবে যখন যা দরকার। যেমন দেখ না নখটা কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু নখের সঙ্গে আঙ্গুলের

মাংস যেন কাটিয়া না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।" এই জাতীয় আরও অনেক কথা হইল।

৬ই মার্চ ১৯৫৯।

আজ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। কাষ্ঠ মন্থন করিয়া অগ্নি বাহির করিয়া সেই অগ্নিতে যজ্ঞ আরম্ভ করা হইবে। অগ্নি বাহির হইতেছে না, ক্রমাগত মন্থন চলিতেছে। মা গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিতে বলিলেন এবং শ্বাসে শ্বাসে প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহার পরই অগ্নিদেব কাষ্ঠ-খণ্ড হইতে প্রকট হইলেন।

আজও আমাকে ঐ আশ্রমে নিয়াছেন। যজ্ঞ ও অনেক পূজাদির পর শিব ঠাকুরদিগকে বিধিমত মহাস্নান করান হইল। পরে শিব ঠাকুরদের দোলায় করিয়া নিয়া প্রসেসন করিয়া সকলে নিয়া চলিল। ব্যাণ্ড পার্টি বাজিতে লাগিল। সে এক অপূর্ব আনন্দ, অপূর্ব দৃশ্য। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেকটি ব্যাপারের মধ্যেই এত আনন্দ ও এত নিখুঁতভাব এইজন্যই ফুটিয়া ওঠে যে প্রত্যেকটি ব্যবস্থা মা-ই করাইতেছেন। সব ব্যবস্থা করাইয়াও আবার পরক্ষণেই এমন ভাবে দর্শক হইয়া বসিতেছেন যেন তিনি কোনটার মধ্যেই নাই। তিনি শুধু দর্শক মাত্র। এ-ও এক অপূর্ব রহস্য।

বহুকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, সবটার মধ্যেই মা, আবার কিছুর মধ্যেই তিনি নন্। এই দুই যুগপৎ ভাবের খেলা মা'র মধ্যে সর্বদাই দেখিতে পাই।

শোভাযাত্রার পর আবার শিব-ঠাকুরদিগকে স্নান করান হইল। পরে মশারী টাঙ্গান খাটে তাঁহাদিগকে শয়ন করাইয়া আজিকার কার্য্যক্রম সম্পূর্ণ হইল।

৭ই মার্চ ১৯৫৯।

আজ শিবরাত্রি। শিব প্রতিষ্ঠা হইবে। খুবই জাঁকজমক এবং ধুমধামের সহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিষ্ঠা কার্য যথা সময়ে সুসম্পন্ন হইল। নারায়ণ স্বামী প্রায় ঐ সঙ্গেই মাকে মা'র মন্দিরে নিয়া গিয়া একটু খানি বসাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মা'র ছবিও নিয়া গিয়া শৈলেশ মন্দিরে বসাইল। একটু পরেই মা উঠিয়া কল্যাণবনে আসিয়া কল্যাণবনের মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত রহিলেন। পরে আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। রঞ্জিৎ ও ভবানী মা'র মন্দিরে মা'র পূজা করিল। প্রতিষ্ঠা ও পূজাদির পর পূর্ণাহুতি হইল।

ওদিকে কীর্তন চলিতেছিল। মা-ও একটু কীর্তন করিলেন—"জয় শিব শংকর ব্যোম ব্যোম হর হর।" শিব মন্দিরের সন্মুখেই যজ্ঞকুণ্ড করা হইয়াছিল আর মন্দির সংলগ্ন বারান্দাতে মা বসিয়াছিলেন। ভোগের পরে অনেকেই প্রসাদ পাইলেন।

আজ শিবরাত্রি, কাজেই অনেকে উপবাসও করিলেন। ওদিকে রাত্রিতে শিব পূজার আয়োজন হইতে লাগিল। সে-ও এক বিরাট ব্যাপার।

কিশনপুরে শিব প্রতিষ্ঠার পর প্রথম শিবরাত্রির অনুষ্ঠান।

রাত্রিতে প্রায় ৮০।৯০ জন পূজা করিতে বসিবেন। কে কে পূজা করিবেন, পূর্বেই নাম লিখাইতে বলা হইয়াছিল। হলে, বারান্দায়, শিব মন্দিরে, মা'র মন্দিরে সর্বত্রই পূজার জায়গা হইতেছে। পূজার সমস্ত দ্রব্যই প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে ভাগ ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। এইরূপ বিরাট ব্যাপার না দেখিলে বুঝানও যায় না। আর ইহা সুসম্পন্ন করাইতে পারেন একমাত্র মা-ই। ফুল, চন্দন, ফল, দুর্বা, জল, প্রহরে প্রহরে স্নানের জন্য দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু আদি সবই সকলের পূজার জন্য ব্যবস্থা হইতেছে। মা-ই সকলকে দিয়া করাইয়া নিতেছেন। যাহারা

পূজা করিবে বলিয়া নাম দিয়াছিল, তাহাদের নামাঙ্কিত কাগজ প্রত্যেকের আসনের উপরে রাখা হইতেছে। ইতিমধ্যে পূজকেরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া আপন আপন নাম দেখিয়া আসনে বসিয়া পড়িতেছেন। আবার নতুন কেহ পূজা করিবার জন্য আসিলে তাহাদেরও আসনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এইরূপে সকলের সব ব্যবস্থা হইয়া গেলে, মা প্রথম প্রহরে কুসুম ব্রহ্মচারীকে দিয়া পূজা করাইলেন। তাহারপর ক্রমান্বয়ে বাটুদা, শোভন প্রভৃতি এক একজনকে দিয়া মা সকলের পূজার ব্যবস্থা করাইলেন।

মধ্যে শিব রাখিয়া গোলাকার হইয়া এক এক দল বসিয়াছে। এই ভাবে গোয়ালিয়রের মহারাণী, টিহরীর রাজমাতা, যোগীভাই, আম্বের রাজা রাণী সকলেই পূজায় বসিয়াছেন। মা-ও হল ঘরে একাধারে বসিয়া আছেন। মায়ের উপস্থিতিতে সারা রাত পূজা, কাজেই সকলেরই মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা রহিয়াছে, সকলেই খুশী। সাধারণ লোক হইতে আরম্ভ করিয়া রাজারাণী, উচ্চ পদস্থ কর্মচারী কেহই বাদ যায় নাই। পান্নালাল ভাই আজ কয় বৎসর যাবৎই শিবরাত্রিতে মা'র কাছে বসিয়া সারারাত পূজা করেন। বৃদ্ধ অসুস্থ শরীর নিয়াও তিনি পূজায় বসিয়াছেন। কিন্তু এবার তাঁহার শরীরে এক অস্ত্রোপচার হওয়ায় তিনি আসিতে পারেন নাই বলিয়া কত আক্ষেপ করিয়াই না পত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি দিল্লীতে নার্সিং হোমে আছেন। তাঁহার দুই জামাতা ও দুই মেয়ে পূজায় বসিয়াছে। ইহারা হয়ত এই জাতীয় কিছু কখনও করিবেন বলিয়া ধারণাও করেন নাই, কিন্তু লীলাময়ী মায়ের লীলায় কত লোকের পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করে!

যাক এই পূজা স্থানে মা সারা রাত বসিয়া রহিলেন। চার প্রহরের পূজা শেষ হইল। মা সকলকে ফল বিতরণ করিয়া উপরে বিশ্রাম করিতে গেলেন। ইহারই মধ্যে মা একবার কল্যাণবনেও ঘুরিয়া আসিয়া-

ছেন। সেখানে শোভন ও কমল পূজায় বসিয়াছে। মা'র খেয়াল যে সর্বত্র, সর্ব দিকে। কোথাও তাহার ত্রুটী হইবার উপায় নাই। এই ভাবে শিব প্রতিষ্ঠার পর কিশনপুর আশ্রমে শিবরাত্রি উদ্‌যাপিত হইল।

৮ই মার্চ ১৯৫৯।

আজ ভাণ্ডারা। বহু লোক প্রসাদ পাইলেন।

আমি কল্যাণবনেই আছি। কাল সারা দিন এবং রাত্রিতে প্রথম প্রহরের পূজা পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম। পরে মা আমাকে বিশ্রামের জন্য পাঠাইয়া দেন।

একটি ঘটনা।

আজ সন্ধ্যায় শিরমোড়ের রাজমাতা ও রাজা এবং আরও কয়েকজন মা'র দর্শন করিয়া আমার কাছে আসিয়াছেন। আসিয়াই রাজমাতা মা'র ঘরখানিতে (যে ঘরে বর্তমানে আমি আছি) বসিয়া বলিতেছেন,—'এই ঘরের কি জানি কি প্রভাব।" বলিতে বলিতেই কেমন যেন একটু ভাবের পরিবর্তন ঘটিল। অল্পক্ষণ বসিয়াই আমার নিকট বিদায় নিয়া চলিয়া গেলেন। বাহিরে বাগানে যাইতেই মা'র সঙ্গে দেখা। মা আমাকে দেখিতে আসিতেছিলেন। তিনি মাকে পাইয়াই বলিলেন,—"মা আমার পা যেন কাঁপিতেছে।"

মা তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া আবার ঘরে আনিলেন। মা'র সঙ্গে আরও অনেকে আমার ঘরে আসিয়া বসিলেন।

মণ্ডীর রাজাও আসিয়াছেন। কথায় কথায় মা বলিলেন, এই রাজমাতা নাকি একদিন এইখানে আসিয়া মা'র নিকট বসিতেই ভাবের একটা বিশেষ পরিবর্তন হইয়া যায়। তাঁহার আত্মীয়েরা ত ভয়ে কাঁদিতেই লাগিল। তাড়াতাড়ি ছেলেকে ফোন করিয়া আনাইল। তখন মা উহার শরীরের এক এক স্থানে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই'। ইহার একটু

পরেই রাজমাতা চোখ খুলিলেন, কিন্তু তা-ও যেন নিস্পন্দ নির্বাক। অল্প কিছুক্ষণ পরে কিছুটা ঠিক হইয়া বাড়ী গেলেন।

এই সব শুনিয়া মণ্ডীর রাজা বলিলেন, বোধ হয় এই ঘরের নীচে কিছু আছে। আমি বলিলাম,—'না, তাহা নয়। এক একটা স্থান এক এক জনকে আকর্ষণ করে,—হয়ত কোনও কারণ থাকে।' মা দেখিলাম আমার কথার অনুমোদন করিলেন।

তারপর শিরমোড় ও মণ্ডির রাজা উভয়ে প্রশ্ন করিলেন :—এই যে দর্শনাদি হয়, ইহা কি সত্য ? না কেবল কল্পনা ?

মা—'সব রকমই হইতে পারে। একেবারে সব সত্যও হয়, আবার কখন-ও কখন-ও কল্পনাও হয়।'

এই জাতীয় ২।৪টি কথা হইল। পরে মা আশ্রমে ফিরিবার জন্য উঠিলেন। উপস্থিত সকলকে ফল মিষ্টি দিলেন। আর আমাকে ১টি পেঁপে দিয়া বলিলেন,—'দিদি, ইহা তুমি খাইও।'

মা'র সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। আগামী কল্য বিকালেই মা'র বৃন্দাবন ফিরিয়া যাইবার কথা। এতবড় ব্যাপার গড়িতে বা ভাঙ্গিতে মা'র বেশী সময় লাগে না।

৯ই মার্চ ১৯৫৯।

মা'র কিশনপুর হইতে দিল্লী হইয়া বৃন্দাবন গমন।

বৈকালে মা বৃন্দাবন রওনা হইবেন। আজ প্রভাদি ও ভবানীর ননদ বীণাদি শিবপূজা করিলেন। ব্রহ্মচারী কুসুমই উহাদের পূজা করাইল। মা'র মন্দিরেই মা'র ভোগ হইল। বৈকাল ৪টায় মা সকলকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া আমার সুব্যবস্থা করিয়া, অনেককেই কাঁদাইয়া রওনা হইয়া গেলেন। আমি উপস্থিত কল্যাণবনেই রহিয়া গেলাম।

মা হংসাদেবীর দেবর ওঁমপ্রকাশজীর মোটরে রওনা হইলেন। কথা হইয়াছে আজ রাত্রিটা মা দিল্লী আশ্রমে গিয়া থাকিবেন। পরদিন ভোগের পরে বৃন্দাবন রওনা হইবেন। মা'র শরীর মোটেও ভাল নাই। তাহার উপর কথা বলার, চলার, ভাবেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিন্তু এ অবস্থায়ও যতটা সম্ভব সকলের সঙ্গে ব্যবহার চালাইয়াই যাইতেছেন। গত কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই এই ভাবটা ধীরে ধীরে আসিতেছে। কিন্তু কি করা। করিবার তো কাহারও কিছু উপায় নাই। মা'র মোটরে পরমানন্দ স্বামী, বুনি, পানু ও উদাস রওনা হইল। অপরাপর এক পার্টি কাল সকালে ট্রেনে ও এক পার্টি আজ বৈকালে ট্রেনে রওনা হইল.

১২ই মার্চ ১৯৫৯।

বৃন্দাবনের পত্র আসিয়াছে। তাহাতে সংবাদ পাইলাম মা রাত্রি প্রায় ৯।০টায় দিল্লী আশ্রমে পৌঁছিয়াছিলেন। পরদিন প্রায় ২॥০টায় ভোগের পরে নার্সিং হোমে পান্নালালজীকে দেখিয়া সোজা বৃন্দাবন রওনা হইয়া গিয়াছিলেন। বৈকাল প্রায় ৫॥০টায় বৃন্দাবন পৌঁছিয়াছিলেন।

মা বৃন্দাবনে গিয়া নিজের কুটিয়াতেই আছেন। দিল্লী হইতে মা ভূপেনের গাড়ীতে বৃন্দাবন গিয়াছেন। ভূপেনও সপরিবারে সঙ্গেই ছিল। মা যাওয়ার পথেই বৃন্দাবনে হরিবাবাকেও তাঁহার আশ্রমে দেখিয়া গিয়াছেন।

হরিবাবার সৎসঙ্গে মা রোজ তিনবার করিয়া যান। তবে আজ হইতে শ্রী বি, কে, গুপ্তা সাহেবের ভাগবৎ সপ্তাহ আরম্ভ হইতেছে তাই মা সকালে ১০টা হইতে ১০॥০টা, বৈকালে ৫টা হইতে ৫॥০টা এই দুইবার উপস্থিত থাকিবেন। আর মা'র নাকি ২৫শে মার্চ বৃন্দাবন হইতে মোদিনগরের মোদির প্রার্থনায় পাতিয়ালা যাইবার কথা হইয়াছে। মোটরে দিল্লী আসিয়া ২৫শে

সেখানে থাকিয়া ২৬শে পাতিয়ালা যাইবেন। তথায় ৫ দিন থাকিয়া ১লা এপ্রিল হরিবাবার আহ্বানে হুসিয়ারপুর যাইবেন। তথায় ৩ দিন থাকিয়া ঋষিকেশ রওনা হইবার কথা। ঋষিকেশে ১৫ই এপ্রিল হইতে সংযম সপ্তাহ হইবার কথা হইয়াছে। দিদিমার সন্ন্যাস উৎসবও চৈত্র সংক্রান্তিতে তথায়ই হইবে।

চিত্রার এক পত্র (বৃন্দাবন হইতে লেখা) আজই পাইলাম। লিখিয়াছে, ইতিমধ্যে মা'র শরীর একটু খারাপ হইয়াছিল। এখন ভালই আছেন।

মিঃ গুপ্তের সপ্তাহে খুব চমৎকার সাজাইয়াছে। ঠাকুর বাড়ীর দালানে সব ব্যবস্থা করিয়াছে। মাকে স্বামি-স্ত্রী দুইজনেই খুব ভক্তি ভরে গুরু পূজা করিল।

হরিবাবার ওখানে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পাঠ প্রায় বৈকালে হয়। ছবি ব্যানার্জী মা'র কাছে আছে। আশ্রমের বিরাট হলে সন্ধ্যাবেলা মাঝে মাঝে গান হয়। মা-ও মধ্যে মধ্যে শোনেন। তাহারপর সৎসঙ্গে হরিবাবার আশ্রমে চলিয়া যান।

এবার সংযম সপ্তাহ ঋষিকেশে হইবে। তাই মা সকলকেই বলিতেছেন, "এবার সংযম ঋষিকেশে হইবে। টাকা পয়সার জন্য ভাবিও না। যে যে পার যাইও।"

চিত্রা আরও লিখিয়াছে,—"হরিবাবার জন্মোৎসবের জন্য সাজান আরম্ভ হইয়াছে। একজন American সাহেবের আগমন হয়েছে। বড় নাম-করা painter. খুব ধ্যান ভজন করছে গীতা ভবনে।"

২৩শে মার্চ ১৯৫৯।

আজ স্বামিজীর ও বুনির চিঠি পাইলাম। রাজমাতা টিহরী রামায়ণ পাঠককে নিয়া আসিয়াছেন। এই পাঠককেই রাজমাতা আনন্দ-কাশী

নিয়া মাকে রামায়ণ শুনাইয়াছিলেন। দেরাতুনেও শিব প্রতিষ্ঠার সময় ইনি রামায়ণ পাঠ করিয়াছিলেন। রোজ পাঠ হইতেছে।

২৪শে মার্চ ১৯৫৯।

আজ দোল পূর্ণিমা। আজ দিল্লী হইতে সাধনের পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে যে সে খবর পাইয়াছে যে মা আগামী কাল বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লী আশ্রমে পৌঁছিবেন। শ্রীমৎ হরিবাবা ও অবধূতজীও সঙ্গে থাকিবেন এবং সম্ভবতঃ ২৬শে তারিখেই পাতিয়ালা রওনা হইবেন। সঙ্গে ৭০।৮০ জন লোক বাসে আসিবে। তাহারা ওখলা মোদী মিলে রাত্রিতে থাকিবে। সাধন আরও লিখিয়াছে,—"মা'র উপরের ঘর হইয়া গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার খান্না সাহেব কাঁচের ঘর ২টিও সুন্দর করিয়া তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন। এই জাতীয় ঘর আর আমাদের কোন আশ্রমে নাই।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

২৭শে মার্চ ১৯৫৯।

সাধনের পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে মা ২৫শে সন্ধ্যা ছয়টায় ওখানে পৌঁছিয়াছেন। পরদিন ভোরেই পাতিয়ালা চলিয়া যাইবেন। গুজরমল মোদীর আহ্বানে হরিবাবা, মা, অবধূতজী প্রভৃতি পাতিয়ালা যাইতেছেন। সেখানে নাকি ৫দিন উৎসব হইবে। সাধুদের নিয়া উৎসবাদি করা এতদ্দেশে খুব প্রচলিত আছে।

২৭শে মার্চ তারিখে পাতিয়ালা হইতে লেখা স্বামিজীর এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিতেছেন—

"আমরা গতকাল ৮৷৷৹টার সময় এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মায়ের শরীর একপ্রকার ভালই। তবে শরীরে একটু বেদনা আছে। আমাদের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এখানে থাকার কথা। ১লা এপ্রিল আমরা হুসিয়ারপুর যাইব। সেখানে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত থাকার কথা। সন্ধ্যায় জলন্ধর আসিয়া ৭ই সন্ধ্যায় আমরা হরিদ্বার রওনা হইব। ৮ই এপ্রিল হরিদ্বার পৌঁছিব। আপনার প্রার্থনা অনুযায়ী মা দুই-তিন দিন দেরাদুন থাকিতে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু হরিবাবা গতকাল বলিলেন যে তিনি ৯ই বা ১০ই হৃষিকেশ পৌঁছিবেন। তাই বোধ হয় মায়ের আর দেরাদুন যাওয়া সম্ভব হইবে না। গেলেও হয়ত একদিন মোটরে গিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারেন।

হৃষিকেশ হইতেই সংযম সপ্তাহের পর হরিবাবাও দেরাদুন যাইবেন। মা'র জন্মোৎসব এবার দেরাদুনেই হইবার কথা হইয়াছে। এবার বহু লোক হইবে। খালি বাড়ী পাইলে যেন রাখিয়া দেওয়া হয়।" ইত্যাদি অনেক কথা স্বামিজী লিখিয়াছেন।

স্বামিজীর পত্র পাওয়ার পরদিনই পাতিয়ালা হইতে বুনির পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে, বৃন্দাবনে হরিবাবার উৎসব খুব ভালো ভাবেই হইয়াছে। তাহার পর ভাগবৎ ভবনে নামযজ্ঞ হইল। সারা রাত মেয়েরা ও সারা দিন ছেলেরা নাম চালাইয়াছে। দিল্লী-পার্টিই নাম যজ্ঞ করিয়াছে। এবার নাম যজ্ঞের বিশেষত্ব হইল অধিবাসের গান মা-ই আরম্ভ করেন। পরের দিন গ্রহণ ছিল। রাত্রি ১২টা হইতে রাত্রি ২টা পর্যন্ত নাম হয়। মা-ও অনেকক্ষণ নাম করিয়াছিলেন।

ছবি ব্যানার্জী এখনো মা'র সঙ্গেই আছে। সকলেরই আনন্দে দিন কাটিতেছে।

২রা এপ্রিল ১৯৫৯।

আজ হুসিয়ারপুর হইতে স্বামিজীর পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, মা'র শরীর ভালই আছে। সাধনদার পত্রে জানিলাম দিল্লীর ডাক্তার জীবন নাথের স্ত্রী মারা গিয়াছেন। বেচারী খুব-ই ভাল লোক ছিলেন। আশ্রমের জন্যও অনেক কিছু করিয়াছেন। স্বামীর সেবাও খুব করিতেন।

হুসিয়ারপুরে মা।

তিনি আরো লিখিয়াছেন আমরা ৮ই সকালে হরিদ্বার পৌঁছিব। ১০ই এপ্রিল হরিবাবা হৃষিকেশ পৌঁছিবেন। যদি সম্ভব হয় মা ইহারই মধ্যে একবার দেরাদুন ঘুরিয়া আসিবেন।

মা সকালে পৌনে নয়টায় রাম অর্চ্চায় যান। ৯টায় ফিরেন। আবার ১০॥০টায় রামলীলায় যান ও ১১॥০টায় ফিরিয়া আসেন। বৈকাল ৪টায় সৎসঙ্গে থাকেন। ৫টায় ফিরেন। রাত্রিতেও কীর্তনে ৮টা হইতে ৯টা পর্যন্ত থাকেন।

৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৯।

আজ স্বামিজীর এক পত্রে জানিলাম ভুবনদার ছেলে তুতু প্লেন পুড়িয়া গিয়া মারা গিয়াছে। সংবাদটি খুবই মর্মান্তিক। প্লেনে নাকি ২৪জন লোক ছিল, সকলেই মারা গিয়াছে। তুতু ছেলেটি খুবই ভাল ছিল।

৮ই এপ্রিল ১৯৫৯।

আজ সকালেই মা'র হরিদ্বার পৌঁছার কথা। সন্ধ্যাবেলায়ই মা এখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিশনপুর আশ্রমে নামেন নাই, মোটর দাঁড় করাইয়া দিদিমাকে উঠাইয়া কল্যাণবনে আসিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তরাও অনেকে আছেন। শুনিলাম হরিবাবা কালই হৃষিকেশ আসিয়া সপ্তর্ষি আশ্রমে থাকিবেন। তাই মা'র কালই যাইবার প্রয়োজন নাই। তাই ঠিক হইয়াছে মা ১২ই এপ্রিল হৃষিকেশ যাইবেন। বলিলেন,—"হরিবাবাকে বলিয়া আসিয়াছি এই দুই-তিন দিন দিদিকে দেখিয়া আসি।"

মা দর্শন দিয়াছেন খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু হরিষে বিষাদ। মা বলিলেন—"তোমার বেশী নাড়াচাড়া করা ঠিক হইবে না। তুমি ঐ আশ্রমে যাইবে না। যখন হয় আমিই আসিব।"

মা একে ত এত অল্প সময়ের জন্য আসিয়াছেন, কিন্তু দেখা আরও অল্প সময়ের জন্য হইবে। কি করা উপায় নাই। মা'র আদেশ। জানি না কত জন্ম-জন্মান্তরের মহাপাপে আমার এই অসুস্থতা। তাই মা'র নিকট হইতে দূরে পড়িয়া আছি।

কিছু সময় বসিয়া মা ঐ আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

৯ই এপ্রিল ১৯৫৯।

মা'র সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, মাকে বলিয়াছিলাম। এখন এত লোক সঙ্গে তাই কিছু বলা হইল না। করুণাময়ী মা আজ বেলা প্রায় ১১টায় আমার কাছে আসিয়া বলিলেন,—"দিদি, তোমার কথা আছে

বলিয়াছিলে, তাই সকলকে আসিতে নিষেধ করিয়া আসিয়াছি। কি কথা বল ?"

দেখিলাম সঙ্গে শুধু ছবি ব্যানার্জী। ছবিকে মা বারান্দায় বসিতে বলিলেন। কথা যাহা বলিবার ছিল বলিলাম। অবশ্য কথার কি শেষ আছে। মা দুই-তিন ঘণ্টা রহিয়া কিশনপুর আশ্রমে চলিয়া গেলেন। যাইবার একটু পূর্বে ভূপেনের শ্বশুর ডাঃ মুখার্জি মা'র দর্শনে আসিলেন। ছবিও ঘরে আসিল। মা কি কথা সান্ত্বনার সুরে আমাকে বলিলে আমার চোখে জল আসিল। ছবিকে বলিয়া ফেলিলাম,—'মা এত অল্প সময়ের জন্য আসিলেন তাও এইখানে থাকা হইল না। মা'র দেখাও সর্বদা পাইব না। এই ভাবের কি কথা আমি বলিতেই মা বলিলেন,—"বাঃ, তাতে কি যখন যেমন, তখন তেমন। তিনি যখন যে ভাবে রাখবেন, তাই সন্তুষ্ট চিত্তে নেওয়া। তাঁর যা ইচ্ছা করুন।"

আমার চোখে জল। ঐ ভাবেই অস্পষ্টভাবে বলিয়া ফেলিলাম,—"বিচার ত তাহাই করি।"

শুধু বিচার করিলেই হয় না। বিচারকে কার্যে পরিণত করিতে হয়।

মা বলিলেন,—"শুধু বিচার রাখিলে কি হয়। মনে প্রাণে মানিতে হয়। মনে প্রাণে মানিলে আর দুঃখ হয় না। চোখে জল আসিবে কেন ?" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—"দিদি, তোমাকে এবার যেন নরম নরম দেখিতেছি। এ কি ?"

সত্যই মা'র সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া এত বৎসর ভুগিতেছি ; আমার মনটা আজ সকাল হইতেই বিশেষ খারাপ। মা এই ভাবের কথা যতই বলেন, আমার চোখের জল যেন ততই বাড়ে। ঘরে অন্য লোক আছে, তাই চোখে জল আসায় আমি লজ্জিতভাবে একটু হাসিয়া বলিলাম,—'তুমি এই সব বলছ কেন ?'

মা-ও হাসিয়া বলিলেন,—"সকলে বুঝি তোর চোখের জল দেখছে না ?"

আমি একটু অস্পষ্টভাবে বলিলাম,—"তুমি এই সব বলাতেই ত।"

ছবিও ঐ কথাই বলিল।

যাক্ এসব লীলা শেষ করিয়া মা চলিয়া গেলেন।

বৈকালে সকলকে নিয়া মা হাটিয়াই আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে ছবিকেও নিয়া আসিয়াছেন। হারমোনিয়ামও আসিয়াছে। শুনিলাম, মা বলিয়াছেন আজ এইখানেই কীর্তন হইবে।

মাকে ২খানা টুল জোড়া দিয়া একটু বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাশেই চেয়ারে আমি বসিলাম। আমার বেল্ট পরিতে হয়, তাই মাটিতে বসা নিষেধ। ইহা ডাক্তারদেরই নির্দেশ। কিছুদিন ত (প্রায় ৭।৮ মাস) একেবারে শুইয়াই থাকিতে হইত, উঠিয়া বসাও নিষেধ ছিল। সম্প্রতি উঠিয়া বসার অনুমতি দিয়াছে। আজ ত দীর্ঘ ৬ বৎসর হইয়া গেল, এইভাবেই ভুগিয়া চলিয়াছি

অপর পাশে দিদিমাকেও একখানা চেয়ারে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার ও মায়ের মধ্যবর্তী স্থানে মা ছবিকে হারমোনিয়াম নিয়া বসিতে বলিয়া বুনিকে বলিলেন—"তোমার ফরমাইসের সেই গান বল।"

বুনি বলিলে, ছবি দুইটি গান করিল। পরে নাম ধরিলে মা-ও মাথাখানি দুলাইয়া দুলাইয়া নূতন নূতন নামের ধারা ধরাইয়া দিতে লাগিলেন। ছবিও মায়ের দেওয়া সেই নব নব ধারায় নামগুলিকে মহানন্দে গাহিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ গাহিয়া পরে ছবি বলিতেছে,—"বাবাঃ, মা কি করিয়া এত সুর ভাল করেন। আর সবই একেবারে পাকা।"

ছবির কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, একেবারে পাকা। কাচা নয়। (ছবিকে লক্ষ্য করিয়া) এই ওস্তাদের কাছে আবোল তাবোল

বলিতে লজ্জাও করে না। যাক্ ভগবানের নাম করা নিয়া কথা . যা হয়ে যায়।”

ছবির গাওয়া গান ২টী এই :

১। যদি দুঃখের লাগিয়া গড়েছ আমায়
সুখ আমি নাহি চাই।
(শুধু) আঁধারের মাঝে তব হাতখানি
খুঁজিয়া যেন গো পাই।
(যদি) নয়নের জল না পার মুছাতে
পরাণের ব্যথা না পার ঘুচাতে
আছ কাছে কাছে হে মোর দরদী
কহিও আমারে তাই।

যদি হৃদয়ের প্রেম নাহি চাহে কেহ
পাই অবহেলা, নাহি পাই স্নেহ
(তবে) দিয়েছিলে যাহা হে মোর বিধাতা
ফিরিয়া লহ গো তাই।
(যদি) না পারি পুরাতে মনের বাসনা
যায় হে বিফলে সকল সাধনা
(যেন) এ দীন জীবনে, হে দীনের নিধি
তোমারে নাহি হারাই।

২। হে ভগবান,
যদি কিছু দাও মোরে দান।
পরাণ ভরিয়া দিও,
কণ্ঠ ভরিয়া দিও গান।

ধূলির ধনেতে মোরে রিক্ত করো,
তোমার প্রসাদে মোর চিত্ত ভরো,
আঘাতে আঘাতে মোরে চূর্ণ করো
যত কিছু মান অভিমান ॥

যদি দেখা দাও মোরে ভালবেসে
এসো গহনতম ঘন দুখের বেশে
ব্যথার কাজলে আঁখি ভরিয়া দিও
সকল ভুবন মোর হরিয়া নিও,
নিবিড় করিয়া মোরে বাঁধিয়ো প্রিয়
তব প্রাণ সাথে মম প্রাণ ॥

গান ২টী আমারও খুব ভালো লাগিল।

তাহারপর ১টী হিন্দী ভজন করিয়া নিত্য নিয়মিত সান্ধ্যকীর্তন আরম্ভ হইল। কন্যাপীঠের মেয়েরাও সঙ্গে যোগ দিল। মা'র উপস্থিতিতে এই সব খুবই ভালো লাগিল। মনটাও কিছুটা প্রসন্ন হইল।

করুণাময়ীর করুণা

বুঝিলাম, মা আমার মনের ঐরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই এত কষ্ট করিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছেন আর এই জন্যই এখানে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কীর্ত্তনান্তে সকলকে যাইতে বলিয়া মা প্রায় ৯॥০টা অবধি আমার কাছেই রহিলেন। পরে হংসাদেবীর মোটরে মা আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

১০ই এপ্রিল ১৯৫৯।

আজও প্রায় ১০টায় মা সকলকে নিয়া আসিলেন। এখানেই কীর্ত্তনাদি হইল। মা বারান্দায় ছোট টুলের ওপরেই ছোট বিছানায় বসিয়া আছেন।

আজও নতুন নতুন নামের ধারা বহাইতেছেন। মা'র মুখে নূতন নূতন নাম নূতন নূতন তাল ও মায়ের সঙ্গে শুনিয়া ছবি তো মহানন্দে মা'র সঙ্গে সঙ্গে নাম করিতেছে। আজও খুব আনন্দ হইল। পরে উপস্থিত সকলের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হইল। আজ মা যে নামপদগুলি গাহিলেন তাহা এইরূপ :—

মায়ের শ্রীমুখে নূতন নূতন নাম।

হে নাথ বিশ্বনাথ।
স্বয়ম্ভু বিশ্বনাথ।
মহেশ্বর বিশ্বনাথ।
হে নাথ গোপীনাথ।
রামেশ্বর ব্রজনাথ।
হে নাথ ব্রজনাথ :
রাধানাথ গোপীনাথ।
গোপেশ্বর গোপীনাথ।
(হা) শ্যাম সুন্দর রাধানাথ।
ব্রজেশ্বর ব্রজনাথ।
রাধাকান্ত রাধানাথ।
হে নাথ দীননাথ।
দীনবন্ধু দীননাথ।
জগবন্ধু জগন্নাথ।
রাম রাম সীতানাথ…ইত্যাদি।

আজও সকলে চলিয়া গেলে মা প্রায় ২ ঘণ্টা আমার কাছে বসিয়া রহিলেন। পরে চলিয়া গেলেন। ডাঃ মুখার্জীর স্ত্রী মা'র দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনিও সেই সঙ্গেই ফিরিয়া গেলেন।

আমি ত জানি মায়ের এই সব আয়োজন আমার উপর কৃপা করিবার জন্যই। কি আর বলিব, মা'র করুণার কথা! কত প্রকারে, আজ এই দীর্ঘ এত বৎসর যাবৎ মা'র কত কৃপাই না পাইতেছি কিন্তু তবুও কি সে কৃপার যোগ্য হইতেছি!

আজ বৈকালেও মা কল্যাণবনেই কীর্তন করাইলেন। ছবি, বীরেন সকলে মিলিয়া কীর্তন করিতেছে। উভয়েই কীর্তন প্রেমিক এবং মায়ের প্রতি উভয়েরই অগাধ ভক্তি।

আমার এই কল্যাণবনে থাকা সম্বন্ধে মা একদিন বলিলেন,—"ঐ আশ্রমে ভীড় হয়ে যায়। তোর তো শরীর খারাপ, তুই এইখানেই থাক। আমিই সময় মত আসব। আর তুই ত কথাও বলতে চাস্, ওখানে একান্তে কথাও বলবার উপায় নাই।"

আমিও ভাবিয়া দেখিলাম ইহা খুবই ঠিক। নির্জন স্থানে শান্তভাবে আমাকে রাখিবার জন্যই মা'র এই ব্যবস্থা।

রাত্রি প্রায় ১২টায় সদানন্দ ব্রহ্মচারী আসিল। সে এইখানেই থাকে। আসিয়া আমাকে বলিল, কাল সকালে আপনাকে কিশনপুর আশ্রমে নিয়া যাওয়া হইবে, আর মা কালই বৈকালে চলিয়া যাইতেছেন। সদানন্দ আরও বলিল, মা নাকি বলিয়াছেন,—"এই আশ্রমে আসিবে শুনিয়া দিদি খুব খুশী হইবে। আবার মা কালই চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া দুঃখিতও হইবে।"

আমি বুঝিলাম কোনও কারণে সব পরিবর্তন হইয়াছে। যাক্ যাহা হয় কালই সব সংবাদ পাওয়া যাইবে ভাবিয়া শুইয়া পড়িলাম।

১১ই এপ্রিল ১৯৫৯।

আজ সকালেই যোগেশদা আসিয়া বলিলেন,—'তোমাকে তৈয়ার থাকিতে বলিয়াছেন। স্বামিজী তোমাকে নিতে আসিতেছেন'। একটু পরেই

স্বামিজীও আসিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,—'স্বামিজীই মাকে বলিয়াছেন যে অনেকেই ত হৃষিকেশ চলিয়া যাইতেছে, আশ্রম ত প্রায় খালি। আর ঐ বাগানে শুধু শুধু ২টা মেয়ে নিয়া (তুলসী ও বাণী আমার সেবার জন্য আমার কাছে থাকে) দিদি পড়িয়া থাকিবে, ইহা ঠিক মনে হইতেছে না। তাই আমাকে ঐ আশ্রমে রাখিয়া যাওয়া স্থির হইয়াছে।

স্বামিজীর সঙ্গে আমি চলিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি মা মন্দির পরিষ্কার করাইতেছেন। মন্দির পরিষ্কার করাইয়া মা শিব-মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"দিদি, স্বামিজী বলিল, তাই তোমাকে এখানেই আনা হইল। এখানে ত কেহ না কেহ থাকিবেই। (শিবের আঙ্গিনা দেখাইয়া) এখানে তুমি একটু একটু হাটিবে।"

আমি বলিলাম,—'মা, তুমি নাকি আজই চলিয়া যাইতেছ'?

মা বলিলেন,—"হ্যাঁ দিদি, আজই যাওয়া। বৈকাল প্রায় ৪।৪॥০টার মধ্যে যাওয়া। আজ গিয়া হরিদ্বার থাকা হইবে। কাল হরিবাবার ওখানে গোস্বামী গণেশ দত্তের যাওয়ার কথা। আবার ১৩ই তারিখে কনখলে সাধুদের একটা কাজে হরিবাবাকে ও এই শরীরটাকে নিয়া যাইবার কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছে। এই সব নানান ব্যাপার আছে, কাজেই আজই যাওয়া ভাল।"

শ্রীশ্রীমায়ের দেরাদুন ত্যাগ। হরিদ্বার ও হৃষিকেশের পথে মা।

আমি আর কিছু বলিলাম না। মা যাহাকে যাহা বলিবার প্রয়োজন বলিতেছেন। একটু পরেই আবার আমাকে বলিতেছেন,—"চল হলে যাই। ছবিও চল।"

মা আসিয়া হলে বসিলেন। ছবি, বিভু প্রভৃতি অনেকেই আছেন। মা বিভুকে বলিলেন,—"তুই না সোলনে কি যেন শিখিয়া রাখিয়াছিলি।"

বিভুর শরীর খারাপ, তাই সে গান গাহিবে না। সে ছবিকে একটু

সামান্য বলিয়া দিতেই মা বলিলেন,—"আর ধরাইতে হইবে না। ও এখন পারিবে।"

বাস্তবিকই ছবি সুন্দরভাবে ঐ গানটি গাহিল। মা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"গুণীর হাতে পড়িলে এমনই সব ঠিক হইয়া যায়।"

বিভু বলিল,—"আরো ২টি গান আছে।"

তখন মা বলিলেন,—"সোলনে যখন যোগীভাই দেবী ভাগবৎ করায়, তখন এই শরীরটা বলিল, শ্রীমদ্ভাগবৎ হইলে কৃষ্ণের গান করিস্, আর এখন দেবীর গান কর। এই বলিয়া আবোল তাবোল কি সব বলিয়া দেওয়া হইল। বিভু লিখিয়া রাখিয়া সেই গানগুলি করিয়াছিল।"

মা বলিয়া দিয়াছিলেন শুনিয়া আমরা সকলেই আগ্রহভরে শুনিতে চাহিলাম। বিভু একটু একটু বলিয়া দিতেই ছবি সুন্দরভাবে গানগুলি করিল। মা-ও একটু একটু সুর ধরাইয়া দিতেছিলেন। সকলেরই খুব আনন্দ।

গানগুলি এই :—

১। জয় মা ভবানী, জয় মা শিবানী
জয় জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকে।

২। জয় মা ভবানী, জয় মা শিবানী
ব্রহ্ম সনাতনী জয় দুর্গা।

৩। কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী।

এই ভাবেই সেখানে নানা ভাবে আনন্দ চলিতে লাগিল।

প্রায় ১২টায় মাকে ভোগের জন্য ডাকিয়া নিয়া যাওয়া হইল। আমারও সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মা বলিলেন,—"না, তুমি এত নাড়াচাড়া করিতে পারিবে না।" তাই আর গেলাম না।

ভোগের পরে মা একটু সময় আমার ঘরে আসিয়া বসিলেন। দিদিমারও

আজ শরীরটা ভাল নয়। মাথা ঘুরিতেছে তাই শুইয়া আছেন। মা ভোগে যাওয়ার পূর্বেও তাঁহাকে একটু দেখিয়া গিয়াছেন। একটু পরেই মা ওপরে নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন।

মা আজ রওনা হইবেন, অনেকেই এই সংবাদ পায় নাই। যাহারা পাইয়াছে, তাহারা মা উঠিবার পূর্বেই মা'র দর্শনের জন্য আসিয়া উপস্থিত। ডাঃ সোম বড়ই অসুস্থ। নড়াচড়া করা তাঁহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। কিন্তু তিনিও মাকে প্রণাম করিবার জন্য আসিয়া বসিয়া আছেন। সত্যবাবু, হেমবাবু, লছমীজী, করণপুরের রাঙ্গালীরা অনেকেই আসিয়াছেন।

মা নামিয়া আসিয়াছেন। ডাঃ সোমকে দেখিয়া বলিতেছেন,—"তুমি এত শরীর খারাপ নিয়াও আসিয়াছ? খেয়াল করিতেছিলাম যাওয়ার পথে তোমাকে দেখিয়া যাইব।"

ইহা শুনিয়া তিনি খুব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—"মা, আমারও ঠিক এই কথাই মনে হইয়াছিল যে মা হয়ত আমাকে দেখিয়া যাইবেন।"

মা একটু গম্ভীর হইয়াই বলিলেন,—"শরীরটা বেশী খারাপ দেখিতেছি।"

যথাসময়ে মা রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গীয় অনেকে পূর্বেই রওনা হইয়া গিয়াছেন।

আজ মা যাইবেন, সেই জন্য সকাল হইতেই মা কত কাজ করাইয়া গিয়াছেন। শিবের আঙ্গিনা কি ভাবে কি ডিজাইনে নির্মাণ করাইতে হইবে; মন্দির construction-এর কাজে কোথায় একটু একটু অদল-বদল করাইতে হইবে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ভোগ শুদ্ধ ভাবে কেমন করিয়া দেওয়া, মন্দির সুন্দরভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা ইত্যাদি সবই যাহাকে যাহা করিতে হইবে বুঝাইয়া বলিতেছেন।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া ছবি বলিতেছিল,—'আশ্চর্য ত! মা ভোগ-

রাগের কথাও বলিতেছেন, রান্নাঘর, মন্দির, কোথায় কি করা তাহাও বলিতেছেন, আবার engineering-এর বিষয়ও বলিতেছেন। ওদিকে আবার গানের তাল-মান-পদও বলিয়া দিতেছেন, রোগীর সেবার ব্যবস্থাও করিতেছেন। সবই যেন পূর্ণ।'

মা'র সবই পূর্ণ।

ছবি খুব বেশী সময় মা'র সঙ্গে থাকে নাই, আসা যাওয়া করে। তাই ও এই সব দেখিয়া আশ্চর্য হইতেছিল। আমরাত আজ ৩০।৩৫ বৎসর ধরিয়াই এই সব দেখিয়া আসিতেছি। কাজেই আমাদের নিকট ইহাতে আর আশ্চর্য বোধ হয় না।

একটি কথা গতকালের পাতায় লিখিতে ভুলিয়াছি। আমার রচিত মা'র বই নারায়ণ স্বামিজী রোজই একটু একটু পাঠ করেন। পাঠের মধ্যে এক জায়গায় মাকে বলিয়াছিলাম,—'মা, অখণ্ডানন্দজীর দেহ রক্ষার দিন "ভেদ" "দর্শন" এই ২টা শব্দ বাহির হইয়াছিল। প্রণামের মতও হইয়াছিল। ইহার অর্থ কি?

মা বলিলেন,—"ভেদভাব নষ্ট হইয়াছে আর দর্শন হইয়াছে এই আর কি? স্বরূপ প্রকাশ আর কি।"

এ বিষয়ে আর কিছু কথা হয় নাই।

দিদিমাও মা'র সঙ্গে গিয়াছেন। তাঁহার শরীরের যে অবস্থা ছিল তাহাতে মা সঙ্গে করিয়া না নিয়া গেলে এই অবস্থায় যাওয়া সম্ভবই হইত না।

১৩ই এপ্রিল ১৯৫৯।

আজ কালনদি, সদানন্দ, আত্মানন্দ প্রভৃতি কন্যাপীঠের মেয়েদের নিয়া প্রত্যুষেই হৃষিকেশ রওনা হইয়া গেলেন। চৈত্র সংক্রান্তির

দিন তথায় দিদিমার সন্ন্যাস উৎসব। ১লা বৈশাখ হইতে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত আরম্ভ।

১৭ই এপ্রিল ১৯৫৯।

হৃষিকেশ রামনগরে আত্মবিজ্ঞান ভবনে এবার সংযম সপ্তাহ ১৫ই হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গত ১৪ই দিদিমার সন্ন্যাস উৎসবও তথায় খুব ভাল ভাবেই হইয়া গেল। আমি ত কিশনপুরেই আছি। হৃষিকেশ হইতে প্রায়ই লোক আসা-যাওয়া করিতেছে। কন্যাপীঠের মেয়েদের নিয়া কালনদিও গিয়াছেন। হরিদ্বার হইতে বিদ্যাপীঠের ছেলেরাও গিয়াছে। শ্রীহরিবাবাজী মহারাজ, অবধূতজী, চক্রপাণিজী, কৃষ্ণানন্দজী, শরণানন্দজী প্রভৃতি মহাত্মাগণও আসিয়াছেন। ১০০ সাধুকে ভোজন করান ও বস্ত্রাদি দেওয়া হইয়াছে। গুরু পূজা ইত্যাদি সবই বিশেষ ভাবে করা হইয়াছে।

হৃষিকেশ রামনগরস্থ আত্মবিজ্ঞান ভবনে সংযম সপ্তাহ।

হৃষিকেশ জায়গা ত খুবই সুন্দর, তদুপরি আত্মবিজ্ঞান ভবনটি একেবারে গঙ্গার ওপরে, কাজেই সকলের খুবই ভাল লাগিয়াছে। ভাইয়া দিল্লী হইতে এখানে আসিয়া আমাকে দেখিয়া মা'র নিকট হৃষিকেশে চলিয়া গেলেন। কথায় কথায় তিনি বলিলেন,—"দিদি, ডাক্তাররা ত আপনার জীবন সম্বন্ধে নিরাশই হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন ঔষধে আর কোন কাজ করিতেছে না। আমরা আর কি করিতে পারি। কিন্তু একথা আপনাকে জানান হয় নাই।"

আমি বলিলাম,—"হ্যাঁ, অনেক পরে এই কথা আমাকে জানাইয়াছিলেন।"

ডাক্তারদের এই কথা শুনিয়াই মা আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, —"দিদি, ডাক্তাররা যাহা করিতেছে, করুক। তোমার এখন হইতে এই এই করিতে হইবে, এই বলিয়া আঙ্গুলে কর গুণিয়া গুণিয়া বলিয়াছিলেন : ১। হাওয়া ২। খাওয়া ৩। ফল ৪। জল ৫। মৌন ৬। বিশ্রাম—এই ৬টা কাজ তোমাকে করিতে হইবে।

আমার অসুস্থ জীবনের কয়েকটি কথা।

১। দরজা খোলা থাকিবে, হাওয়া খাইবে।

২। খাইতে পারি না বলিলে চলিবে না। জোর করিয়া যাহা পার খাইতে হইবে।

৩। ফল খাইতে হইবে।

৪। মৌন থাকিবে।

৫। যতটা পার বারে বারে জল খাওয়া।

৬। মধ্যাহ্নে খাওয়ার পর ঘর খালি করিয়া একেবারে বিশ্রাম। রাত্রি ১০টায়ও ঘর খালি করিয়া বিশ্রাম।

মা'র কথামত এই নিয়মই চলিল। বলাবাহুল্য এই নিয়মে থাকিয়াই শরীরের গতি ফিরিয়া গেল। ঔষধেও কাজ হইতে লাগল।

আমার এই সময় কয়েকটি কথা মনে হইল। ভাইজীকেও মা মৃত্যুমুখ হইতে দুইবার বাঁচাইয়াছিলেন। আমারও নূতন জন্ম দিলেন। এই অসুখে কেহ বড় বাঁচে না। মায়ের করুণার কী আর পার আছে!

২০শে এপ্রিল ১৯৫৯।

আজ কালনদি কন্যাপীঠের মেয়েদের নিয়া ফিরিলেন। শুনিলাম মা ও হরিবাবা ২৩।৪ সকালে এখানে আসিতেছেন।

২২শে এপ্রিল ১৯৫৯।

আজ বৈকালে সকলেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মা এখনো আসেন নাই। শুনিলাম মা-ও রওনা হইয়াছেন। হৃষিকেশস্থ কালীকম্বলীওয়ালার ছত্রের ম্যানেজার মাকে ও হরিবাবাকে ও অন্যান্য সাধুদের আহ্বান করিয়া নিয়া গিয়াছেন। সেখানে সৎসঙ্গ হইতেছে।

রাত্রি প্রায় ৯টায় মা আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়া মা হলে গিয়া বসিলেন। কীর্ত্তনাদি হইতেছিল। পরে আমার ঘরে আসিয়াও খানিকক্ষণ বসিলেন। এইভাবে ওদিক এদিক ঘুরিয়া মা প্রায় ১২টায় বিশ্রাম করিতে গেলেন।

২৩শে এপ্রিল ১৯৫৯।

আজ পূর্ণিমা। মা আজ হইতে চব্বিশ ঘণ্টা জপ চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব হইতেই জপ ১২ ঘণ্টা চলিতেছিল। আজ বলিলেন,— "শুধু শুধু বসিয়া থাকা কেন? যে যতটা পার তাঁর জন্য সময় দেও।"

ঠিক হইল এক এক ঘণ্টা করিয়া এক এক জন বসিবে। দিনরাত অখণ্ড ভাবে জপ চলিবে।

সংযম সপ্তাহের আরো কথা।

সংযম সপ্তাহও শুনিলাম খুবই সুন্দর হইয়াছে। প্রায় ২৫০ জন লোক ব্রতী হইয়াছিল। গঙ্গার তটে, মনোরম স্থানে মা'র উপস্থিতিতে সকলেই এই ব্রতে খুব আনন্দ পাইয়াছে।

এই স্থানটি শুনিলাম কালীকম্বলীওয়ালা ছত্রের অধীনেই। ওখানকার ম্যানেজার প্রত্যহই আসিয়া খোঁজ খবর নিতেন। কাজেই কাহারও কোন

অসুবিধা হয় নাই। সেখানে electric light ছিল না। মোদীনগরের গুজরমল মোদী ডাইনামো বসাইয়া সর্বত্র আলোর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

আশ্রমস্থ সকলেই গঙ্গার শান্ত ধারায় স্নান করিয়া বেশ প্রফুল্ল হইত।

এইভাবে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত অতি সুষ্ঠু এবং আনন্দদায়ক ভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

মা এখান হইতে ১১ই এপ্রিল বৈকালে গিয়া হৃষিকেশে গেলেন। সেখানে রামনগরেই ছিলেন। সেখান হইতে ১২ই বৈকালে প্রায় ৪ ঘটিকার সময় সপ্তর্ষি আশ্রমে হরিবাবার সৎসঙ্গে যান এবং সন্ধ্যার সময় হরিদ্বার হইয়া পুনরায় রামনগরে ফিরিয়া আসেন।

কথা হইল ১৩ই গোস্বামী গণেশ দত্তের আহ্বানে পণ্ডিত জহরলালজী সপ্তর্ষি আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তখন মাকে-ও সেখানে নিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে সপ্তর্ষি আশ্রমে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মাতৃসকাশে নেহেরুজী।

শুনিলাম সেখানে খুব উচ্চ মঞ্চের উপর মাঝখানে নেহেরুজী। এক পার্শ্বে মা ও অন্য পার্শ্বে হরিবাবাজী এবং নেহেরুজীর পিছনে গণেশদত্তজী বসিয়াছিলেন। তথায় এক একজনের বক্তৃতার মধ্যে যে অবসর ঘটিত সেই সময়ে মধ্যে মধ্যে মা ও জহরলালজীর মধ্যে যাহা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা এই—

নেহেরুজী মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাতাজী, ক্যায়সী হ্যায় ?"

মা—"পিতাজী ক্যায়সা হ্যায় ?"

মা 'পিতাজী', বলায় পণ্ডিতজী প্রথম ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই,—পিতাজীটি কে ? সুতরাং তিনি মা'র দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিতাজী কৌন ?"

এবার মা তাঁর দিকে সংকেত করিয়া বলিলেন,—"তুম্, তুম্, তুমহী পিতাজী হো।" এইবার জহরলালজী উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইন্দিরা ক্যায়সী হ্যয় ?"

মা ইন্দিরাকে খুব ছোট বয়সে তাহার মা কমলার সঙ্গে দেখিয়াছেন। তাই মা ইন্দিরার বিষয় জানিতে চাহিলেন।

নেহেরুজী জানাইলেন যে সে এখন কাজে লাগিয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে নেহেরুজীর প্রায় দেখাই হয় না।

কিছুক্ষণ পরে আবার মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিতাজীর বুঝি আজকাল আর আসিবার অবসর হয় না।"

পণ্ডিতজী উত্তর দিলেন,—"হাঁ, হাঁ মা, ম্যয় দিল্লীমে মিলনে কা প্রবন্ধ করুঙ্গা। ইসমে কৌন সী বড়ী বাত হ্যয়।"

তখন মা বলিয়া দিলেন যে পিতাজী দিল্লীতেও তোমাদের আশ্রম আছে।

নেহেরুজী শুনিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, কহাঁ হ্যয় ?"

মা—কালকাজীমে।

নেহেরুজী—কিতনা দূর হ্যায় ?

মা বলিলেন যে, সহর হইতে কালকাজী ১০ মাইল দূর, আবার হয়ত সহরের কোন স্থান হইতে ১৫ মাইল দূর। তবে পিতাজীর বাড়ী থেকে ঠিক কতটা দূর শুনি নাই।

পরে নেহেরুজী যাইবার সময় মা তাঁহাকে ফুল, মালা, ফল ইত্যাদি দিলেন এবং তিনিও তাহা মা'র আশীর্বাদ স্বরূপ সাদরে গ্রহণ করিলেন।

ঐ স্থানে জহরলালজীও বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার মধ্যেই এক জায়গায় বলিলেন, 'গীতায় আছে না, 'বিরাট'। এই 'বিরাট' বলিয়া মা'র দিকে তাকাইতে লাগিলেন। খানিক পরে মা বলিলেন,—'বিশ্বরূপ।' সঙ্গে সঙ্গে নেহেরুজী বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, হাঁ, বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপ। ইত্যাদি।"

ওখান হইতে মা কনখল বেদান্ত সম্মেলনে গেলেন। তাহার পর মোদীর বাড়ী হইয়া রামনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

রামনগর হইতে এখানে আসিবার সময় মাকে কালীকম্বলীওয়ালার সৎসঙ্গ ভবনে নিয়া যায়। হরিবাবা, শরণানন্দজী প্রভৃতি সাধুরাও মা'র সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেখানেও খুব ভালো ব্যবস্থা ছিল। সেখানে মা'র উদ্দেশ্যে একটি গান রচনা করিয়া ২।৩ জনে মিলিয়া গাহিয়াছিল। গানটি এই—

স্বাগত গান

আজ কোই শুভ কারণ হ্যয়।
বায়ু মে সুগন্ধি আতি হ্যয়।
গঙ্গাজীকি হর লহর আজ
ইঠলা কর চলতি যাতী হ্যয়॥
সাধু মহাত্মা ঋষি মুনি
সুন্দর প্রবচন শুনাতে হ্যয়।
ইস্ তপোভূমি কে ভক্ত আজ
মিলকর কুছ কহনা চাহতে হ্যয়
কানো মে সুন্তে থে মহিমা
আঁখে দর্শন কো আকুলাই।
হুয়ে আজ হামারে ধন্য ভাগ্য
আনন্দময়ী মা ইহা আয়ী॥
ধ্যানাবস্থিত বুদ্ধ কে সমান
মস্তক পর তেজ দিখাতা হ্যয়।
মহিমা ক্যা কবি বাখান করে
কুছ বরনন্ মে নহি আতা হ্যয়॥
ইহা রাম-ভরত নে তপ কিয়া
মধুকৈটভ ইহা পর মারা হ্যয়।

ইহ তপোভূমি ঋষিয়ো কী হ্যায়
মা ই'য়ে স্থান তুমারা হ্যায়।
ভারতকে কোণে কোণে মে
তেরে নাম কা আদর করতে হ্যায়॥
সৎসঙ্গ ভবন মে আজ সভী
হৃদয় সে স্বাগত করতে হ্যায়॥
গঙ্গাজী পাপকো হরতী হ্যায়
চন্দ্রমা তাপ কো হরতা হ্যায়।
আনন্দময়ী মা কা দর্শন
সব পাপ তাপ কো হরতা হ্যায়॥
ইহ সারা বিশ্ব আপকা হ্যায়
হৃষিকেশ কো ভুল ন যানা তুম্।
সৎসঙ্গ ভবন মে কৃপা কর
পগধার সুধা বর্ষাণা তুম্॥
জয় কালী-কম্‌লী-ওয়ালে কী
সঙ্গহী গঙ্গে মাতাকী জয়।
'মুক্তেশ' বোলে ফির একবার
আনন্দময়ী মাতাকী জয়।

শুনিলাম যোগানন্দজী আশ্রমের ৮২টি কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট সিষ্টার দয়া মাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। মাকে দর্শন করিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি কত যে খুশী হইয়াছেন তাহা বহুভাবে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীমায়ের নিকট সিষ্টার দয়া।

একদিন রাত্রিতে ঐখানেই তিনি ইংরাজীতে প্রায় আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দেন। একদিন তাঁহাকে কথায় কথায় মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"আমি তোমার মন চুরি করে নিয়েছি। আর ফিরিয়ে দেব না।" একথা শুনিয়া তিনি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন।

বৈকাল বেলা মা আমার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। আশ্রমের অনেকে উপস্থিত। মা আমাকে ঐ সময় যাহা যাহা বলিলেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই :—

আমার অসুস্থতার আরো কথা। মায়ের অপার করুণা।

আমার মেনিনজাইটিসের টেলিগ্রাম যখন আসিল তখন একজন আসিয়া বুনিকে বলিল যে কোন এক সাধু নাকি বলিয়াছে যে দিদি আর ছয় মাসের বেশী বাঁচিবে না। বুনি এই কথা আর মা'র নিকট বলিতে পারিল না। সে স্বামিজীকে বলিল,—'আপনি এই কথা মাকে বলিবেন। আমি বলিতে পারিব না। মাকে বলিলে মা ত ওলট পালটও করিতে পারেন'।

স্বামিজী গিয়া মাকে বলিলেন, দ্বিপ্রহরে শুইবার সময় মা বুনিকে বলিলেন,—"কি বলিল? ছয় মাস বলিয়াছে নাকি?"

বুনি বলিল, —'হ্যাঁ'।

মা বলিলেন,—"দিদির জন্য যে জপ বসান হইয়াছে, তাহা ১৫ই শেষ রাত্রিতে শেষ হইবে। ১৬ই এখান হইতে রওনা হইতে হইবে। ১৫ই রাত্রিতে তুমি মৌন হইয়া যাও। সংকল্প কর ৯ মাসের জন্য। মনের মধ্যে যেন তীব্র প্রার্থনা থাকে, দিদি ভাল হইয়া উঠুক।"

তাহারপর মা বলিলেন,—"বুনিকে পাঠাইয়া দিলাম কলিকাতায়। তাহার বাবার তো অসুখ। আমি একদিন দেখিতেছি (সূক্ষ্মে) বুনি এমন 'হু' 'হু' করিতেছে যেন কথা বলিতেছে। তখনি সঙ্গে সঙ্গে ছবিকে মৌন করান হইল। ছবিকে মৌন করাইয়া দেরাদুন পাঠান হইল। কিন্তু ছবি এ শরীরটাকে না বলিয়াই কলিকাতায় গিয়া ভাবিল, বুনি যখন মৌন আছে তখন আর আমার মৌন থাকিয়া কি হইবে। সে যেন মৌন না ভাঙ্গে, এই মর্মে তাহাকে আবার তার করা হইল।"

এদিকে বুনির বাবার ত খুবই সাঙ্ঘাতিক অসুখ। তাহাদের ডাক্তারবাবুর পুনঃ পুনঃ মৌন ভঙ্গের জন্য টেলিগ্রাম ও ট্রাঙ্ককল পাইয়া বুনি ডাক্তারবাবুকে লিখিয়াছিল যে "কি করিব মাতৃ আদেশ।"

ডাক্তারবাবু আবার মাকে প্রার্থনা জানাইল—'মা তুমি ওকে মৌন ভাঙ্গার আদেশ দাও।' ডাক্তারবাবু তো মৌনের কারণ জানেন না।

তখন মা পুষ্পকে বলিল, "দেখছিস্, সময়ও খারাপ, সবদিক হইতে কিরূপ বিঘ্ন আসিতেছে। ইহার পর আমি আমার যা খুশী করিলে, তোমরা কিন্তু কিছু বলিতে পারিবে না"। মা বারবারই এই কথা বলিতেছেন। পুষ্পের মনে হইল মা বুঝি মৌন হইয়া যাইবেন। তাই সে বলিল,—'মা, আমি মৌন হইয়া যাই'। মা কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিলেন,—"তুমি মৌন হইয়া যাও"। পুষ্পও সেই হইতে মৌন রহিল।

ছবিকে টেলিগ্রাম করা হইল সে যেন মৌন ভঙ্গ না করে। তাহার বাবাকে সব কারণ বিস্তারিত জানান হইল এবং লিখা হইল তাহার বাবা যেন ছবিকে সঙ্গে নিয়া মা'র কাছে আসে। দিল্লীতে মায়ের সামনে আসিয়া মৌন ভঙ্গ করিবে। যথাসময়ে ছবিকে নিয়া তার বাবা দিল্লীতে আসিলেন এবং মায়ের সামনে ছবি মৌন ভাঙ্গিল। এই সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী ভরতকে মৌন করান হইল।

সব শুনিয়া আমি বলিলাম,—'ও, এত কাণ্ড। এই জন্যই এত মৌন। আমি তো কিছুই জানি না।'

মা আমার সুরের অনুকরণ করিয়া বলিলেন,—"ও, হ্যাঁ, এই জন্যই........ তোমাকে কে বলবে?"

তারপর মা কৃপালকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমরা বড় মেয়েরা এক এক জন এক এক দিন মৌন নাও। কাষ্ঠ মৌনের অভ্যাস কর। ইহা যখন ঠিক হইয়া যাইবে তখন পুষ্প ও ভরত মৌন খুলিবে। বুনিকে ১লা বৈশাখ ৯ মাস পূর্ণ হইলে মৌন খুলিয়া দেওয়া হইল।

আমি সবই শুনিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, করুণাময়ী মা এইরূপ কত করুণাই নীরবে করিয়া যাইতেছেন কে তাহার খবর রাখে। বড় বড় মেয়েদের মধ্যে মৌন কৃপাল, সতী, বিল্লো, বিশুদ্ধা, চিত্রা ও শান্তা নিল। বাহিরের মেয়েদের মধ্যে পরশুরামের মেয়ে মোহিনীও নিল। সর্বশুদ্ধ এই ৭ জন করিতে আরম্ভ করিল। আর আমার জন্য চণ্ডীপাঠ, তাহাত কয় বৎসর যাবৎই হরিবাবার কথায় করা হইতেছিল। এখন তাহা যোগেশ ব্রহ্মচারী করিতেছেন।

২৪শে এপ্রিল ১৯৫৯।

আজ-ও মা নীচে নামিয়া চারিদিক ঘুরিয়া আমার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। ইতিমধ্যে শুনিলাম আবার এক ঘটনা ঘটিয়াছে। শুনিলাম আশ্রমের একজন সেবিকা বহিরাগত কোন ভদ্রমহিলার সহিত একটু রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতে ভক্ত মহিলাটি বেশ দুঃখিত হইয়াছেন।

মা'র কানে এই কথা যাইতেই মা সেবিকাটিকে কি বলিয়া আসিয়া আমাকে বলিতেছেন,—"দিদি, আজকে একটু বকিয়া আসিলাম। দেখ

তুচ্ছ একটি ঘটনা —উচ্চ আদর্শ।

তোমরা যে মনে কর, তোমরা আশ্রমে আছ, আর উহারা বাহির হইতে অল্প দিনের জন্য আসিয়াছে, এ শরীরের কাছে কিন্তু সে সব কথা নাই। কাহাকেও না হইলে এ শরীরের চলিবে না। সকলের সঙ্গে যদি শান্ত ভাবে তোমরা ব্যবহার করিতে না পার তবে আরও তো আশ্রম আছে, সে সব আশ্রমে, যাহার যেখানে ভাল লাগে থাকিতে পার। তোমাদের সকলেরই ত আশ্রম, এ শরীর কি করিয়া যাইতে বলিবে। তবে এই শরীরটা

যেখানে থাকে সেখানে না-ই বা থাকিলে। প্রীতিতে সকলের সঙ্গে ব্যবহার না করিলে এই শরীরটার কাছে কি করিয়া থাকা হইবে। এই শরীরটার কাছে-ত নানা স্থান হইতে লোক আসিবেই।" মা এই কথা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন। বাহির হইতে ভক্ত মহিলাটির এই কথা শুনিয়া দুঃখ দূরীভূত হইল নিঃসন্দেহ।

২৫শে এপ্রিল ১৯৫৯।

আজ বৈকালে মা শিব ও মাতৃ-মন্দিরের আঙ্গিনায় হাঁটিতেছেন। অনেকেই উপস্থিত। ক্রমে ক্রমে মন্দিরে আরতী হইল। মা'র আদেশে শিব মন্দিরের সম্মুখে শ্রী মহিম্ন-স্তোত্র পাঠও হইল। এখন হীরু ব্রহ্মচারীকেই শিব পূজার ভার দেওয়া হইয়াছে।

আরতী ও স্তোত্রাদি হইয়া গেলে মা হ'লে আসিয়া বসিলেন। কীর্তনাদি সেখানেই হইল। মৌনের পর মা আসিয়া আমার ঘরে বসিলেন। কথায় কথায় ব্রহ্মচারী সাধুদের মা প্রায়ই বলেন,—"এই পথে আসিয়াছ, বৃথা ঘুরিয়া ফিরিয়া সময় নষ্ট করিও না। যতটুকু পার তাঁহার জন্য সময় দেও। পূজা, পাঠ, জপ, কীর্তন, সৎসঙ্গ—যেভাবে পার ঐ দিকেই লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা কর।" আজ-ও সেই কথাই বলিলেন।

আজ বৈকালে পণ্ডিত নেহেরুজীর ওখান হইতে সংবাদ আসিল যে পণ্ডিতজী মাতাজীর নিকট খবর পাঠাইয়াছেন যে তিনি মুসৌরী গিয়াছেন, সময় করিতে পারিলে ৬॥০ হইতে ৭টার মধ্যে মাতৃদর্শনে আশ্রমে আসিবেন। স্বামিজী আসিয়া মাকে এই সংবাদ দিলেন। মা শুনিয়াই প্রথমে বলিলেন, 'আসবে কি?'

কিন্তু সকলেই বলিল,—'সংবাদ যখন দিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই আসিবেন মনে হয়।'

তখন মা সকলকে যাহা যাহা করা দরকার করিতে বলিলেন। সকলে মিলিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

এদিকে ৭টা বাজিয়া গেল। ইহারও কিছু পরে সংবাদ আসিল যে দালাই লামা মুসৌরীতে আছেন, তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তায় দেরী হইয়া যাইতেছে। আমরা কিছুদিন পূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে চীনাদের গোলমালের জন্য দালাই লামা ভারত সরকারের নিকট আশ্রয় নিয়াছেন, সেই সব সম্বন্ধেই পণ্ডিতজীর সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছিল।

মাতৃসকাশে পণ্ডিতজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী উপাধ্যায়জী।

এদিকে পৌনে নয়টায় আশ্রমে মৌন হয়। তাই মা লছমীজীকে বলিলেন যে যদি মৌনের সময় আসে, তোমরা পিতাজীকে নিয়া আসিয়া মৌনে বসাইয়া দিও। ইহা শুনিয়া লছমজী তাহার ছেলেকে রাস্তায় দাঁড় করাইয়া রাখিল।

মা উপরে পায়চারী করিতেছেন। মা'র ভাব দেখিয়া বুনি প্রভৃতি কাহারও কাহারও নাকি সন্দেহ হইতেছিল যে নেহেরুজী আসিবেন না। আবার কাহারও কাহারও মাকে সব ব্যবস্থা সুন্দরভাবে করিতে দেখিয়া মনে হইতেছে যে পণ্ডিতজী অবশ্যই আসিবেন। পরে দেখা গেল রাত্রি ৯টার সময় পণ্ডিতজীর গাড়ী আশ্রমের সম্মুখস্থ পথ দিয়া চলিয়া গেল। গাড়ী আশ্রমের সামনে আসিলে, তিনি গাড়ী একটু থামাইয়া মা'র উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া চলিয়া গেলেন। দেরী হইয়া যাওয়াতে আশ্রমে আর প্রবেশ করিলেন না। রাজপুর কলেজের প্রিন্সিপাল (ইহারই বাড়ীতে পণ্ডিতজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী উপাধ্যায়জী ছিলেন) আসিয়া সংবাদ দিলেন যে দেরী হইয়া যাওয়াতে পণ্ডিতজী আসিতে পারিলেন না। তিনি আরও বলিলেন যে উপাধ্যায়জী মাকে দর্শনের জন্য রাত্রি ১১টার সময় আসিবেন।

রাত্রি প্রায় ১১টায় উপাধ্যায়জী, উল্লিখিত প্রিন্সিপাল ও তাঁহার স্ত্রী আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া বলিলেন,—'নেহেরুজীর খুব আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মিটিং ও অন্যান্য কাজ থাকায় তিনি আর আসিতে পারিলেন না। তিনি রাস্তায় গাড়ী থামাইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।'

উপাধ্যায়জী বলিলেন, "আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে আশ্রমে ৯টা হইতে ৯-১৫ পর্যন্ত মৌন হয়। আর তিনি ঠিক ৯টাতেই এখান দিয়া গেলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—'মৌনের সময় গিয়া কি আর করিব। তাহা ছাড়া সময়ও নাই। ২ মিনিটের জন্য যাইয়া কি হইবে।'

মা বলিলেন,—'মৌন ৮-৪৫ হইতে ৯টা পর্যন্ত হয়।'

উপাধ্যায়জী বলিলেন,—'তবে ত আমি ভুল বলিয়াছি।'

মা বলিলেন,—"তা ছাড়া যদি মৌনের সময়ও পিতাজী আসিত, তাহার জন্য লছমীর ছেলে তন্‌খাকে রাখা হইয়াছিল। সে পিতাজীকে নিয়া আসিয়া মৌনে বসাইয়া দিত। যাক্‌, সময় নাই।"

উপাধ্যায়জী গতকল্যও মা'র দর্শনে আসিয়াছিলেন। সেই কথারই প্রসঙ্গ টানিয়া উপাধ্যায়জী বলিলেন,—'আমি নেহেরুজীকে বলিয়াছি যে মা আপনাকে যাইতে বলেন নাই। তিনিই বলিয়াছিলেন যে সময় পাইলে তিনি নিজেই আসিবেন। কিন্তু মুসৌরীতেই অনেক দেরী হইয়া যাওয়ায় তিনি আর আসিতে পারেন নাই'। মা বলিলেন,—"দেখ পিতাজীকে বলিও, এই শরীরটা এই জন্য তাঁহাকে আসিতে বলে নাই যে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। এর মধ্যে যদি সময় করিতে পারে তবে নিজেই আসিবে।"

এইরূপ কথাবার্তার পরে মা একটু ক্ষীর কমলার রস দিয়া মাখা তাঁহাদের দিলেন। তাঁহারা ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

২৬শে এপ্রিল ১৯৫৯।

আজ সকালে আবার উপাধ্যায়জী ও প্রিন্সিপাল মহাশয় সস্ত্রীক মা'র দর্শনে আসিলেন। উপাধ্যায়জী বলিলেন যে আজ নেহেরুজীর সঙ্গে তিনি চলিয়া যাইতেছেন। কাজেই মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। এখন তাঁহারা নেহেরুজীর বাড়ীতেই যাইতেছেন।

নেহেরুজীর বাড়ী হইতে ফিরিয়া প্রিন্সিপাল মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী আবার মা'র কাছে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন যে নেহেরুজী দুইটি ফুলের তোড়া মা'র জন্য দিয়াছেন, তাহা দিতেই তাঁহারা আসিয়াছেন। এই বলিয়া মাকে তাহা দিলেন। প্রিন্সিপালের স্ত্রী শকুন্তলা খুব আনন্দের সহিত বলিলেন,—"পণ্ডিতজী যাইবার সময় আমাকে কাছে গিয়া বসিতে বলিলেন। আমি বসিলে তিনি আর কাহারও সহিত কথা বলিলেন না। শুধু আমার সঙ্গেই কেবল মাতাজীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে কত কথা। 'মাতাজী কি কি বলিলেন'? 'কি কি করিলেন'? ইত্যাদি।"

যথাসময়ে তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

এই ব্যাপার নিয়া আশ্রমের একটি মেয়ের মনে এই প্রশ্ন উঠিল যে কাল রাত্রিতে মা সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন যে নেহেরুজী আসিতেছেন, অথচ তিনি ত আসিলেন না। তবে মা এই সব করাইলেন কেন?

আমি বলিলাম,—'তা বুঝি জান না? তুমি ত বেশীদিন যাবৎ মা'র কাছে আস নাই,—তাই ইহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। আমি বরাবর দেখিয়া আসিতেছি মা'র এই নিয়ম,—সব জানা সত্ত্বেও যাহা করা দরকার পূর্ণ মাত্রায় করিতেছেন।" এই বলিয়া আমি তাহাকে আরো ২।১টি ঘটনা বলিলাম।

পরে মা'র কাছে এই কথা উঠিলে মা বলিলেন,—'দেখ, এ শরীরটা প্রথমে শুনিয়াই বলিয়াছিল, আসবে কি?'

সকলেই বলিল, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসিবে'। পরমানন্দ চিন্ময় প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

সব জানিয়াও মা না জানার মত ব্যবহার করেন কেন?

"দেখ, এই সব ব্যবস্থা করা না হইলে কি করিয়া উহাদের নিকট বলা হইত যে খবর পাইয়া সব ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। লৌকিকভাবে আসিবার সংবাদ পাইলে, এইরূপ করাই নীতি। লৌকিক ব্যবহারে অলৌকিক দেখিতে চাহিও না। তবে-ত ভবিষ্যৎ দেখিয়াই কাজ করা হইল। এ শরীরের তাহা হয় না। কখনো কখনো প্রকাশ হইয়া যায় সে কথা ভিন্ন।"

আমিও বলিলাম,—'আমিও কতবার ইহা দেখিয়াছি। হয়ত কাহারও কাছে একটু প্রকাশ করিয়াছেন যে এই ব্যাপারটা হইবে না, কিন্তু ব্যবহারের দিক দিয়া এতটুকুও ত্রুটি নাই। ব্যবহার দেখিয়া মনে হইবে যেন নিশ্চিত জানেন ইহা হইবেই।

এই প্রসঙ্গে পুরাণ গ্রন্থ হইতেও অনেকে উপমা দিতে লাগিলেন যে মহান পুরুষেরা জানিয়া শুনিয়াও এইরূপ ব্যবহারই করেন।

৩রা মে ১৯৫৯।

আজ ৩রা মে। আজ হইতে মা'র জন্ম উৎসবের পূজাদি আরম্ভ হইবে। এবার জন্মোৎসব হইবে ৩রা মে হইতে ২৫শে মে পর্যন্ত।

দেরাদুন-কিশনপুরে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব আরম্ভ।

আজ উৎসবের প্রথম দিন। যথারীতি আজ শেষ রাত্রে (রাত্রি ৩টায়) মা'র পূজা কুসুম মা'র ছবির সামনে করিল। মা আজ আর পূজার সময় নীচে নামিলেন না। উপরেই শুইয়া রহিলেন।

পরে ৩॥০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত ধ্যান হইল। ইহার পরে উপরের ঘরে গিয়া সকলে মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিল এবং কুসুম মা'র আরতী করিল।

মিঃ বি. কে. শাহ, ডাঃ বলরাম, মিঃ হুনের স্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারের অনুমতি লইয়া আমাকেও উপরে মা'র ঘরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

ওদিকে মাতৃমন্দিরে শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হইয়াছে। পাঠ করিতেছে কুসুম, ভরত ও কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী।

৪ঠা মে ১৯৫৯।

আজ সকালে পূজ্য হরিবাবাজী আসিয়া পৌঁছিলেন। কীর্তনাদি সহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রমের ভিতরে নিয়া আসা হইল। তিনি কিছুক্ষণ আশ্রমে থাকিয়া শিবমন্দির ও মাতৃমন্দির দর্শন করিয়া কল্যাণবনে চলিয়া গেলেন। সেখানেই হরিবাবার থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

মা'র জন্মোৎসবের কার্য্যক্রম নিয়মিতভাবে চলিতেছে।

প্রত্যহ নিত্য চণ্ডীপাঠ সুরু না হওয়া পর্যন্ত উষা কীর্তন চলিতে থাকে। পরে মাতৃমন্দিরে নিত্য পূজা-আরতী হয়।

ইহার পরেই আশ্রমের চারজন ব্রহ্মচারী মিলিয়া সমবেতভাবে চণ্ডীপাঠ করে। চণ্ডীপাঠের পর মা'র মঙ্গলারতি হয়। এই আরতীর সময় মা আর নীচে নামেন না, কুসুম উপরে মা'র ঘরে গিয়াই আরতী করিয়া আসে। আরতী হইয়া গেলে একে একে সকলে উপরে গিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসে। আরতীর সময় এক একদিন এক এক দেবতার আরতী-গান ও স্তব হয়। মা সর্বদেবময়ী। কাজেই কোন দিন মা'র, কোন দিন রামের, কোন দিন শিবের, আবার কোন দিন বা কৃষ্ণের আরতী-গান ও স্তব পাঠ করা হয়।

অন্যদিকে ৮ই মে হইতে শের সিংহের মেয়ে তাহার মা'র জন্য ভাগবৎ সপ্তাহ করাইতেছেন। পাঠ করিতেছেন বৃন্দাবনবাসী শ্রীনাথ শাস্ত্রীজী। সকাল ৭টার সময় সংস্কৃত মূল পাঠ আরম্ভ হয়। এই পাঠ ১১টা পর্যন্ত চলে।

আর একদিকে সকালে আশ্রমের নিত্য গীতা, চণ্ডী ও উপনিষৎ পাঠের পর পূজ্য হরিবাবাজী ভক্ত প্রহ্লাদ চরিত্র ও নারদ ভক্তি সুত্র ব্যাখ্যা করেন। এইসব হইয়া গেলে শ্রীহরিবাবাজী ১১টায় চলিয়া যান। ১১টা হইতে পুনঃ বৈকালে সৎসঙ্গ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত, অখণ্ডভাবে নাম, ভজন ইত্যাদি চলে।

বৈকাল ৩৮০ হইতে ১৫ মিনিট কীর্তন ও ভাগবতের আরতির পর ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত শ্রীনাথ শাস্ত্রীজী ভাগবতের হিন্দি ব্যাখ্যা করেন।

৭টার সময় আশ্রমস্থ মাতৃমন্দির ও শিব মন্দিরে নিত্য সন্ধ্যারতি হয়। তারপর পূজ্য হরিবাবাজী মহারাজ ৮৮০ পর্যন্ত কীর্ত্তন ও ভক্তচরিত-কথা বলেন। পৌনে ৯টা হইতে ৯টা পর্যন্ত মৌন এবং মৌনের পর হইতে ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত মাতৃ সৎসঙ্গ হয়।

এইরূপে জন্মোৎসবের সব প্রোগ্রাম চলিতেছে। সৎসঙ্গের নিয়মাদি বলা, যথাসময়ে সব প্রস্তুত করা, সাধু মহাত্মাদিগকে স্ব স্ব আসনে বসান ইত্যাদি কার্য ব্রহ্মচারী কান্তিভাই করে।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মা'র উপস্থিতিতে আশ্রমের সব ব্রহ্মচারিণী এবং অন্যান্য ভক্তগণ মাটির কলস, পাখা ও ফল ইত্যাদি ব্রাহ্মণকে দান করিল। কেহ কেহ আবার মাকেই কলস দান করিল। কমলাকান্ত ও কুসুম ব্রহ্মচারী সকলকে মন্ত্র পাঠ করাইতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে মা-ও তাহাদের সঙ্গে মন্ত্র আবৃত্তি করাইতেছিলেন। সে এক উপভোগ্য দৃশ্য।

এইসব হইয়া গেলে ঐদিন মা আমার ঘরে আসিয়া বসিলেন। সিরমুরের রাণী ও রাজমাতা ষোড়শোপচারে মা'র পূজা করিলেন।

একদিন মিসেস্ সভরওয়াল আসিয়া বলিলেন, তাঁহার নাতির কিডনীতে কোন কঠিন ব্যারাম হইয়াছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া দিল্লীতে নিয়া

শিশুটীকে বড় বড় ডাক্তার দেখান। সব ডাক্তারই দেখিয়া বলেন, ইহার কিডনি জন্মাবধি এইরূপ বড় এবং অপারেশন ভিন্ন ইহার কোন চিকিৎসা নাই। মিসেস সভরওয়াল দুঃখিত চিত্তে শিশুটিকে তখন ডাঃ সেনের নার্সিং হোমে লইয়া যান। ডাঃ সেন ছাড়াও সেই নার্সিং হোমে আরও দুইজন খুব বড় ডাক্তার আছেন। তাঁহারা তিনজনেই শিশুটিকে পরীক্ষা করিয়া ঐ কথাই বলিল এবং নিশ্চিতরূপেই জানাইয়া দিল যে ইহার অপারেশন ছাড়া কোন উপায় নাই।

অনন্যোপায় হইয়া মিসেস্ সভরওয়াল দুঃখিত মনে নার্সিং হোম হইতে ফিরিয়া আসেন। ২ মাসের শিশু তাহার উপর এইরূপ বড় অপারেশন করিতে হইবে, সকলেই খুব চিন্তিত হইয়া পড়েন।

মিসেস্ সভরওয়াল আর উপায়ান্তর না দেখিয়া সেইদিন রাত্রেই হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া শিশুটিকে একটু মা'র চরণামৃত পান করাইয়া দিলেন। ইহার পরের দিন ডাক্তার পুনঃ শিশুটিকে নিয়া হাসপাতালে যাইতে বলায়, মিসেস্ সভরওয়াল পরদিন সন্ধ্যায় শিশুটিকে আবার নার্সিং হোমে নিয়া যান। ঐদিনও ডাক্তারগণ শিশুটিকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া একেবারে অবাক হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দেখিলেন শিশুটির শরীরে সে রোগের কোন চিহ্ন মাত্র নাই। তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন,—'এ কি? এ ত অলৌকিক ব্যাপার। ইহার যে কিডনীর কোন রোগ কোন দিন ছিল, তাহাও বলা যায় না।'

একটি অলৌকিক ঘটনা।

উচ্ছ্বসিত হইয়া ডাঃ সেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি ইহাকে কি করিয়াছেন?'

মিসেস্ সভরওয়ালও কম আশ্চর্য হ'ন নাই। তিনি বিহ্বল চিত্তে বলিলেন,—'আমি গত রাত্রে শুধু মা'র একটু চরণামৃত খাওয়াইয়াছিলাম।'

ডাঃ সেন বলিলেন,—'অতি আশ্চর্য ব্যাপার।' বলিয়াই বলিলেন,—

'আপনারা আর ঔষধ পত্রাদি ব্যবহার করেন কেন? কেবল মাতৃচরণামৃতই দিন।'

১৫ই মে ১৯৫৯।

আজ বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথি উৎসব। এই উপলক্ষে দেরাদুনের সব আশ্রমের সাধুদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। শিবমন্দিরে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী ভোলানাথের পূজা করিলেন সব সাধুদের কাপড়, মালা, চন্দন দিয়া বিবিধ ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন দ্বারা তৃপ্তি সহকারে ভোজন করান হইল। রাত্রে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী ভোলানাথের বিষয় কিছু বলিলেন।

বাবা ভোলানাথের তিরোধান উৎসব।

১৬ই মে ১৯৫৯।

আজ রাসপার্টি আসিয়াছে। আগামীকাল হইতে রাসলীলা সুরু হইবে মা আসিয়া আমার ঘরে বসিয়া আছেন। আজ এখন এখানেই মা'র আরতি হইল। আরতির সময় মা যেখানে থাকেন সেখানেই আরতি করা হয়।

আজ যখন মা'র আরতি হইতেছিল তখন কন্যাপীঠের তিনটি কুমারী মেয়ে মা'র খাটের সম্মুখ দিয়া অন্যদিকে যাইতেছিল। মা তাহাদের যাইতে না দিয়া ধরিয়া রাখিয়া সামনেই বসাইয়া দিলেন। তারপর কুসুম মাকে যে ফুলের মালা পরাইয়াছিল, তাহা লইয়া ছেলে মানুষের মত কখনো গলায় পরিতেছেন, কখনো বা ঝুঁটি বাঁধিয়া তাহাতে দিতেছেন। আবার

সকলের সঙ্গে আরতির গানও গাহিতেছেন,—"অতি অদ্ভুত মধুরময়ী আনন্দময়ী মাঙ্গ মাঙ্গ।" আবার কখনো এমনভাবে শিশুদের মত হাসিয়া পড়িতেছেন যেন, কি একটা কাজই করিয়া ফেলিয়াছেন।

মা'র মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, মা'র মুখের ভাব বর্ণনাতীত।

পরে মা সেই মালাটিই কুসুমকে পরাইয়া দিলেন। কুসুম আবার মাকে আর একটি মালা পরাইতে গেলে, মা শিশুর মত মাথাটি সামনে নীচু করিয়া বলিলেন,—'ঝুঁটিতে পরাও'। কুসুম মালাটি ঝুঁটিতে পরাইয়া দিল। এইরূপে কত আনন্দের খেলাই না মা খেলিলেন।

আরতি হইয়া গেলে যেমন নিত্য হয়, সেইরূপ 'ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা' এই স্তোত্রটি পাঠ হইল।

পাঠ শেষ হইলে মা বলিলেন,—"কুমারী মেয়েরা ক্রম করিয়া যাইতেছিল। আমি খেয়াল করিলাম, কুমারী রূপেও ত তিনিই। একবার যোগেশ ব্রহ্মচারীর কাছে যাওয়া হইয়াছিল, তাহার কাছে যে দেবী মূর্ত্তি আছে, তাহার নাম, "আনন্দময়ী মা।" দেবী ত আনন্দময়ী-ই, সেই ভাবটা-ও আসিয়াছিল।"

আরও একদিন শিব মন্দিরে আরতির সময়, মা এক এক করিয়া কুমারী মেয়েদের নিজের কাছে নিতেছিলেন। মা'র তখনও খেয়াল হইতেছিল,—'সর্বরূপে ত তিনিই।'

আরতি চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করা হয়। ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল ঢাকাতে। ঢাকাতে একবার মা বলিয়াছিলেন চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আরতি করিতে। সেই হইতেই ঐভাবে চলিতেছে।

ইতিমধ্যে মা একদিন শিবের, চণ্ডীর ও ভাগবতের ৫৬ পদের ভোগ দেওয়াইলেন। ভাগবৎ শান্তি চৌধুরী পাঠ করাইতেছেন।

এই উৎসবের নিয়মানুযায়ী গরীব রোগীদের কমলা, মুসম্বী ও লজেন্স

একটি থলি ভরিয়া, তাহার ওপর "মোনে ভেজা" এই লিখিয়া সকলকে বিলি করা হইল।

আমাদের রায়পুরস্থ আশ্রমেও একদিন ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় বাচ্চাদের গেঞ্জি ও খেলনা বিতরণ করিলেন।

২১শে তারিখে ১০৮ কুমারী ভোজন বেশ ভাল মত হইয়া গেল।

২২শে মে ১৯৫৯।

আজ শিবমন্দিরে রুদ্রাভিষেক হইল। উৎসব উপলক্ষে কৃষ্ণানন্দজী, অবধূতজী, চক্রপাণীজী, যোগেশ ব্রহ্মচারিজী, বিষ্ণু আশ্রমজী প্রভৃতি অনেক মহাত্মাগণ আসিয়াছেন। হরিবাবাজী ত প্রথম হইতেই আছেন। অখণ্ডানন্দজী ও শুকদেবানন্দজীর কাল উৎসবে আসিবার কথা।

২৫শে মে ১৯৫৯।

আজ শেষ রাত্রে মা'র তিথি পূজা। শিব মন্দিরের আঙ্গিনায় পূজা হইবে। আঙ্গিনাটিকে আলপনা ও অন্যান্য সাজ-গোজ দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। এই সাজ-গোজের ফলে ২ মন্দির সমেত আঙ্গিনাটি এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের পরিসমাপ্তি।

রাত্রি তিনটায় পূজা আরম্ভ। তাহার পূর্বেই ভারে ভারে ফল মিষ্টি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আলোর মালায় পূজা-প্রাঙ্গণটি যেন হাসিতেছে।

যথা সময়ে বিদ্যাপীঠের ছেলেদের লইয়া বাটুদা বেদপাঠ আরম্ভ

করিলেন। বেদপাঠ হইয়া গেলে ৩।।০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত সমবেত ভাবে মৌন পালন ও ধ্যান হইল। ধ্যানান্তে গুরুস্তোত্র, কৃষ্ণস্তোত্র (ন খলু গোপিকা............) চণ্ডীস্তব (দেহি দেবী দরশন.. ....) পাঠ হইল। ইহার পর আরম্ভ হইল ভজন। ওদিকে পূজা চলিতেছে। 'শ্রীচণ্ডী চণ্ডী এলোরে', 'আনন্দে সবে মিলে গাও মায়ের নাম.........' ইত্যাদি গানের সুরে সে স্থান যেন এক দিব্য-লোকে রূপান্তরিত হইয়া গেল। পরে দুইটি কুমারী পূজা ও একটি বটুক পূজা হইল।

এই সব করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আশ্রমের নিত্য উষাকীর্তনের সুর 'জাগোরে জাগোরে মন ঘুমায়ে থেকো না রে', 'নিশা অবসানে' প্রভৃতি বাতাসে ভাসিয়া উঠিল।

ওদিকে পূজান্তে আরম্ভ হইল আরতি। আরম্ভ হইল আরতির গান,— 'আরতি করে চন্দ্র তপন.........', 'অম্বে গৌরী মাইয়া.........' 'আনন্দময়ী মায়ে.........' প্রভৃতি।

পূজার সেই অপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে বসিয়া সকলেই পূজার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কবিরাজ মহাশয়, অবধূতজীও পূজা প্রাঙ্গনে বসিয়াছিলেন।

এইভাবে ৩রা মে হইতে যে উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল, আজ এই ২৩ দিন পরে সে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

৫ই জুন ১৯৫৯।

মা'র শরীরটা খুব ভালো যাইতেছে না। তবু সৎসঙ্গ নিয়মিতই চলিতেছে।

পরশু পুষ্প মাকে একটু হাওয়া দিতে গিয়াছে। মা মানা করিলেন। কারণ কিছু বলিলেন না। পরে আবার ইসারায় ডাকিয়া বলিলেন,—“কে জানি এ শরীরটাকে হাওয়া করিতেছে।”

বিচিত্র ঘটনা।

মা পরে এ প্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন—“মধ্যে মধ্যে এমন করে। দরজা হয়ত বন্ধ, ঘরে কেহ নাই। কিন্তু শরীরে বেশ হাওয়া লাগিতেছে।”

মা'র ঘরে বসিয়া কি কথা প্রসঙ্গে সেবার কাজ সম্বন্ধে কথা উঠিল। মা বলিতে লাগিলেন,—“শুধু কাজ করে যাওয়া। সেবা বুদ্ধিতে কাজ না করলেই মুস্কিল......... ।” এই জাতীয় আরো অনেক কথা বলিলেন।

আজ রাত্রি ৯টার পরে মা'র ঘরে কথা-বার্তা চলিতেছে। হীরু প্রশ্ন করিল,—“আরতির সময় মন্দিরে একটি কাক প্রাণীও ছিল না। ইহার কারণ কী?”

প্রথমে ত এই লইয়া খুব হাসাহাসি হইল। মা-ও তাহাতে যোগ দিলেন। পরে মা বলিলেন,—“ছোট মেয়েটা, সকলে স্নেহ করে। যার কিছু নেই, কেউ নেই, তাকে সকলেই স্নেহ করে। সকলে তাই এই শরীরকে খেতে দেয়, পরতে দেয়, আদর করে।”

আমরাও মা'র মুখে এই কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম।

হীরু আবার বলিল,—“মা, সকলকে আকর্ষণ করেন।”

মা (হাসিয়া)—“কে আকর্ষণ করে, কার কাছে, কেন করে?”

কুঞ্জন নামক একটি ভক্ত বসিয়াছিল। সে বলিল,—“মা'র বশীকরণ মন্ত্র জানা আছে বোধহয়।”

মা—“বশীকরণ মন্ত্র শিখতেও দুইটি জিনিষ দরকার। ১। গুরু এবং ২। লেখাপড়া। কিন্তু এ শরীরের ত কিছুই নাই।”

এবার পান্নালালজী বলিলেন,—“একবার আপনি বলিয়াছিলেন যে আপনার কাছে আসিলে কাহারো খারাপ হইবে না।”

মা—"হ্যাঁ, সে কথা ঠিকই। খারাপ হবেই না। ভালো হবেই, হবেই, হবেই।"

বাটুদা ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ব্যস্, মা'র আশীর্বাদ আমরাও পেয়ে গেলাম।"

মা—"ঠিকই-ত বলেছি। ছোট্ট মেয়ের কাছে এলে খারাপ কি ভাবে হয়? এই শরীর ত পান্নালালজীর গুড়িয়া, তাই পিতাজীর খারাপ করবার অধিকার কোথায়?"

আমি—"এখন তুমি যে ভাবে যাই বল। এখন পান্নালাল ভাই বসিয়া আছেন, তাই তুমি তার গুড়িয়া। আবার অন্য কোন লাল থাকলে, তারই গুড়িয়া।"

আমার তখন মনে পড়িল বহুদিন পূর্বে কেটলী সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে মা বলিয়াছিলেন—"জলের যেমন কোনও রং নাই, যে রঙে রাঙ্গাও, তাই। এ শরীরেরও তো কোন সংকল্প-বিকল্প নাই। তাই তোমরা যেমন চাও তেমন-ই।"

৮ই জুন ১৯৫৯।

মায়ের শরীর এখনো খারাপই চলিতেছে। দাঁতেও অসহ্য ব্যথা হয়। হরিবাবা আজ সকলকে মায়ের জন্য জপের কথা বলিলেন।

আমাদের মায়ের শ্রীচরণে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কি উপায় আছে!

পণ্ডিতজীও নাম করিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে মৌনের সময় হইয়া যাওয়ায় বাতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

আজ দুপুরেই যন্ত্রণা খুব বাড়িয়াছিল। ডাক্তার বাবুকেও ডাকিয়া আনা

হইয়াছিল। হঠাৎ শরীরের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। মা ডাক্তার বাবুর কাছে বলিলেন,—"বেদনাটা মাথায় গিয়ে জমাট বাঁধল। তোমরা ত বলো খুবই খারাপ। সেই দিকটাই প্রবল। সেই সময় শরীরে কি রকমটা হতে লাগল। আমি খেয়াল করলে বন্ধ করতে পারতাম, কিন্তু খেয়াল হ'ল যা হবার হোক্। শরীরে নানা রকমটা হয়ে যেতে লাগল।"

মা'র অনেক সময় কঠিন রোগের মধ্যেও দেখিয়াছি ক্রিয়া আরম্ভ হ'লে রোগের কোন খেয়ালই থাকে না। আবার ভালও হয়ে যান।

আজিও মা বলিলেন,—"ভালও হতে পারে, আবার খারাপটাও, ব্যস্। হাসতে হাসতেও হয়ে যেতে পারে, কাঁদতে কাঁদতেও হয়ে যেতে পারে।"

৯ই জুন ১৯৫৯।

মাথার ব্যাথার রেশটা এখনো আছে। তবুও প্রায়ই আসিয়া হরিবাবার সৎসঙ্গে বসেন। মা নিজের ভাবেই নিজে আছেন।

অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি যে আমাদের মধ্যে একটু রেষা-রেষির ভাব দেখা গেলে মা এমন ভাবে শান্ত হইয়া থাকেন, যে দুই দলের মনেই আর কোন গোলমাল থাকে না।

১২ই জুন ১৯৫৯।

শ্রীশ্রীমায়ের খেয়ালে সবই সম্ভব।

মা'র শরীর সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন যে, খেয়াল হইলে সবই হইতে পারে। আজই খেয়াল হইয়াছিল যে ব্যথাটা অনেকদিন হইয়া গেল। তাহার পরেই ভালোর দিকে। পণ্ডিতজীও ইহা শুনিয়া একটুও আশ্চর্য না হইয়া বলিলেন,—"মা-ত ইচ্ছা করিলেই সব ঠিক করিতে পারেন।"

শ্রীশ্রী মায়ের নিকট কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন।

আজ স্বামী শিবানন্দজীর আশ্রম হইতে দক্ষিণ দেশীয় ৩।৪ জন লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মা'র সঙ্গে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথা কহিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন।

ইতিমধ্যে কলম্বিয়া হইতে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক দিল্লী হইতে মোটরে আসিয়াছেন। তিনি মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ একান্তে আধ্যাত্মিক নানা বিষয় লইয়া কথা বলিলেন। মা'র দর্শন পাইয়া এবং মা'র সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইয়া তিনি মহা খুশী। কথা বলিয়াই আবার দিল্লী ফিরিয়া গেলেন।

গতকাল মুসৌরী হইতে ফিরিবার পথে চিলির রাষ্ট্রদূত, তাঁহার ছেলে এবং ইটালির রাষ্ট্রদূতের ছেলে—এই তিন জনে মা'র দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহারা মা'র সঙ্গে কিছু সময় কথা বলিলেন। দালাই লামার দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কি কি কথা হইয়াছে তাহাও বলিলেন। তাঁহার জিজ্ঞাসিত ব্যাপারে দালাই লামার নিকট হইতে নাকি পরিষ্কার উত্তর পান নাই, কিন্তু মা'র মুখের কথা শুনিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইলেন।

১৯শে জুন ১৯৫৯।

গোস্বামী গণেশদত্তজীর দেহত্যাগ।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে গোস্বামি গণেশদত্তজী হরিদ্বারে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। সেই উপলক্ষে এখানেও কীর্তন, রামঅর্চ্চা ইত্যাদির আয়োজন হইয়াছে।

আলীগড় হইতে মা'র একজন ভক্ত তাঁহার এক পুত্রবধূকে লইয়া আসিয়াছে। তাহার গুরুদেব কাশীর নির্মলানন্দজী নাকি উহাকে মা'র

নিকট নিয়া আসিতে বলিয়াছেন। তাহারা নিজেরা বানপ্রস্থী। বধূটিকেও এই পথে লইয়া আসিয়াছে।

একটি ঘটনা।

শ্বশুর বধূটির অনেক ব্যাখ্যা করিতেছে। তিনি বলিলেন, গুরুদেব বলিয়াছেন ইহার অবস্থা ৫ম ভূমির। এই বলিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কিরূপ মনে করেন।

মা বলিলেন,—'উহার সঙ্গে এখনো কথা বার্তা হয় নাই।'

পরের দিন শ্বশুরের সামনেই মা'র সঙ্গে বধূটির কথা হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার যে ধ্যান জমে যায় তখন তুমি কি দেখ?"

বধূটি বলিল—"প্রথমে খুব আনন্দ বোধ হয়। পরে আর কিছুই থাকে না।"

এবার মা শ্বশুরকে বলিলেন,—"এত ছেলে মানুষ, তুমি বুঝে নাও। যতক্ষণ মন ততক্ষণ সমাধি হয় না। তবে শরীর ও মনের একটা স্তম্ভিত ভাব—বলতে পারা যায়। ওর মুখের কথা দিয়েই তোমাকে বুঝালাম।

"এই যে বলছে আনন্দের ভাব আগে থাকে, তার পরে আর কিছুই থাকে না। কিন্তু এই সবের বোদ্ধা কে? কাজেই প্রকৃত সমাধি না।

"আর একজন এই শরীরটার কাছে এসেছিল। সেও বলেছিল, 'কাজে কর্মে মন লাগে না, আনন্দ বোধ হয়। আমার সমাধিতে মন লাগে এবং আমার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হয়।'

প্রকৃত সমাধির স্বরূপ।

"তার কথা শুনে বলা হল যে, 'আমি', 'আমার' থাকতে সমাধি-ও হয় না, কুণ্ডলিনীও জাগ্রত হয় না। প্রকৃত সমাধি হ'লে এই সব থাকে না। কাজেই এই সব সমাধি বা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ না।' তখন তারাও বুঝল।"

মা আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেখ গাছে যখন আম পাকে,

তখন আম বলে না আমি পেকেছি আমাকে নেও। তার লক্ষণ দেখেই বোঝা যায়। আর একটা কি হয়, কেউ না নেয় তবে আপনা হতেই মাটিতে পড়ে যায়। দেখ কি সুন্দর। যেখান থেকে প্রকাশ, সেখানেই আসা। একই স্থান হতেই ত। ভিন্ন স্থান কোথায়?"

ভদ্রলোক মা'র কথা শুনিয়া খুব খুশী হইলেন। মা মেয়েদের দেখাইয়া বলিলেন,—'এরা সব আমার বন্ধুরা। বড় ঘরের, লেখাপড়া শেখা কিন্তু তবু সব ত্যাগ করে এই রাস্তায়, এই শরীরটার জন্যেই এখানে আসে। এই শরীরের ত সেবা আসে না, কিন্তু তবু আমার বন্ধুরা কৃপা করে এ শরীরটাকে স্নেহ করে। সব সময়ে ত মেয়েদের সঙ্গে রাখা সম্ভব হয় না। তাদের একটা আব্রু আছে। যারা সব অসুবিধা সহ্য করতে পারে তাদের হয়ত ২।১ টিকে সঙ্গে রাখা হয়।

পরম ধনে ধনীই প্রকৃত ধনী।

"দেখ, বড় ঘর বা বিদ্বান এই সব ত বড় না, পরম ধনে যাঁরা ধনী তারাই ধনী। এই বিদ্যা ত বিদ্যাই না। পরমার্থ বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। সেই ধন যার নাই, সে ত গরীব।"

সব দেখিয়া শুনিয়া শ্বশুর বধূকে মা'র কাছে রাখিয়া যাওয়া স্থির করিলেন। প্রথমে যখন তাহারা আসিয়াছিলেন, তখন তাহাদের ভাবটা কি যেন ছিল, বড় ঘরের মেয়ে—কোনও কিছু কথা না হয়। কিন্তু এখন মা'র মুখে সব কথা শুনিয়া যেন ভাবটা পরিবর্তিত হইয়া গেল।

বধূটির নাম উমা।

মা এইবার বধূটিকে বলিলেন,—"দোস্তজী, এই রাস্তা বড় কঠিন। দশজনে আসে। দশ রকমের কথা হয়। এই রাস্তায় যারা আসে তাদের এ সব উপেক্ষা করতেই হয়। কবীরজীও একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মেরা ধোবী মর গিয়া।" সেই দিক দিয়া যে নিন্দা করে সে উপকারই করে।"

আমরাত সর্বদাই দেখি, মা'র কাছে যেমন বড় ঘরের ছেলে মেয়েরা আসে, সেই রকম গরীব ঘরের ছেলে-মেয়েরাও আসিয়া সমান আদর যত্নই পায়। কাজেই এখানে ধনী-দরিদ্রের প্রশ্নই নাই।

মা ইহাদের হরিবাবার সঙ্গে দেখা করাইয়া দিলেন। শ্বশুরটি যাহা বলিতেছেন, তাহা ধরিয়াই মা কথা বলিতেছেন। যাক্ পরের দিন বধূটিকে রাখিয়া শ্বশুরের চলিয়া যাওয়াই স্থির হইল। মা শ্বশুরের সামনেই বধূটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্বশুর-শ্বাশুরী (উভয়েই সঙ্গে ছিলেন) চলিয়া গেলে কাঁদিবে না ত"? শ্বশুর ও বধূটি একসঙ্গেই বলিল,—'না, না।'

বৈকালে শ্বশুর-শ্বাশুরী স্টেশনে চলিয়া গেলেন। কবিরাজ মহাশয়ও আজ কাশী ফিরিয়া যাইতেছেন। মাকে পান্নালালজী ও তাঁহার মেয়ে বিকালে একটু লইয়া যাইবেন। মা কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গেই চলিলেন। তাঁহাকে স্টেশনে নামাইয়া পান্নালালজী মাকে নিয়া গেলেন। স্টেশনে বধূটির শ্বশুর-শ্বাশুরীর সঙ্গে দেখা হইল। বধূটিকে মা সঙ্গে করিয়াই নিয়া গিয়াছিলেন। উহাকে দেখিয়াই শ্বশুর খুব উৎসাহ ভরে বধূটিকে দেখাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি মা, ও পাশ করিয়াছে? আপনি ত ভয় পাইয়াছিলেন।'

তাহার বলার উদ্দেশ্য বধূটি কাঁদিয়াছে কিনা?

মা একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন,—'পিতাজী, শেষ পাশই পাশ।" আর কিছু বলিলেন না। শ্বশুর ইহাও বলিয়াছিল, আমার ছেলে ত প্রথমে সাধারণ ছেলের মতই ইহাকে বিরক্ত করিত। এ ত দেবী। যাক্ শেষে ছেলেকে আমি বুঝাইয়া বলায় সেও আনন্দে বধূকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। সে চিঠিও দিয়া দিয়াছে"—বলিয়া শ্বশুর একখানি চিঠিও দেখাইল।

শ্বশুর চলিয়া যাইবার পর দিনই ছেলের নিকট হইতে ২টি টেলিগ্রাম

আসিয়া হাজির। একটি বধূর নামে, দ্বিতীয়টি শ্বশুরের নামে। টেলিগ্রামের মর্ম,—'শীঘ্র চলিয়া আইস, মন চঞ্চল হইয়াছে।'

ওদিকে পরদিন সকালেই শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত। সে বধূটিকে লইয়া যাইবে।

বধূটির ভাবটি কিন্তু সহজ সরল। শ্বশুরের কথার বিরুদ্ধে সে কিছু না বলায় অনেকেই মনে করিয়াছিল বধূটির বিষয় শ্বশুর যাহা যাহা কহিয়াছিল, সবই বুঝি সত্য। যখন সে কিছু বলে, মা আগ্রহ সহকারে শোনেন। আমাদেরও মায়ের এই আগ্রহ দেখিয়া ঘটনা সত্য বলিয়াই মনে হইয়াছে।

কাহারো ভাবে মা বাধা দেন না।

মা বলেন,—"দেখ না শেষ পর্যন্ত কি হয়। ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? সত্য যাহা তাহা ঠিক সময় প্রকাশ পাইবেই! কাহারও ভাবে বাধা দিতে নাই। ভাবে বাধা দিয়া মনে ব্যথা দিতে নাই।" বধূটির আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে বোঝা যায় মা উহার এ ব্যাপারে সবই জানেন। সব জানিয়াও মা কাহারও ভাবে বাধা দেন না। মা টেলিগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া শ্বশুরকে বলিলেন,—"পিতাজী, এই ৩৩॥০ বৎসর যদি তোমার ছেলে সাংসারিক সুখ না পাইত, তাহা হইলে বধূকে ফিরাইয়া নিবার জন্য সে এত অস্থির হইত না।"

শ্বশুর বোধ হয় মায়ের কথা বুঝিল। শ্বশুর নিজেই বধূটির কথা অত্যন্ত বাড়াইয়া সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইয়াছে। এবার বধূটিও সেকথা বলিল। যাক—

এখনো মা দেরাদুনেই থাকিবেন। হরিবাবাও আছেন। সৎসঙ্গ চলিতেছে। রাসলীলা হইতেছে আজ ১॥০ মাস যাবৎ।

একদিন চুণীলালজীর মেয়ে শান্তি মেহরা পুত্রশোকে অস্থির হইয়া মা'র কাছে আসিয়া উপস্থিত। তাহার ছেলেটি এরোপ্লেনের দুর্ঘটনায় মারা

গিয়াছে। মা শান্তিকে বলিতেছেন—"একমাত্র ভগবৎ চিন্তাই শান্তি পাইবার উপায়। তাঁহাকে ছাড়া যাহাই নিয়া থাক, তাহাতেই দুঃখ।"

এই উপলক্ষে আজ কীর্ত্তন হইল। কাল তাহার শান্তি কামনায় ভাণ্ডারা হইবে।

২৬শে জুন ১৯৫৯।

রাত্রি প্রায় ১২টা। আমি, বুনি, ছবি মায়ের কাছে বসিয়া রহিয়াছি। বুনি পা মালিশ করিতেছে। হঠাৎ মা বলিয়া উঠিলেন,—"এ জায়গাটাতে বেশ একটা জমাট ভাব আছে। তোরা সকলে মিলে ভাবের রাজ্য গড়ে তোল। জপ ধ্যানে ডুবে যা। মন প্রাণ দিয়ে লেগে যা তাঁর ধ্যানে, তাঁর চিন্তায়।"

২৭শে জুন ১৯৫৯।

ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্য করিয়া মা বলিতেছেন,—বিশেষ করিয়া তপন ও হীরুকে মা বলিতেছেন,—"দিবা নিদ্রা না দেবারই চেষ্টা কর। দিনে ঘুমালে আলস্য এসে যায়। মন প্রাণ দিয়ে তাঁর চিন্তায় লেগে যাও। ফাঁকি দিলে চলে না। একটু শুনি ত বাবা, তাঁর স্পর্শের কথা, তাঁর সাড়া পাওয়ার কথা। মনে মনে সংকল্প কর, তাঁর সাড়া না পেলে আসন ছেড়ে উঠব না। কেউ নাই এ সময় লুকাইয়া ঘুমাই, নিষিদ্ধ জিনিষ

শ্রীশ্রীমায়ের মুখের অমূল্য কয়েকটি বানী।

লুকাইয়া থাই, এরকমটা করা উচিত না। সময় ত চলে যায়। বৃদ্ধ বয়সে করব বললে চলে না। এখনই কর। সময় চলে যাচ্ছে। আর করবে কবে?"

২৮শে জুন ১৯৫৯।

বিকাল বেলা মা আপন মনে গান গাহিতেছেন। বুনি ঘরে যাইতেই মা বলিলেন,—"একজন এই গান গাহিয়া যাইতেছে।" বলিয়াই গানটি গাহিতে লাগিলেন।

প্রেম দেওয়ানা। প্রেমসে পহচানা।
ম্যয় তো প্রেম দেওয়ানা। প্রেমসে পহচানা।
" " " " গুরু " " "।
" " " " কৃষ্ণ " " "।
" " " " হরি " " "।
" " " " রাম " " "।
" " " " দুর্গা " " "।
" " " " কালী " " "।
" " " " শিব " " "।
প্রেম দেওয়ানা……ইত্যাদি।

আজ সৎসঙ্গের পর বিভু এই গানটিই গাহিল।

২৯শে জুন ১৯৫৯।

সকালে হরিবাবা রাম অর্চা করিলেন। মা শুইয়াছিলেন,—আমি ও বুনি ঘরে যাইতেই মা একটু জড়ানো ভাবে বলিলেন,—গঙ্গার

উপরে মোহনানন্দজী দাঁড়াইয়া হাতে সূর্য্যার্ঘ্য লইয়া আছে। বাঁ-দিকে ঝরা জল তাহার নিজের মাথায় পড়িতেছে। কিছু পরে জলের ঝরা বন্ধ হইল। সেখানে ভোলানাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন। মোহনানন্দজী ভোলানাথকে বলিলেন,—'আপনি বলুন।' ভোলানাথ সামনে আসিয়া বলিতে গেলেন মোহনানন্দজী শুনিলেন না। মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন'—আপনি বলুন ?' মা বলিলেন,—"তুমি ত পূর্বমুখী হইয়া ঠিকই দাঁড়াইয়াছিলে।"

কথাটা ঠিক বুঝা গেল না।

৭ই জুলাই ১৯৫৯।

আজ সকালে কি কথায় কথায় মা বলিতেছেন,—"দিদি, দেখছিলাম. শংকরানন্দ (কাশীর) এসে বলছে,—"মা, আমি বাড়ী বদলাচ্ছি।"

শেরসিংহের মেয়ে দর্শন কুমারীর ছেলে রবি ভয়ানক অসুস্থ শুনিয়া তাহারা মাকে জানাইয়া লক্ষ্ণৌ গিয়াছিল। মাঝে মাঝেই সংবাদ আসিতেছে যে অবস্থা খুবই খারাপ। আজ বিকালে সকলে মা'র কাছে আসিয়াছে। রবিও আসিয়াছে। তাহার মা'রও চোখে জল আসিতেছে। কয়েকদিন পূর্বেই তার অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছিল। জ্বর ১০৭° এর উপর। সমস্ত শরীর বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার সমস্ত শরীর বরফের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। এইরূপ যখন অবস্থা, তখন রোগী দেখিতেছে যে শ্বাস যেন বাহির হইয়া যাইতেছে। ঘর-বাড়ীর কথা সব মনে আসিল। ইহারই মধ্যে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যেন মা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সে 'মা' 'মা' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপ করিতেই সে যেন মনে অসীম বল বোধ করিল, এবং তাহার মনে হইল যে আর কোনও ভয় নাই। মা আসিয়াছেন, আর কিছু হইতেই পারে না।

বিশ্বতঃ দৃষ্টি মা।

ইহার কিছুদিন পূর্বে একবার তাহার মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে মা'র কাছে আসিয়াছিল। তাহার মা মা'র নিকট বিশেষ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিল যে ছেলের মদ্যপানের দোষ যেন চলিয়া যায়। মা তাহাকে বার বার বলিয়াছেন,—"এ সব ছাড়। এ সব মৃত্যুর দিক।" আশ্চর্য, এবার অসুস্থতার পরে চিকিৎসকেরা বলিতেছেন, যে মদ্যপান ত্যাগ না করিলে তাহার জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন। মুন্না প্রভৃতিও এই কথাই বলিতেছিল।

মা ত পূর্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। আজ তাহারা মা'র কৃপার কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল।

ইতিমধ্যে একদিন মা স্বপ্নে দেখিতেছেন মাকে কেহ দধি ও চিড়া খাওয়াইতেছে; আর হরিবাবা একটু দূরে দাঁড়াইয়া মা'র দেওয়ার অপেক্ষা করিতেছেন।

আরো কয়েকটি ঘটনা।

তাহার পরের দিন মা খুব ভালো করিয়া হাঁড়িতে দই পাতিয়া, চিড়া কিছু ভিজাইয়া, কিছু ভাজাইয়া সঙ্গে নারিকেল ও চিনি মিশাইয়া সকালে সৎ সঙ্গের পরে হরিবাবা যাইবার পূর্বে-ই মা নিজে মেয়েদের সঙ্গে লইয়া ঐসব দ্রব্যাদি সহ কল্যাণ-বনে গেলেন।

মেয়েরা আসিয়া বলিল যে মা নিজে এমন ভাবে সব সাজাইলেন যে সাজানটাও একটা দ্রষ্টব্য হইয়া উঠিল। সত্যই অনেক সময় আমরা দেখি যে অতি সাধারণ ব্যাপারও মা এমন সুন্দর ভাবে করেন যে তাহা অপূর্ব হইয়া ওঠে।

যাহা হউক, হরিবাবা সেখানে যাইতে-ই মা সব হরিবাবাকে দিলেন। উহা পাইয়া তিনি খুব-ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

মা'র শৈশবের কথা নিয়া পণ্ডিত সুন্দর লালজী এবং আমরাও কেহ কেহ প্রশ্ন করিলে মা অনেক কথা বলেন। সকালে ও রাত্রে সৎসঙ্গের পরে,

মা'র খেয়াল হইলে, মা আপন ভাবেও অনেক কথা বলেন। চিত্রা (এই মেয়েটি সম্প্রতি মা'র কাছে আসিয়াছে। এম্, এ, পাশ—আমেরিকাতেও কিছু পড়াশোনা করিয়াছে। মাও তাহার সম্বন্ধে বলেন 'ভাবটি নিখুঁত শুদ্ধ') ললিতা পাঠক, (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। ইঁহারও ভাবটি অতি সুন্দর) নির্মল, হাণ্ডু প্রভৃতি অনেকেই মা'র সম্মুখে বসিয়া আছে। বম্বে হইতে শান্তি মেহেরাও মা'র দর্শনে আসিয়াছেন, ইহার বড় ছেলে পাইলট ছিল, অল্প কিছুদিন হয় অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গিয়াছে। তিনি খুবই পুত্র-শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহার ছেলেকে কিছুদিন পূর্বে-ই মা বলিয়াছিলেন,—'আর কি কোন কাজ নাই'। এই কথা শুনিয়া তাহার মা'র মনে তখনই বিশেষ দুশ্চিন্তা হইয়াছিল। ইনি শান্তি লাভের আশায় মা'র কাছে আসিয়াছেন। যাক্, ইনিও সেখানে উপস্থিত। ইহাদের সকলের সম্মুখেই সে-দিনও মা'র বাল্য-জীবনের অনেক কথা শোনা গেল।

৯ই জুলাই ১৯৫৯।

মার শারিরীক অবস্থার পরিবর্তনে হরিবাবার উৎকণ্ঠা।

গত রাত্রে সৎসঙ্গের পর শ্রীহরিবাবাজী আমার ঘরে আসিয়া কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মা'র শরীরের অবস্থা ও ভাব পরিবর্তনের কথা হইতেছিল। তিনি আসেন এবং আছেন বলিয়াই, মা যতটুকু করার করিতেছেন বাহিরের দিক হইতে। হরিবাবাও বলিলেন যে তিনিও লক্ষ্য করিতেছেন যে পূর্বের মত মা'র সৎসঙ্গ ইত্যাদির দিকেও আর পূর্ণ খেয়াল নাই। কখনো একটু একটু হয়ত গেলেন, তাহাও যেন কেমন একটু ছাড়া ছাড়া ভাব।

হরিবাবাজী নিজে মাকে শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মা'র সঙ্গে একান্তে তাঁহার কিছু কথা হইল। বর্তমানে মা যে ঘরে থাকেন সে ঘরটি হরিবাবার ঠিক পছন্দ নয়। তাঁহার ধারণা মা ঘর পরিবর্তন করিলে হয়ত মা'র শরীর কিছু ভালো হইতে পারে। এ প্রার্থনা-ও তিনি পুনঃ পুনঃ মা'র নিকট করিতেছেন। হরিবাবার একান্ত অনুরোধে মা-ও স্বীকৃত হইলেন। কথা হইল গুরু-পূর্ণিমার পরেই মা দিল্লী আশ্রমে যাইবেন এবং হরিবাবাও বৃন্দাবন গিয়া সেখান হইতে আবার দিল্লী আসিয়া কয়েকদিন থাকিবেন।

আমারও গুরু-পূর্ণিমার পরেই দিল্লী গিয়া থাকিবার কথা।

আজ সকালে হরিবাবার সহিত কথা বলিয়া শ্রীনাথ শাস্ত্রী স্থির করিয়াছেন যে আগামী কাল হইতে মা'র শরীরের জন্য ভাগবৎ পারায়ণ করিবেন। মা'র শরীরের সুস্থতার দিকে হরিবাবার পূর্ণ খেয়াল আছে। একটা না একটা অনুষ্ঠান তিনি করাইতেছেন-ই।

আজ সকালে হল্যাণ্ডের একজন মহিলা চিত্রকর মা'র নিকট আসিয়াছেন।

মাতৃ-সকাশে হল্যাণ্ডের মহিলা চিত্রকর।

তিনি প্রথমে কাশী আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে মা এখানে আছেন শুনিয়া এখানে আসিয়াছেন। তিনি নাকি খুব ভালো আর্টিষ্ট। ইহাই তাঁহার প্রধান কাজ। বৈকালে তিনি মাকে তাঁহার ছবির সংগ্রহ দেখাইলেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা তিনি মা'র ২।৩টি ছবি ভাল করিয়া করেন। এই কারণে তিনি মা'র নিকট একটু সময় প্রার্থনা করিতেছেন।

১০ই জুলাই ১৯৫৯।

আজ সকাল হইতে মাতৃ-মন্দিরে শ্রীনাথ শাস্ত্রী মূল ভাগবৎ পারায়ণ আরম্ভ করিলেন। সাত দিনে ইহা সম্পূর্ণ হইবে। কথা প্রসঙ্গে মা তাঁহাকে

গতকাল বলিতেছিলেন, এই রকম যে করিতে হয় তাহাও মা'র বাহিরের দিক দিয়া জানা ছিল না। তবু কিছুদিন আগে মা'র একজন ভক্তের ছেলে ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেলে মা তাহার আত্মার কল্যাণের জন্য নিজ খেয়ালেই একটু মূল ভাগবৎ পারায়ণের কথা বলিয়াছিলেন। এখন, গতকাল এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন যে, যেরূপ শ্রীনাথ শাস্ত্রীজীর করার ব্যবস্থা হইয়াছে, মা-ও ঐ ছেলেটির জন্য ঠিক ঠিক এই মত-ই করিতে বলিয়াছিলেন।

রাত্রিতে সুন্দর লাল পণ্ডিতজী আমার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। মা-ও আছেন, মাকে তিনি একটি প্রশ্ন করিলেন :

একটি বিচিত্র প্রাচীন ঘটনা।

—'বইতে আছে যে একবার ভাইজীকে মা গঙ্গা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। মা যেখানে শুইয়াছিলেন সেখানে দেখা গেল যে, মা'র কাপড়-চোপড় সমস্ত ভিজা, যেন এখনই জল হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন। এইরূপ কি-ভাবে হইল ? . . . .

মা—"পিতাজী, সব-কিছু সম্ভব। সমস্ত শরীরই-ত আমার শরীর। এখানেই কাশী, গঙ্গা সব কিছু। এখানে থেকেও সব কিছু হ'তে পারে। এই শরীরেও সব কিছু হ'তে পারে। কাপড় ভেজা তো একটা শুধু নিদর্শন।"

মা ত সোজা ভাবে নিজের বিষয় সাধারণত কিছু বলেন না। তাই পণ্ডিতজী মা'র কথার ভাবটি যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই আমিও তাঁহাকে একটু বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

"মা'র, ছবি আঁকা, ফটো তোলা খুবই কঠিন"—বিদেশাগত আর্টিষ্টদের উক্তি।

হল্যাণ্ড হইতে যে মেমটি আসিয়াছেন তিনি মা'র ঘরে আসিয়া মা'র ছবি আঁকার জন্য প্রায় ১ ঘণ্টা ধরিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক ঠিক যেন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরে তিনি বলিলেন যে বহু সাধু-সন্তের ছবি তিনি আঁকিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ ত তাঁহার কখনো হয় নাই। তিনি বলিলেন,—"মা'র অন্ততঃ ১০।১২ প্রকারের মুখের ভাব

দেখিতেছি।” কোন্‌টি যে করিবেন তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তিনি বলিলেন,—“মা’র ছবি আঁকা সত্যই খুব কঠিন।”

আমরা জানি একাজে আজ পর্যন্ত কেহ সে-রকম সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

বিলাতের রিচার্ড ল্যানয় একজন প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার ও শিল্পী। মা’র নানা ভাবের ছবি তিনি তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিও আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিলেন,—“মা’র মুখের চেহারা অনবরত-ই পরিবর্তিত হইতেছে। কখনও একেবারে শিশুর মুখ, কখনো বৃদ্ধা, আবার কখনো সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ।”

১১ই জুলাই ১৯৫৯।

আজ সকালেও মেয়েটি মা’র ঘরে গিয়া ঘণ্টাখানেক বসিয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিতেছে যাহাতে ছবিটি ভালো হয়। কিন্তু মনের মত যেন করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আত্মানন্দ ঠিকই বলিতেছে, যে মা’র ছবি একজন অপরিচিতের পক্ষে আঁকা কি এতই সহজ! ৮।১০ বৎসর মা’র চেহারা ধ্যান করিবার পর যদি তাহা সম্ভব হয়।

পরে মা সৎসঙ্গে বসিয়া আছেন, কীর্তন চলিতেছে। হরিবাবাও উপস্থিত। মেমটিও সেখানেই ছিল। সে মায়ের চেহারায় কিছু বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া আবার আঁকিতে বসিল। কিন্তু হরিবাবা ইহা দেখিতে পাইয়া মেমটিকে বেশ একটু কঠোর ভাষায় ভৎ’সনা করিলেন। মেমটি মনে আঘাত পাইয়া খুবই কাঁদিতে লাগিল। আমরা তাহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলাম।

দিন কয়েক হয়, কাশী হইতে কবিরাজ মহাশয় মা'র নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছেন। তাহার উত্তরের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"দেহ মনের রাজ্যেই বিরুদ্ধ শক্তির অধিকার। তাই স্থির ভাবে বসা, স্থিরাসনে চেতনার ধারা নিয়া দীর্ঘ সময় থাকার চেষ্টা। মুক্ত-আকাশে যেমন বর্ষায় অনাবৃত বৃক্ষগুলি পল্লবিত হয়ে উচ্চ গতির স্থিতিতে নিজ রূপ প্রকাশ করে, তেমন সাধক জীবনেও ইষ্ট-লক্ষ্যে গতি গত-চিন্তা-শূন্য চেষ্টা, সরল সোজা নব-ভাব অনুভবের দিক দিয়া মনকে সর্বদা সরস উন্মুক্ত রাখবার চেষ্টা। তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছিবার রাস্তার পথিকের যেমন ফিরে তাকান না যে রাস্তায় কতটা এলাম, কি দেখে এলাম ও ফল কি পেলাম,—ঠিক তেমনই সাধক জীবনেও গত ভাবনা ত্যজ্য। লক্ষ্য পূর্ণ রাখবার চেষ্টা। মনো রাজ্যে যতক্ষণ ইষ্টরস কল্পনা হলেও ইষ্টরাজ্যে বিচরণের দিক নেওয়া।"

সাধক জীবনে অতীত মৃত।

মণ্ডির রাণী সাহেবা বম্বেতে আছেন। চিঠিতে ভাগ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে মা'র সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে মা'র মুখ হইতে বেশ কয়েকটি সুন্দর কথা বাহির হইল। কথা কয়টি এই :—

"ভাগ্য ভোগ করবার জন্যেই না মানুষের জন্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিতের ওপরে না যাওয়া যায় ততক্ষণ ভগবানের বিধান না মেনে আমরা পারি কই! আমাদের কর্ম অনুযায়ী-ই ত ফলের বিধান তিনি তাঁর বিধান লঙ্ঘন করতে পারেন কি পারেন না সে বিচার করবার আমাদের শক্তি কোথায়? তাঁর রাজ্যে সব সম্ভব। তিনি সব পারেন। তিনি কিসের জন্য কখন কি করেন সে বিচার করবার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের মনের মত কাজ তিনি সব সময় করবেন কেন? তিনি যে প্রভু। তিনি যা করেন সব-ই আমাদের কল্যাণের জন্য, ইহাই মনে করতে হয়।"

কর্মানুযায়ীই ফলের বিধান।

২০শে জুলাই ১৯৫৯।

এবার কিষণপুরে মা'র ও দিদিমার উপস্থিতিতে গুরুপূর্ণিমা উৎসব বেশ সুন্দর ভাবে হইয়া গেল। তার পরের দিনই ২১শে দুপুর বেলা মটরে মা দেরাদুন হইতে রওনা হইয়া দেরাদুন সহরে তিনজন ভক্তের বাড়ীতে গেলেন। ওখান হইতেই রওনা হইয়া দিল্লী আশ্রমে সন্ধ্যায় পৌঁছিলেন।

২৫শে জুলাই ১৯৫৯।

আমরাও ২০শে বিকালের ট্রেনে রওনা হইয়া পরদিন আসিয়া পৌঁছিলাম। মায়ের জন্য উপরে যে নতুন ঘর হইয়াছে তাহার গৃহ প্রবেশের পূজা ও হোম ২২শে জুলাই হইল। বাটুদাই পূজা, হোম আদি করাইলেন। মা,—দিদিমা, স্বামীজী ও আমাদের সকলকে নিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় কীর্তন শঙ্খধ্বনি সহকারে গৃহ প্রবেশ হইল। পরে মা সকলকে প্রসাদ দিলেন।

মা'র দিল্লী আগমন।

২৩ ও ২৪ জুলাই—এই দুই দিন আমাদের আশ্রমের নিত্য কীর্তনাদি নিয়মিত ভাবেই হইল। মা দ্বিপ্রহরে, বৈকালে এবং রাত্রিতে ভক্তমণ্ডলীকে দর্শনদানে আনন্দিত করিতেন। রাত্রিতে মৌনের পর ৫।১০ মিনিট একটু নাম করা হয়। পণ্ডিত সুন্দরলালজী ও পূজ্য হরিবাবাজী মহারাজ মায়ের শরীর সুস্থ রাখার জন্য আজকাল ভাগবৎ পারায়ণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ভাগবৎ পারায়ণের অঙ্গস্বরূপই এই কীর্তন।

আজ সকালে ৭টায় পূজ্য হরিবাবজী মহারাজ বৃন্দাবন হইতে ভার্গব সাহেবের গাড়ীতে এখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিভু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া

বাবাকে রাস্তা হইতেই কীর্তন শোনাইতে শোনাইতে আশ্রমে লইয়া আসিল।

হরিবাবাজী মহারাজ বলিতেছিলেন—“মা’র ও দিদির শরীর খারাপ তাই আমি আসিয়াছি।”

তিনি মা’র কাছে প্রার্থনা করিলেন যেন শরীর সুস্থ রাখেন। মাকে ও আমাকে বলিলেন, কীর্তনে যোগদান করিবার জন্য। তাহাই চলিতে লাগিল। বাবাজীর প্রাণের একান্ত ইচ্ছা মা সুস্থ থাকুন, দিদি সুস্থ থাকুন, আমরা সকলে মিলিয়া মা'র সঙ্গে আনন্দে থাকি। তাঁর এই আন্তরিকতাটি অতি সুন্দর। তিনি কয়েকবারই এই কথা বলিলেন।

মা’র মাথার শব্দটি কয়েক বছর যাবতই চলিতেছে। কখনো কম থাকে কখনো বেশী হয়। ইহা ভিন্ন কখনও দাঁত, কখনও গলা ব্যথা, কখনো সর্দিকাশী, এই জাতীয় একটা না একটা কিছু লাগিয়াই থাকে। এই জন্য সকলেই চিন্তিত। কিন্তু করিবার কি আছে। মা’র শরীর সুস্থ থাকুক এই কামনায় অনেকেই জপ ইত্যাদি করেন। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হইতেছে না। এই জন্য হরিবাবাজী মহারাজও খুবই দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

২রা আগষ্ট ১৯৫৯।

হরিবাবাজী মহারাজ আজ ভোরে বৃন্দাবন রওনা হইয়া গেলেন।

৭ই আগষ্ট ১৯৫৯।

আজ মা বৃন্দাবন রওনা হইলেন। শরীর এত অসুস্থ, তবুও মা দর্শন দিয়া সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া আনন্দ দিলেন—অসুস্থতার

দিকে যেন কোন লক্ষ্যই নাই। কাহারও মনে ব্যথা না লাগে এই দিকেই একমাত্র দৃষ্টি।

১০ই আগষ্ট ১৯৫৯।

বৃন্দাবন ভাগবৎ সপ্তাহে মা।

আজ হইতে বৃন্দাবনে ভাগবৎ সপ্তাহ শুরু হইল। ঝুলন পূর্ণিমার দিন ১৮ই আগষ্ট পূর্ণাহুতি হইবে। সেই দিন আশ্রমে মহারাসও হইবার কথা হইয়াছে। পান্নালালজীর মেয়ে লীলা সহায় নিজের একমাত্র পুত্রের আত্মার কল্যাণের জন্য এই সপ্তাহ করাইতেছেন। ছেলেটি মারা গিয়াছে বিলাতে।

আমি অসুস্থ, কাজেই দিল্লীতেই আছি।

১২ই আগষ্ট ১৯৫৯।

বাটা কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ খৈতান-এর স্ত্রী শ্রীযুক্তা রাজাবেন কাল মা'র নিকট বৃন্দাবনে গিয়াছিল, আজ চিঠি সহ সে লোক পাঠাইয়াছে। তাহাতে জানিলাম মা'র মাথার শব্দটা প্রায় এক রূপই আছে। ১১ই হইতে গীতাভবনে ১০৮ গীতাপাঠ আরম্ভ হইয়াছে। ১৮ই ভাগবতের পূর্ণাহুতি ও সেই দিনই পূর্ণিমায় ঝুলনের বিশেষ আয়োজন করা হইবে। মহারাসও সেই দিনই হইবে। উহা একসঙ্গে ১২টি মণ্ডলি করিবে।

১৪ই আগষ্ট ১৯৫৯।

বৃন্দাবন হইতে বুনি ও চিত্রার পত্র পাইলাম। মা'র মাথার শব্দ পূর্ববৎই চলিতেছে। যখন একটু কম থাকে তখনই ওঠেন এবং ঘোরা ফেরা আরম্ভ করেন। ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট সময় প্রায় শুইয়াই থাকেন।

ঝুলন উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত বৃন্দাবনে পৌঁছিতেছেন। মা'র খেয়ালমতই এই সব করা হইতেছে।

১৬ই আগষ্ট ১৯৫৯।

নিউ ইণ্ডিয়ার মিঃ মেহতা সস্ত্রীক গতকাল বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। আজ বিকালে তাঁহারা ফিরিয়া আমার সহিত দেখা করিয়া গেলেন। তাঁহাদের হাতে স্বামিজীও এক পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন।

তাহাতে জানিলাম বৃন্দাবনে বিরাট উৎসব চলিতেছে। আগামীকাল মোদীজী নাকি ২৫০০।৩০০০ সাধুদের ভাণ্ডারা আশ্রমে দিতেছেন। বাহির হইতে প্রভুদত্তজী, শরণানন্দজী, প্রভৃতি অনেক মহাত্মাও আসিয়াছেন।

মা'র মাথার শব্দটাও পূর্বের ন্যায়ই আছে। মা এত ব্যস্ত যে সেদিকে মা'র খেয়াল করিবার সময়ও নাই। মা আমাকে লিখাইয়াছেন,—"ঘাবড়িয়ো না। শরীর সুস্থ করো"

১৮ই আগষ্ট ১৯৫৯।

মা'র ১৯শে সন্ধ্যায় দিল্লী ফিরিবার কথা। জন্মাষ্টমী কোথায় হইবে এখনো স্থির হয় নাই।

বৃন্দাবনে ৺চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও তাঁহার কন্যা অপর্ণা দেবী দিন কয়েক হয় আসিয়াছেন। মা'র কাছে তাঁহারা বেশ আনন্দেই আছেন। ভাগবৎ সপ্তাহও বেশ ভাল মত চলিতেছে।

১৯শে আগষ্ট ১৯৫৯।

আজ সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় মা বৃন্দাবন হইতে মোটরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখান হইতে রঘুবংশ বাহাদুর তাহার গাড়ী নিয়া গিয়াছিল মাকে আনিবার জন্য। সেই গাড়ীতেই মা আসিয়াছেন। সঙ্গে মোদীনগরের শ্রীযুক্ত মোদী স্ত্রী ও কন্যা সহ আসিয়াছেন। দিদিমা প্রভৃতি মোদীর গাড়ীতেই আসিয়াছেন।

বৃন্দাবনের ঝুলন উৎসব খুব ভাল মতই হইয়াছে শুনিলাম।

এখানে মা ৪ দিন থাকিবেন। ২৫শে বিন্ধ্যাচল হইয়া কাশী যাইবেন।

মোদীনগরে মা।

জন্মাষ্টমীতে মা কাশীতেই থাকিবেন এইরূপ আশা করা যাইতেছে।

২১শে আগষ্ট ১৯৫৯।

আজ সকালে মা একবার মোদীনগর ঘুরিয়া আসিলেন। মিসেস্ মোদীই মাকে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাদের একটি মন্দির হইতেছে। ঐ মন্দিরে রাম-সীতা ও রাধাকৃষ্ণের এবং দেবী মূর্তিও স্থাপিত হইবে।

বিরাট মন্দির এখনো কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। মা প্রায় ১২ টায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

আজ মণ্ডির রাজা সাহেবের জন্মতিথি। তিনি মা'র পূজা ও ভোগের আয়োজন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে অনেকেই আশ্রমে প্রসাদ পাইলেন।

২৩শে আগষ্ট ১৯৫৯।

বিকালে মাকে স্থানীয় ফ্রেণ্ডস্ কলোনীতে এক ভক্তের বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে অনেকেই গেলেন। আসিবার পথে মা বৃদ্ধ ডাঃ জীবনলালকে দেখিয়া আসিলেন।

২৪শে আগষ্ট ১৯৫৯।

আজ সকালে শ্রী উপাধ্যায়জী কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত নেহেরুর সন্ধ্যা ৬॥০টায় আসার কথা বলিলেন।

বৈকাল ৬॥০টায় পণ্ডিত নেহেরু আসিলেন। সঙ্গে উপাধ্যায়জীও আছেন। পণ্ডিতজী আসিবেন বলিয়া কিছু পূর্ব হইতেই পুলিশের লোকেরা আসিয়া আশ্রম ঘেরাও করিয়া রহিল। ভক্তদের মধ্যেও বর্মাজী, নারায়ণ দাসজী, টিহরীর রাজা-রাণী, মণ্ডির রাজা-রাণী এবং আরও অনেকে আসিয়াছেন।

মাতৃ-সমীপে পণ্ডিত শ্রীনেহেরুজী।

পণ্ডিতজী আসিলে নারায়ণ দাসজীর নির্দেশ মত আমি তাঁহাকে আশ্রমের বারান্দায় ঢুকিতেই মালা-চন্দন পরাইয়া দিলাম। কীর্তন-ও পূর্ব হইতেই চলিতেছিল। হলে বহু লোক উপস্থিত। কাজেই পণ্ডিতজীকে উপরে মা'র ঘরে নিয়া যাওয়া হইল। গতকালই পণ্ডিতজীর এখানে আসিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু কাল তিনি সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া আজ আসিলেন। তিনি প্রায় ৪৫ মিঃ মা'র কাছে বসিয়া ছিলেন। উপাধ্যায়জী ও আমরা যাহারা ঘরে ছিলাম, সকলেই বাহিরে চলিয়া আসিলাম। মা'র সঙ্গে নেহেরুজী একান্তে কি কথা কহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মা'র যাওয়ার সময় হইয়াছে শুনিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। মা তাঁহাকে ১ ছড়া রুদ্রাক্ষের এবং এক ছড়া তুলসীর মালা গলায় পরাইয়া দিলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন।

উপাধ্যায়জী মাকে মধ্যে রাখিয়া একদিকে আমাকে ও একদিকে নেহেরুজীকে নিয়া ছবি উঠাইলেন। পরে সামান্য জলযোগের পর তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন। জলযোগের সময় মায়ের দেওয়া মালা নেহেরুজীর হাতেই জড়ান ছিল। উপাধ্যায়জী ঐ সময় তাঁহার হাতে ঐ মালা দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা দিলেন না। বলিলেন,—'না, উহা আমার হাতেই থাক্।'

যাহা হউক, পরে নীচে আসিয়া উপস্থিত বাচ্চাদের একটু আদর করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মা'র সহিত একান্তে নেহেরুজীর কি কথা হইয়াছিল জানি না, তবে তিনি বাহিরে আসার সময় যে তাঁহার মুখে একটা খুবই শান্তির ভাব ছিল, ইহা ছবি দেখিয়া অনেকেই বলিয়াছিল।

যাক্ আজ মা সন্ধ্যা ৮টার গাড়ীতে বিন্ধ্যাচল যাইতেছেন। স্টেশনে বহু লোক গিয়া মা'র যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সীতারাম জয়পুরিয়া বিন্ধ্যাচলে সহস্র চণ্ডী পাঠ করাইতেছেন। মাকে তথায় যাইবার

জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাই কথা হইয়াছে মা সোজা এখান হইতে বিন্ধ্যাচল যাইবেন এবং তথা হইতে কাশী যাইবেন।

মা'র যাওয়ার সময় উপস্থিত হইল। মা নিচে আসিয়া হলে ৫ মিনিট বসিলেন, পরে রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রম শূন্য হইয়া গেল, মনও সকলের শূন্য হইয়া পড়িল।

২৬শে আগষ্ট ১৯৫৯।

পানুর পত্রে জানিলাম, গতকাল বেলা ১০টায় মা মির্জাপুর পৌঁছিয়াছিলেন। স্টেশনে সীতারামজীর বাবা, মা, পটলদা, দাসু প্রভৃতি ৩।৪খানা গাড়ী নিয়া উপস্থিত ছিল। সেখানে এক রাত কাটাইয়া মা পরদিন ১১॥০টায় মোটরে কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বিন্ধ্যাচলের অনুষ্ঠান বেশ ভালভাবেই চলিতেছে। মা হয়ত আগামীকাল নন্দোৎসব শেষ করিয়াই আবার বিন্ধ্যাচল যাইবেন। পরে সেপ্টেম্বরের ৩।৪ তারিখ পর্যন্ত এখানে ফেরার কথা।

কাশীতে মা।

পানু লিখিয়াছে,—"মা বললেন তুমি ওখান থেকে সেপ্টেম্বরের ১৪।১৫ই পর্যন্ত রওনা হয়ে সোজা এখানে এসে, ভাগবতের শেষ দেখে, অখণ্ডানন্দজীর ভাণ্ডারা দেখে পরে কয়েকদিনের জন্য বিন্ধ্যাচলও যেতে পারবে।"

কাশীতে ভাগবৎ জয়ন্তীতে রমা সাকসেনা পতির ঊর্দ্ধগতির কামনায় ভাগবৎ সপ্তাহ করিবে। উহা ৯ই সেপ্টেম্বর আরম্ভ হইবে। আবার ৫ই সেপ্টেম্বরও কাশীতে নন্দাভাই একটা বিশেষ অনুষ্ঠান করাইবে।

২৮শে আগষ্ট ১৯৫৯।

বিন্ধ্যাচল হইতে বুনির পত্রে জানিলাম তাহারা ২৭শে মা'র সঙ্গে বিন্ধ্যাচল ফিরিয়া গিয়াছে। কাশীতে নন্দোৎসব ভাল ভাবেই হইয়াছে। কন্যাপীঠের মেয়েরা ঐ উপলক্ষে লীলাও করিয়াছে। মা'র ভাবটিও বেশ হাসিখুশীই ছিল। সেইদিন দুপুরে ভোগের পর বিকাল ৪টার সময় মা বিন্ধ্যাচল ফিরিয়া আসিয়াছেন। বেলুও এখন মা'র সঙ্গেই আছে।

২৯শে আগষ্ট ১৯৫৯।

তপনের পত্র পাইলাম। তপন লিখিয়াছে, মা ২৫শে বিন্ধ্যাচল পৌঁছিয়াছেন। পটল কাশী হইতে মাকে নিবার জন্য মির্জাপুর পর্যন্ত আসিয়াছিল। পরের দিনই জন্মাষ্টমী। সুতরাং মা কাশী চলিয়া যান। কাশী ফিরিয়াই নাকি মা বিন্ধ্যাচলের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—"দেখ, এক রাত্তিরে আমি খুব বিশ্রাম নিয়া আসিয়াছি।"

জন্মাষ্টমীর দিনটা মা কাশীতে খুব ব্যস্ত ছিলেন। মাকে পাইয়া সকলেই খুব আনন্দও করিয়াছে। মা-ও সারা রাত্রি ধরিয়া আশ্রমের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আশ্রম খুব সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছিল। উপরে গোপালের পূজা, নীচে চণ্ডীমণ্ডপে কৃষ্ণের পূজা হইয়াছে। এইভাবে এক রাত্রি কাশীতে কাটাইয়া মা আবার বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন মা'র প্রায় সপ্তাহখানেক ওখানেই থাকার কথা।

কাশীতে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব।

পুনরায় হয়ত মা কাশীতেই যাইবেন, কারণ ৫ই হইতে নন্দাজীর অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার কথা।

শ্রীশ্রীমায়ের সাথে পণ্ডিত নেহেরু

শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে উপবিষ্ট পণ্ডিত নেহেরু

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

আজ সকালে বিন্ধ্যাচল হইতে ট্রাঙ্ক কলে জানিলাম, মা আমাকে সম্ভব হইলে আজই কাশী রওনা হইতে বলিয়াছেন। নতুবা আগামীকাল। এখানে অসহ্য গরম। আমার শরীরটা তাই খারাপ চলিতেছে।

বিকালে কলিকাতা হইতে লেখা চিত্রার পত্র পাইলাম। সে কয়েকদিন হয় কলিকাতা গিয়াছে।

সে লিখিয়াছে, জন্মাষ্টমীর দিন কাশীতে মা'র উপস্থিতিতে খুবই আনন্দ হইয়াছে। মেয়েরা মাকে নানাভাবে সাজাইয়াছে। নন্দোৎসবের দিন মা কন্যাপীঠের হলে কুচামনের দেওয়া লাল ঘাঘড়া ও ওড়না পরিয়াছিলেন। মেয়েরা মাকে নাচও দেখাইয়াছে। ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে মা খুব আনন্দ করিয়াছেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

আজ দুপুরে দিল্লী এক্সপ্রেসে আমি কাশী পৌঁছিলাম। মা-ও গত পরশু বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়াছেন। আজই কলিকাতা হইতে সিস্টার দয়া এবং আরও দুইজনের মা'র কাছে আসার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ রাঁচীতে অসুস্থ হইয়া পড়ায় আসা হয় নাই।

আগামীকাল হইতে নন্দার শতচণ্ডী পাঠ ও সূর্যের জপ আরম্ভ হইবে। নন্দা সস্ত্রীক কাশীতে আসিয়াছে।

আগামী ৯ই হইতে এখানে ভাগবৎ জয়ন্তী আরম্ভ। এবার রমা তাহার পরলোকগত স্বামীর কল্যাণে ভাগবৎ সপ্তাহের আয়োজন করিয়াছে।

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

কলিকাতা হইতে আজ দুপুরের প্লেনে সিস্টার দয়া ও তাঁহার ভগ্নী আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি মাকে খুবই আনন্দের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—'ভারতে আসিয়া সংগঠনের কার্যে নানাপ্রকার প্রীতি ও অপ্রীতিকর ব্যাপারের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে, কিন্তু সর্বদাই মা'র উপস্থিতি যেন অনুভব করিতেছি। এখনও সেই উপস্থিতিই বলবৎ আছে। মায়ের দিব্য প্রেমের প্রবাহের মধ্যে যেন নিত্য স্নাত হইতেছি।"

মাতৃ সকাশে সিস্টার দয়া।

সিস্টার দয়া পরমহংস যোগানন্দজীর আশ্রমের প্রেসিডেন্ট। গত ১২ই তাঁহারই আশ্রমের আমেরিকান সাধু ক্রিয়ানন্দজী মা'র নিকটে আসিয়াছিল। বেশ সরল ও সদ্‌ভাবাপন্ন যুবক। ১২ই তাহার দীক্ষার দিন। তাই সেই দিনটি মা'র নিকটে থাকার আগ্রহে এখানে আসিয়াছে। সকলেই একত্রে কাল কলিকাতা ফিরিয়া যাইবেন। ক্রিয়ানন্দ একটু একটু বাংলাও শিখিয়াছে। মাকে ২।১টি বাংলা গানও বেশ সুন্দর সুরে গাহিয়া শুনাইল।

১। কোলে তুলে নে মা কালী। ২। মজল আমার মন ভ্রমরা।

সিস্টার দয়ার হাতে ধাতুর বলয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম উহা ত্রি-ধাতুর। একজনের হাতে নবরত্নও আছে। উহা পরমহংসজী নাকি তাহাদের দিয়াছেন। সিস্টার দয়া'র হাতে একটি পঞ্চরত্নও দেখিলাম। তাহা নাকি লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্তেশ্বরজীর হাতে ছিল। তিনি পরমহংসজীকে দিয়া গিয়াছিলেন। পরমহংসজী আবার দয়া মাকে দিয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর সকলে আসিয়া উপরে অন্নপূর্ণার পিছনে মা'র ঘরে বসিলেন। ক্রিয়ানন্দ ২।১টি গানও করিল। মা'র সঙ্গে কিছু কিছু কথা হইতেছে। ক্রিয়ানন্দ মাকে বলিল,—'মা, আপনি আমেরিকায় চলুন।'

মা হাসিয়া বলিলেন,—"নিয়া গেলেই যাব।" পরে মা আবার ব্যাখ্যা করিলেন,—"যদি যাওয়া হয়, তবে নিয়ে গেলে বোঝা যায়। আর যদি না যাওয়া হয়, তবে নিয়ে গেলে না। যোগানন্দ পিতাজীকেও এই কথাই বলা হয়েছিল।"

আমি মাকে যাইবার জন্য বাজাজের কাছে মহাত্মাজীর টেলিগ্রাম-এর বিষয়ও বলিলাম। মা বলিয়াছিলেন,—"খেয়াল ত হচ্ছে না। পিতাজী তবে নিয়ে গেল না।"

দয়া বহিন্ মাকে বলিলেন,—"আমি মাকে হৃদয়ে নিয়ে যাব।"

ক্রিয়ানন্দ বলিল,—"এটা কিন্তু যথেষ্ট হল না"

ক্রিয়ানন্দ মাকে আরও বলিল,—'মা আপনার সব কথাই ভাল। একটা কথাই ভাল না। কলিকাতায় আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আপনাকে আমেরিকায় নিয়ে যাব। আপনি বলেছিলেন,—'আমি তো আমেরিকাতে আছি-ই। আপনার কথাটা যদিও ভাল, কিন্তু আমার এটা ভাল লাগে না। কারণ আমি এটা বুঝতে পারি না।'

"দেখুন, আপনি কলকাতাতেও বলেছিলেন যে আপনি কলিকাতাতেও আছেন। কিন্তু তবে আমি এখানে দৌড়ে আপনাকে দেখবার জন্যে কেন এলাম। আর এখানে এসে আপনাকে দেখে ভালো লাগছে। এ ভালোটা ত কলকাতায় লাগে নাই। যদিও জানি আপনি কলকাতাতেও আছেন।"

আবার কথায় কথায় ক্রিয়ানন্দ বলিতেছে,—"আমার গুরুর ভাষা বাংলা ভাষা। সেটা আমাকে শিখতেই হবে।"

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

আজ সিস্টার দয়ারা চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা বারবার বলিতেছেন যে আমাদের দেখিয়া তাঁহাদের খুবই ভালো লাগিতেছে। আমিও বলিলাম

যে তাঁহাদের দেখিয়াও আমাদের খুব ভালো লাগিয়াছে। মা ত সর্বদাই বলেন,—"সবই তো এক। তোমার গুরু যিনি জগতের গুরু তিনি। জগতের গুরু যিনি তোমার গুরু তিনি।"

দয়া মা,—"মা'র পরিবার ও আমাদের পরিবার এক।"

মা দয়াকে ও তাঁহার বোনকে উলের স্কাফ দিলেন। ক্রিয়ানন্দকেও একটি চাদর দিয়াছেন। তাঁহারা বার বার আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন,—বলিতেছিলেন,—'আমাদেরও মনে হইতেছিল, মা'র দেওয়া কিছু জিনিষ সঙ্গে লইয়া যাই। মা অন্তর্যামিনী, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন'। মাকে দুজনেই প্রণাম করিলেন।

আমিও তাঁহাদের একটি চন্দনের Date stand দিলাম, ইহা মাকে কেহ দিয়াছিল। দিয়া বলিলাম, উহা দেখিয়া আমাদের কথা মনে হইবে।

সন্ধ্যায় যাইবার সময় মা হঠাৎ গিয়া তাহাদের ঘরে বসিলেন। আজ ভাগবৎ জয়ন্তীর সমাপ্তির দিন। মা তপনকে দিয়া ভাগবতের বিষয়ে একটু বলাইলেন।

তাহারা মাকে গুরুর স্মৃতি দেখাইলেন তাঁহার বস্ত্রের একটি টুকরা, একটু চুল প্রভৃতি। আর দেখিলাম গুরু, পরমগুরু সকলেরই স্মৃতি সকলেই কিছু কিছু সঙ্গে রাখিয়াছে। মাকে সব দেখাইলেন। ইহা গুরুর প্রতি অসীম ভক্তি বিশ্বাসেরই পরিচয়।

ইহার পরে তাঁহারা মা'র কাছে মা'র ঘরে আসিয়া বলিলেন। বার বার বলিতে লাগিলেন, আবার কবে দেখা হইবে। মাকে শেষে সকলে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। মা ক্রিয়ানন্দকে বলিলেন,—"ধন্যবাদ কাকে দেয়? আপন জনকে কি দেয়?"

ক্রিয়ানন্দ হাসিয়া বলিল,—'নিশ্চয়'।

দয়া মা বলিলেন,—"অনিল গাঙ্গুলী আমাদের এক ঝুড়ি ফল পাঠিয়ে-

ছিলেন মা'র কাছ থেকে। সেগুলি খুব মিষ্টি ছিল।" ধন্যবাদ ত আর দিতে পারিতেছেন না।

ইহা দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ, ধন্যবাদের চেয়েও বেশী হ'ল'।

মা কথায় কথায় ক্রিয়ানন্দকে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি বাঙ্গালী?"

ক্রিয়ানন্দ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—"নিশ্চয়। আমি বাঙ্গালী।"

মা-ও হাসিয়া নিজের দিকে দেখাইয়া বলিলেন,—"আমেরিকান।"

ক্রিয়ানন্দ বলিল,—'আপনি ত সব দেশেরই।'

দয়া মাকে বলিলেন,—'মা, তুমি বড় মিষ্টি।'

মা-ও হাসিয়া জবাব দিলেন,—"তুমি নিজে মিষ্টি কিনা।"

মাকে দেখিয়া যেন তাহাদের আর তৃপ্তি হইতেছে না। পুনঃ পুনঃ এই ভাবটাই প্রকাশ পাইতেছে। আর একটি বিশেষ সুন্দর জিনিষ দেখিলাম। মা'র কাছে বসিলেই যেন তাহাদের ধ্যানের ভাব জমিয়া আসে। কখনও একটু কথাবার্তা হয়। আবার চোখ বুজিয়া ধ্যানের ভাবে বসিয়া থাকে।

প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার সর্বাধিক।

বিদেশীদের এই ভাব দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল পরমহংসজীর সেই কথা, যে বাতির নীচেই অন্ধকার থাকে। আমরা মায়ের নিকটে থাকিয়াও এই রকম হইতে পারিলাম না।

শ্রীযুক্ত কালীপদ গুহরায় নামক একজন সাধক কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।

মায়ের নিকট কালীদাদার আগমন।

খুবই নাকি উন্নত জীবন। কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া আজ রাত্রে মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। রাত্রি ১১টা পর্যন্ত মা'র সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া, তাঁহারা আশ্রমেই প্রসাদ লইলেন। পরে আবার মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল। মা'র সঙ্গে বেশ খোলা ভাবে কথা কহিলেন।

কবিরাজ মহাশয় মহানিশার ধ্যানের জন্য তিনি এখন চলিয়া যাইবেন; কালীপদবাবু বলিলেন,—'মা আমাকে তাড়াইয়া দিলেন।'

মা বলিলেন—"আচ্ছা বাবা, বেশ বস। এ শরীরের কি? সমস্ত রাত্রি কথা হতে পারে।"

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তোমার কথা ঘুরিয়ে নেও।"

কমল ও কান্তিভাই মা'র কাছে আসিয়া কালীপদ বাবুর কথা বলিল। তিনি নাকি মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া খুবই মুগ্ধ হইয়াছেন। বারবারই নাকি মা'র কথা বলিতেছেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

আজ সকালে শ্রীঅনিল চন্দের স্ত্রী শ্রীমতি রাণীচন্দ মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনিও কালীপদ বাবুর ভক্ত। কালীপদ বাবুই মা'র নিকট তাঁহাদের পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শুনিলাম কালীপদ বাবুকে খুব শ্রদ্ধা করেন।

আজ ভাগবৎ জয়ন্তীর পূর্ণাহুতি। বৃন্দাবন হইতে শ্রীনাথ শাস্ত্রী আসিয়াছেন পাঠ করিবার জন্য। রমার আত্মীয়-স্বজনও অনেকেই আসিয়াছেন।

আজই বেলা ৩টায় মা এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেলেন। বিন্দু তাহার মোটরে মাকে নিয়া গেল। মোটরে মা'র সঙ্গে গেল পরমানন্দ স্বামী ও বুনি আর উদাস। আর সব ট্রেনে গেল।

এলাহাবাদে ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রমে পূজার পূর্বে তিন দিনের জন্য বিশেষ প্রার্থনা সহকারে মাকে তাহারা নিয়া যায়। এবারও

গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা কল্যাণী মাকে বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়া পত্র দিয়াছিল। বিন্ধ্যাচলে আসিয়াও তাহারা মাকে প্রার্থনা জানাইয়া গিয়াছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

আজ সকালে সর্দারজী ও নন্দারা সকলে মা'র নিকট এলাহাবাদ গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলেন।

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

আজ মা সন্ধ্যার সময় এলাহাবাদ হইতে মোটরে বিন্ধ্যাচল আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আগামী ২২শে কাশী আসিবেন।

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

আজ বৈকালে মা কাশী আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে বেবী, শোভনা প্রভৃতি আসিয়াছে। আগামী পরশু স্বামী অখণ্ডানন্দজীর তিরোধান তিথি। সেই উপলক্ষেই মা আসিয়াছেন।

রাত্রিতে দশটার পরে হঠাৎ শুনা গেল বিদ্যাপীঠের ছোট একটি ছেলে রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল। শৈলেশ ও আরো কয়েকজন এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিল। মা'রও

শোয়া হইল না। রাত্রি প্রায় ১॥০ টার পরে ছেলেটিকে পাওয়া গেল, তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে মা'র প্রায় ২॥০টা বাজিয়া গেল।

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

আজ সন্ধ্যাদেবী মার ভোগ দিতেছেন। মায়ের ভক্তদের অনেকেই আশ্রমে প্রসাদ পাইলেন।

রাত্রি ৯টার পর কালীবাবু মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি গেলেন রাত্রি ১॥০টার পর। আজও মা'র শুইতে শুইতে প্রায় ৩টা বাজিয়া গেল।

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

আজ অখণ্ডানন্দজীর তিথি উপলক্ষে আশ্রমে পঞ্চাশ জন সাধু ভোজন করান হইল।

ভাণ্ডারার পরে মা আজই বেলা তিনটায় বিন্ধ্যাচল গেলেন। ২৮।২৯ পর্যন্ত সেখানে মা'র যদি একটু বিশ্রাম হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

সংবাদ পাইলাম, কলিকাতা হইতে সতী, অনিল, রাহুল ও ডাঃ সর্বাধিকারী প্রভৃতি মা'র নিকট গিয়াছেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

আজ পটল সর্দারজীর সঙ্গে বিন্ধ্যাচল গিয়াছিল। তাহার মুখে শুনিলাম মা'র আগামী পরশু কাশী আসার কথা।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

আজ মা কাশী আসিলেন। সঙ্গে অনেকেই আসিয়াছেন।

৮ই অক্টোবর ১৯৫৯।

মা এখানেই আছেন। মা'র বিশ্রাম হইতেছে।

১৯শে অক্টোবর ১৯৫৯।

মা'র শরীর একপ্রকার চলিতেছে। মাথার আওয়াজটা মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। কবিরাজ মহাশয় মাঝে মাঝে মা'র নিকট আসেন।

২৬শে অক্টোবর ১৯৫৯।

রাত্রি প্রায় ১১॥০টা। আমরা অনেকেই মা'র ঘরে। এমন সময় খুব কড়া ধুপের গন্ধ পাওয়া গেল। সকলেই অনুভব করিতে পারিল। মা সকলকে একটু চক্ষু বুজিয়া বসিতে বলিলেন।

২৮শে অক্টোবর ১৯৫৯।

কাবরাজ মহাশয় মা'র নিকট বসিয়া আছেন। আমরাও কেহ কেহ আছি। বিশেষ কথা হইতেছিল, নানান সম্প্রদায় নিয়া। মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন,—"দেখ বাবা, কি চমৎকার! বাজিতপুরে যখন জানকী বাবু বলেছিল—রমনীবাবুকে পরিবর্ত্তন করুন ত!

এই শরীরের ভাবটা যেন তখন কি রকম। শরীরে কাপড়ও সবটা নাই। এদিকে এরা ঘোমটা ছাড়া কখনো দেখে নাই। কিন্তু লজ্জা বা সঙ্কোচের কোন ভাবই নাই।

একটি ঘটনা।

সেই সময় ভোলানাথের ব্রহ্মরন্ধ্র স্পর্শ করা হ'ল। তৎক্ষণাৎ-ই পরিবর্ত্তন। একেবারে স্থির উর্দ্ধ-দৃষ্টি।

তিনি সারাদিন ঐভাবে বসে রইলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসে। এই শরীরও একভাবে বসিয়া। তাহার ভাই-পো আশু স্কুল হইতে আসিয়া এইভাবে ভোলানাথকে দেখিয়া কান্নাকাটি, জানকী বাবুও তখন হাত জোড় করিয়া বলিল,—"কি জানি কি হইয়া যায়। আপনি আবার ঠিক করিয়া দিন।" তখন আবার সেই মন্ত্রের স্পর্শের দ্বারাই ভোলানাথকে ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। ভোলানাথ পরে বলিলেন—"আমি অজ্ঞান হই নাই। তবে কী একটা যেন অসীম আনন্দের আস্বাদ করিতে পাইতেছিলাম।"

মা অনর্গল এই সব কথা বলিতেছিলেন।

৩০শে অক্টোবর ১৯৫৯।

মা কন্যাপীঠের ছাদে বসিয়া আছেন। অনেকেই মা'র দর্শনে আসিয়াছে। মা বলিলেন,—"হাত তালির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?"

অনেকেই স্পষ্ট শুনিতে পাইল। মা বলিলেন,—"এ রকম হয়। মেয়েরা কীর্তন করছে। এইমাত্র অন্নপূর্ণার আরতি শেষ হ'ল। এই সময় এরা অনেক সময় আসেন।"

৩১শে অক্টোবর ১৯৫৯।

আজ আশ্রমে কালীপূজা। মা আজ এতদিন পরে নীচে নামিলেন। ভক্তেরা সকলেই মাকে সকলের মধ্যে পাইয়া খুবই আনন্দিত।

২রা নভেম্বর ১৯৫৯।

আগামী কাল মা'র হাজারীবাগ যাইবার কথা। সেখানে ১দিন থাকিয়া কলিকাতা যাইবেন। আমরা সোজা কলিকাতা চলিয়া যাইতেছি।

একটি বিচিত্র ঘটনা।

আজ রাত্রে একটি মৌনী সাধু মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ মা'র কাছে শান্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। তাহার পর দাঁড়াইয়াও একদৃষ্টে মা'র দিকে তাকাইয়া ছিলেন। মা-ও চৌকি হইতে নামিয়া, চৌকির কোণায় একভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মা'র চেহারায় একটু অস্বাভাবিক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ সময় এইভাবে কাটিবার পর সাধুটি নিজের গলা হইতে মালা খুলিয়া মা'র গলায় পরাইয়া দিলেন। সকলেই এই দৃশ্য দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল।

৩রা নভেম্বর ১৯৫৯।

আজ দুপুরে আমি, দিদিমা, যোগীভাই প্রভৃতি অনেকেই কলিকাতা রওনা হইলাম। মা'র রাত্রির গাড়ীতে হাজারীবাগ রওনা হইবার কথা। জগন্নাথ রায় মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে মা সেখানে তাঁহাদের মন্দিরে যাইতেছেন।

৫ই নভেম্বর ১৯৫৯।

আজ সন্ধ্যায় মা হাজারীবাগ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমরাও গতকাল সকালেই পৌঁছিয়াছি।

৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।

আজ স্থানীয় বহু লোকের আহ্বানে মা কলিকাতার কয়েকটি বাড়ীতে গেলেন। দ্বিজেন নাগের বাড়ী, বিনয় সেনের বাড়ী, গঙ্গাচরণ বাবুর বাড়ী প্রভৃতি। দুপুরে বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে মা'র ভোগের ব্যবস্থা হইল। রাত্রি প্রায় ৮টায় মা ফিরিলেন।

৮ই নভেম্বর ১৯৫৯।

কলিকাতায় সংযম সপ্তাহ।

আজ সকাল হইতে সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হইল। প্রায় তিন শতাধিক ব্রতী হইয়াছেন। নানা স্থান হইতে অনেকেই আসিয়া যোগ দিয়াছেন। গঙ্গার তটে আশ্রমের মধ্যে প্যাণ্ডেলটি খুবই মনোরম হইয়াছে।

পরশু রাত্রে আমরা মা'র ঘরে কেহ কেহ বসিয়া আছি। কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন যে বিনয় ব্যানার্জীর বাড়ীতে একজন গরীবের স্ত্রী অনেক কান্নাকাটি করিয়া মার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। সে তাহার কোন পরিচিত লোকের নিকট মা'র একখানি ছবি দেখিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পূজার আসনে বসাইয়াছিল।

সে একদিন স্বপ্নে দেখিল যে মা আসিয়া তাহাকে একটি মন্ত্র জপ করিবার জন্য বলিতেছেন। সেদিন মা'র নিকট আসিয়া ঐসব কথা বলিল। মন্ত্রটি কোনও বিখ্যাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অষ্টাক্ষর মন্ত্র। সব মন্ত্রগুলি সে বলিলে, মা বলিলেন,—"তুমি যাহা পাইয়াছ, তাহাই কর।"

কাহার ভিতরে কি সংস্কার আছে, তাহা কে বলিতে পারে।

আর একজন ভদ্রলোক, নাম নৃপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সস্ত্রীক মা'র নিকট আসিয়াছেন। তিনি কথায় কথায় বলিতেছিলেন যে তাহার পূর্ব দিন স্ত্রীর খুব জ্বর ছিল। সেই জ্বর লইয়া তিনি মা'র নিকট আসিতে পারিতেছিলেন না। এই জন্যই তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—"মা, তুমি যদি সত্য সত্য-ই মা হও, তবে যেন এ ভাল হইয়া যায়।"

অন্তর্যামিনী মা।

আশ্চর্যের বিষয় সেই দিনই তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল।

১১ই নভেম্বর ১৯৫৯।

আজ সকালে নীচে যাইবার সময় মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছিলেন, যে কাল ধ্যানের পরে মাকে কেহ বলিতেছিলেন যে মা-ও কি ঐ সময় ধ্যান করেন?

মা তাহাকে হাসিতে হাসিতে উত্তর দিয়াছিলেন,—"তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সময়ও যা, আবার তোমাদের কাছে চোখ বুজে বসে থাকার সময়ও সেই একই রকম।"

আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি লইয়া আমরা খেলা করিতেছি।

কথা হইয়াছে যে আমি সপ্তাহের পরে আগামী সোমবার সোজা বম্বে যাইব, মা জামসেদপুর হইয়া পরে বম্বে আসিবেন।

১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।

আমাদের সোজা বম্বে পাঠাইয়া মা আজ জামসেদপুর রওনা হইলেন।

২১শে নভেম্বর ১৯৫৯।

মা'র বম্বে আগমন।

মা জামসেদপুর হইয়া আজ বম্বে পৌঁছিলেন। ভাইয়ার বাসার বাগানে মা'র থাকিবার জন্য একটি কাঠের মন্দিরের মত তৈয়ারী করা হইয়াছে। মা আসিয়া সেইখানেই উঠিয়াছেন।

ভাইয়ার জন্মদিন উপলক্ষে, সন্ন্যাস আশ্রম ও প্রেমকুটিরের সাধুদের ভিক্ষা দেওয়া হইল। সকলকে বস্ত্র এবং প্রণামীও দেওয়া হইল।

৩০শে নভেম্বর ১৯৫৯।

মা এখানে (বম্বেতে) ভালই আছেন। নিয়মিত সৎসঙ্গ প্রভৃতি চলিতেছে। ইতিমধ্যে একদিন মাকে সন্ন্যাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর মহেশ্বরানন্দজী বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাঁহার আশ্রমে নিয়া গেলেন। আর একদিনও তিনি নিজে সঙ্গে করিয়া যেখানে নূতন আশ্রম করিবেন স্থির করিয়াছেন, সেইখানে নিয়া গেলেন।

প্রেম কুটিরেও মাকে একদিন সেস্থানের সাধুরা নিয়া গিয়াছিলেন।

প্রত্যহই সৎসঙ্গে মা আসিয়া বসেন। সন্ধ্যায় কীর্তনের পরে বিষ্ণু আশ্রমজী নামে একজন দণ্ডীসাধু প্রবচন করেন। ইনি কাশী হইতেই মা'র সঙ্গে আছেন। এইসব কারণে সকলে বেশ আনন্দেই আছেন। সন্ন্যাস আশ্রমের মোহন্ত বাসুদেবানন্দজীও একদিন প্রবচনের সময় বলিলেন যে মাতাজী এই ভিলেপার্লেতে আসাতে ইহা যেন কৈলাশপুরী হইয়া উঠিয়াছে। বায়ুমণ্ডলই যেন পবিত্র হইয়া গিয়াছে।

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৫৯।

আজ মা আহমেদাবাদ রওনা হইলেন। পূর্বেই স্থির হইয়াছিল যে ৭ই ডিসেম্বর হইতে কান্তিভাইয়ের জন্য তাঁহার স্ত্রী ভাগবৎ সপ্তাহ করিবেন। সেই উপলক্ষেই মা যাইতেছেন। আজ কান্তি ভাই নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর মা আজই প্রথম তাঁহার বাড়ীতে যাইতেছেন।

৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৯।

মা আজ আহমেদাবাদ পৌঁছিলেন। ঠাকুরভাই, লীলাবেন, কুন্দনবেন প্রভৃতি সকলে মিলিয়া ভাগবৎ সপ্তাহের প্রস্তুতি করিয়াছেন। সব দিক দিয়া ব্যবস্থা খুবই সুন্দর হইয়াছে। মা'র সঙ্গে আমরা প্রায় ৪০জন আছি।

আহমেদাবাদে মা।

নলিন ভট্ট নামীয় একজন বম্বের প্রফেসর ভাগবৎ পাঠ করিবেন।

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৯।

আজ মাকে ঠাকুর ভাইয়ের মেয়ে বীণা নিজেদের জমিতে নিয়া গেল। সেখানে নব-চণ্ডীর পূজা-যজ্ঞ চলিতেছে। মাকে সকালে এবং বৈকালে দু-বেলাই সেখানে নিয়া যাওয়া হইল। ঠাকুর ভাইয়ের এখানে বাড়ী তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা আছে। তথা হইতে ঠাকুর ভাই মাকে তাঁহার ভগ্নীর বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তথা হইতে মাকে পুরুষোত্তম ভাইয়ের বাসায় নিয়া যাওয়া হইল। এইসব স্থান ঘুরিয়া মা কান্তিভাইয়ের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

এখানে আসার পর হইতেই সৎসঙ্গের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিষ্ণু আশ্রমজী সঙ্গেই আছেন। তিনি নিয়মিত ভাবে প্রবচন দেন। রাত্রি ৯টায় মৌন শেষ হইলে সকলে মা'র সঙ্গে বার্তালাপ করেন। মা'র বাণী শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ ভরে সকলে বসিয়া থাকেন। দিন দিন ভীড়ের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাকে বিশ্রাম দেওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৯।

কান্তি ভাইয়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে মাকে তিনি আরও একবার উৎকণ্ঠেশ্বর যোগাশ্রমে নিয়া যান। কিন্তু তাঁহার জীবনে তাহা আর হইয়া ওঠে নাই। তাই এবার কুন্দনবেন ও তথাকার ট্রাষ্টীগণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় মা আজ উৎকণ্ঠেশ্বর রওনা হইলেন।

উৎকণ্ঠেশ্বরে মা।

কথা হইয়াছে মা ১৯শে ডিসেম্বর এখানে ফিরিলেন। কারণ ২১শে ডিসেম্বর কান্তিভাইয়ের মৃত্যু তারিখ, সেইদিন সকলের অনুরোধ মা যেন এখানে উপস্থিত থাকেন। তাহার পরের প্রোগ্রামও কিছু কিছু স্থির হইয়াছে। মা ১৯শে এখানে ফিরিয়া ২২শে চান্দোদ ভীমপুরা আশ্রম রওনা হইবেন। সেখান হইতে কাশী বিন্ধ্যাচলের দিকে রওনা হইবার কথা।

এই বিশ্রামহীনতার জন্য মা'র শরীরটা মোটেই ভাল যাইতেছে না। মাথার শব্দটাও প্রায় তিন বৎসর যাবৎ চলিতেছে। নাড়ীর গতিও মধ্যে মধ্যে খুব খারাপ হইয়া শরীর যেন চুপ হইয়া যায়। মা অবশ্য বলেন,—"এই শরীরের সেজন্য কোন অসুবিধাই নাই।" এই নিয়াই চলিতেছেন। বাহিরে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। মা'র শরীরের জন্য অনেকেই জপ ইত্যাদি করিতেছে। হরিবাবাও প্রায়ই মা'র শরীরের জন্য অনুষ্ঠানাদি করান। কি হইবে মা-ই জানেন। কিছুদিন যাবতই মধ্যে মধ্যে মা'র কোন কোন কথায়, মা'র জন্যই একটা চিন্তা ভয় আমাদের লাগিয়াই আছে। মা'র চরণে প্রার্থনা করা ছাড়া আর তো আমাদের কোন উপায় নাই।

১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৯।

মা আজ সন্ধ্যায় উৎকণ্ঠেশ্বর হইতে আহমেদাবাদ ফিরিয়া আসিলেন। শুনিলাম পথে মধুকরের ভাবী শ্বশুরালয় এবং আরও ২।১ স্থানে মা ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

২০শে ডিসেম্বর ১৯৫৯।

আজ সকালে মা বাহির হইয়া প্রথমে ভরতজীর আহ্বানে গোঁশালায় গেলেন। এই গোঁশালা মহাযজ্ঞের সময় কান্তিভাই ও মুকুন্দভাই ঘিয়ের জন্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন তাহা মুকুন্দভাই চালাইতেছেন। এই স্থান হইতেই এখনো তিনি কাশীতে যজ্ঞের জন্য, মা'র জন্য ঘি পাঠাইয়া দেন। ভরতজীই গোঁশালার সেবক। সে কত আগ্রহে সকলকে মা'র গোঁশালায় আগমনের সংবাদ দিয়া, মা'র আসন সাজাইয়া রাখিয়াছে। মা যাইতেই দেখা গেল, সে মগ্ন হইয়া কীর্তন করিতেছে। তাহার কত আনন্দ! মা পৌঁছিতেই সপরিবারে মাকে মালা-চন্দন দিয়া আরতি করিল, পরে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিল।

সেখান হইতে মা মুকুন্দ ভাইয়ের বাড়ীতে গেলেন। আজ ঐখানেই মা'র ভোগ হইবে। মা'র সঙ্গীয় সকলেই ঐখানে প্রসাদ পাইবেন। পরে মা'র ভোগ ও বিশ্রামের পর বৈকালে মাকে নিয়া মুকুন্দ ভাই, চিনুভাই প্রভৃতি, অজিত ভাই ও ললিতা বেনের বাড়ী হইয়া কান্তি ভাইয়ের বাড়ীতে ফিরিলেন। সর্বত্রই বহু লোক একত্রিত হইয়া মাকে মালা-চন্দনে সাজাইয়াছে, মা'র পূজা করিয়াছে। মা যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই যেন একটা বিরাট উৎসব লাগিয়া গিয়াছে।

পরে সন্ধ্যার সময় মাকে ঠাকুর ভাই তাহাদের মহেশ্বরী মিল দেখাইতে নিয়া গেলেন। এইখানে প্রতি মাসে দেবীর পূজা করা হয়। আজিও যজ্ঞ-পূজা চলিতেছিল, তাহারই পূর্ণাহুতির সময় মাকে নিয়া যাওয়া হইল। সেখান হইতে মা উর্মিলার শ্বশুর বাড়ী ঘুরিয়া মুকুন্দ ভাইয়ের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। রাত্রিতে মা সেখানেই রহিলেন।

২১শে ডিসেম্বর ১৯৫৯।

আজ কান্তি ভাইয়ের মৃত্যু-তারিখ। ঐ উপলক্ষে ভোর ৫টা হইতেই কীর্তন, সম্পূর্ণ গীতা-পাঠ এবং অন্যান্য পাঠাদি চলিতেছে। পরে সাধু-ভোজন, দরিদ্র ভোজন প্রভৃতিও হইল।

২২শে ডিসেম্বর ১৯৫৯।

আজ অল্প সময়ের জন্য মাকে উষা কালী মন্দিরে নিয়া যাওয়া হইল। কান্তি ভাই প্রায়ই এই মন্দিরে আসিতেন। সেখান হইতে মা অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন।

আজ মা রওনা হইয়া যাইবেন। সংবাদ পাইয়া মা'র কাছে বহু লোক আসিতে লাগিল। আজ ভীড় যেন আর সামলান যাইতেছে না। বেলা প্রায় পৌনে তিনটায় মা বরোদা রওনা হইলেন। বরোদার এক ভক্তের আহ্বানে একরাত্রি তারকেশ্বরের মন্দিরে থাকিয়া ২৩শে ভোরে চান্দোদ রওনা হইবেন।

তারকেশ্বরের মন্দিরে মা উপস্থিত হইলে দেখা গেল সেখানে প্রায় ৩০০০ লোক মা'র দর্শনের জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

আমি আহমেদাবাদেই আছি। কথা হইয়াছে আমি ২৭শে বরোদা গিয়া মা'র সঙ্গে মিলিত হইব। তাহার পর সকলের বৃন্দাবন যাইবার কথা।

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৫৯।

আজ সকালে আমরা মাকে লইয়া বৃন্দাবন আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম।

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫৯।

হঠাৎ আজ দুপুরেই আমরা মা'র সঙ্গে কাশী রওনা হইলাম। পূর্বে কথা ছিল এখানে হয়ত দিন কয়েক থাকা হইবে, কিন্তু ঠাণ্ডা খুব বেশী হওয়ায় এবং মা'র শরীরের অসুস্থতার জন্যই এইরূপ ভাবে হঠাৎ কাশী যাওয়া স্থির হইল।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৯।

আজ শেষ রাত্রে আমরা তুফান এক্সপ্রেসে মোগলসরাই আসিয়া পৌছিলাম। মা হয়ত ২।১ দিনের মধ্যেই বিন্ধ্যাচল যাইবেন।

১লা জানুয়ারী ১৯৬০।

আজ বেলা প্রায় চারটার সময় মা সামান্য কয়েকজনকে লইয়া বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন। আমি কাশীতেই রহিলাম।

৫ই জানুয়ারী ১৯৬০।

আজ সকাল ১০॥০টার সময় মা হঠাৎ বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী আসিয়া উপস্থিত। আবার বেলা ১টায় রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে আমি এবং দিদিমাও চলিলাম। সঙ্গে বিজয়নগরের জিপে কেশবানন্দ ও মেয়েরাও কয়েক জন গেল।

আজই সকালে এলাহাবাদ হইতে পরমানন্দ স্বামী ও জিতেনদাদা আসিয়াছিলেন। তাহারাও মা'র সঙ্গে বিন্ধ্যাচল গিয়াছেন। মাকে সেখানে পৌঁছাইয়া তাঁহারা আবার এলাহাবাদ ফিরিয়া যাইবেন।

আমরা বিন্ধ্যাচলে আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই মা আবার স্বামিজীও জিতেনদার সঙ্গে এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেলেন। আজ রাত্রিটা সেখানেই থাকিবেন।

কাশী হইতে ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্ত মা'র নিকট আসিয়াছিলেন। মা তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন।

৬ই জানুয়ারী ১৯৬০।

মা প্রায় ১১॥০টায় বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে জিতেনদাদা, রেণুর মা ও গণেশ সেনগুপ্তের মেয়ে বিভাও আসিয়াছে।

মা'র আজকাল ভাবের বিশেষ একটু পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। কাল বিকালে এলাহাবাদ যাইবার সময় মাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম সঙ্গে অন্ততঃ একজন মেয়েকে নিবার জন্য। কিন্তু মা কিছুতেই কোনও মেয়েকে সঙ্গে নিলেন না। বলিলেন,—"শরীরটা একটু যদি ঠিক হয় তবে আবার পূর্বের মতই নিজেই খেয়ালে চলাফেরা করা—অবশ্য যদি খেয়াল হয়। কাহারো অপেক্ষা না করা।"

এখানেও মা কাশী হইতে কোন মেয়েকেই সঙ্গে আনেন নাই। সামান্য ২।১ জন মাত্র আছে।

৭ই জানুয়ারী ১৯৬০।

মা নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া আছেন। ঘরে রেণুর মা, বিভা, পানু ও আমরা বসিয়া আছি। হঠাৎ মা নিরোজদার কথা উঠাইয়া বলিতেছেন,—"ছাখ দিদি, বিন্ধ্যাচলে আসিবার ২।১ দিনের মধ্যেই দেখিতেছি, এই স্থানে ঘরের মধ্যেই (মা'র চৌকির একটু দূরে নির্দেশ করিলেন) নিরোজবাবা হাঁটু ২ খানি একটু উঠাইয়া বসিয়া আছে। এই শরীরের সঙ্গে ২।১টি কথা বলিয়া ভাবে এই বুঝাইতেছে যেন একটু কি কাজ বাকী আছে, তাহা হইলেই সে মুক্ত।"

ভাস্বর-দৃষ্টি মা।

আজ কিছুদিন হয় নিরোজদাদার দেহত্যাগ সংযম সপ্তাহের মধ্যে হইয়াছে। একদিন বেলা ১১।১২টার সময় খাওয়া-দাওয়া করিয়া, কথাবার্তা বলিয়া তিনি গিয়া শুইয়াছেন। রেণুর মা বৈকালে চা দিতে গিয়াছেন, ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া মশারী উঠাইয়া দেখেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

যাহা হৌক মা'র কথা শুনিয়া রেণুর মা প্রশ্ন করিলেন, 'উর্দ্ধগতির কথা কি?'

মা কিছু উত্তর দিলেন না। পূর্বেকার কথাই ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিতেছেন। তখন রেণুর মা যাহা বলিল তাহা এই,—

নিরোজদাদার একমাসের পেন্সন গভর্নমেণ্টের গণ্ডগোলে বাকী পড়িয়া গিয়াছিল। অনেক লেখালেখির পর তাহা দেওয়া স্থির হইল। কিন্তু তাহা আর আনিয়া ওঠা হইতেছিল না। এই পেন্সন আনার কথাটা নিরোজদার মনে মনেই রহিয়া গেল—আনিবার পূর্বেই হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মা বলিয়া উঠিলেন,—"এই কথাই

ত শুনিবার জন্য বারবার বলা হইতেছিল, কিছু আছে কিনা ? এলাহাবাদ গিয়াও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এই কথাই। কিন্তু পরমানন্দ, বিন্দু এবং তোমরা সকলেই বলিলে কোন লেন-দেন নাই। সবই পরিষ্কার।

"আজও এই জন্যই কথা উঠান হইল যে দেখি তোমাদের মুখ দিয়া কিছু বাহির হয় কিনা। রেণুর মা যখন জিজ্ঞাসা করিল উর্ধ্বগতির কথা, তখন কিছুই বলা হইল না। কারণ কথায় ও ভাবে দেখা যাইতেছে, বলিতেছেও 'সংসারের' (বিন্দুরা ও তাহাদের বাড়ীটা চোখের ওপর ভাসিয়া উঠিল)। যেমন আলোর একটা ফোকাস পড়িতে দেখা যায়, সেই রকম আর কি! এই গণ্ডির, এই স্থানটার সকলের নিকট হইতে মুক্ত এই ভাবটা আর কি।"

তখন রেণুর মা বলিল,—"মা, তুমি ত বলিতেছ। আমি এতকাল ইহা বলি নাই যে দেখি মা'র মুখ হইতে আর কি বাহির হয় ?"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"দেখ তামাসা, এই শরীরটার কাছে এই কথা বলিতে আসিয়াছে। ভিতরে ভিতরে এই শরীরটার প্রতি খুব একটা আকর্ষণ ছিল কিনা তাই সংসারের আত্মীয়-স্বজনের কাছে না গিয়া সোজা এই শরীরটার কাছে আসিয়াছে এই কথা বলিতে।"

রেণুর মা বলিল,—"মা, দেহত্যাগের পর বিন্দু সেই টাকাটা নিয়া আসিয়াছে। আমি বলিয়াছি, এটা তোমার বাবার টাকার মধ্যেই জমা দিয়া দেও।"

এই ভাবে আজ অনেকক্ষণ নিরোজদার কথা হইল।

১৩ই জানুয়ারী ১৯৬০।

আজ মা মোটরে আমাদের নিয়া এলাহাবাদ রওনা হইলেন। আমাদের আশ্রমের নিকটেই পাহাড়ের নীচে পুকুরের ধারে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়

একখানা সুন্দর বাড়ী করিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার ছেলে তরুণ কান্তি ও তাঁহার স্ত্রী কয়েকদিন হয় এখানে আসিয়াছেন। একদিন আশ্রমে আসিয়া কীর্তন করিয়া গেলেন। তাহাদের সঙ্গে কীর্তন পার্টিও আছে। তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে মা এলাহাবাদ যাওয়ার জন্য রওনা হইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে গেলেন। তাঁহারা মাকে মন্দিরে নিয়া গিয়া বসাইলেন। মন্দিরে রাধা-গোবিন্দ ও গৌর-নিতাইয়ের ছবি স্থাপনা করিয়াছেন। অল্প সময় বসিয়াই মা এলাহাবাদ রওনা হইলেন। পথে বিন্দু ও পরমানন্দ স্বামিজী মা'র জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রী মায়ের তাঁহার বিন্ধ্যাচলস্থ বাটীতে গমন।

আজ পূর্ণিমার স্নান, আগামীকল্য পৌষ সংক্রান্তির স্নান। এই উপলক্ষে স্থানে স্থানে পুলিশ দাঁড়াইয়া লোক চলাচলের ব্যবস্থা করিতেছে। স্নানার্থী কত লোক পুটলী লইয়া জলস্রোতের মত চলিয়াছে। কত কষ্টই না তাহারা এই জন্য সহ্য করিয়া চলিয়াছে। ভারতের এই দৃশ্য অপূর্ব। কর্তৃপক্ষগণ যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিতেছেন। মা'র মোটর পৌঁছিতেই মেলার যিনি ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক, তিনি আপন কর্মচারীদের নিয়া মা'র দর্শনের জন্য আসিয়া উপস্থিত। তিনি মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আপনার দর্শনের জন্যই আমরা সকলেই এখানে অপেক্ষা করিতেছি।" মা-ও হাত দুই খানি জোড় করিলেন।

প্রয়াগে কুম্ভস্নানে মা।

কিছুক্ষণ পরে মাকে নিয়া আমরা বিন্দুদের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। বিন্দু কিছুদিন হয় মা'র থাকিবার জন্য নিজেদের বাগানের ভিতর একটি সুন্দর বাড়ী তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। মাকে সেইখানেই নেওয়া হইল। আমরা অনেকে বিন্দুদের বাড়ীতেই রহিলাম।

পরমানন্দ স্বামিজী কিছুদিন পূর্ব হইতেই এখানে আসিয়া ত্রিবেণীর

তীরে সকলের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মা'র দিদিমার জন্যও সেখানে ব্যবস্থা হইয়াছে। সৎসঙ্গের জন্যও আসর নির্মিত হইয়াছে।

কথা হইয়াছে মা বিন্দুদের বাড়ী হইতেই তথায় যাওয়া আসা করিবেন। আজ বিকালে মা একবার ওখানে গিয়া ঘুরিয়াও আসিয়াছেন। রাত্রিতে বিন্দুদের বাড়ীতেই থাকা হইল।

অনেক ভক্তগণ মা'র আগমন-বার্তা পাইয়া দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। বিন্দু সন্ধ্যাকীর্তন করিল। ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের স্ত্রী ও মেয়েরা আসিয়া আগামীকল্য মায়ের ভোগ তাহাদের ওখানেই হইবে বলিয়া গেলেন। জ্যোতির্ময়ী দেবী, বাটুদা সকলেই আসিয়াছেন। আগামীকল্য জ্যোতির্ময়ী দেবীর সন্ন্যাস নিবার বিশেষ ইচ্ছা। মা তাহার এই ইচ্ছা জানিয়া তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পাঠাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মহাশয় ও পণ্ডিতদের এই বিষয়ে মতামত জানিয়া পরে সেই অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য।

যাহা হউক বিধি অনুযায়ী আগামীকল্য জ্যোতির্ময়ী দেবী দিদিমার (মুক্তানন্দ গিরিজী) নিকট হইতে সন্ন্যাস নিবেন এই তাঁহার ইচ্ছা। মা আগামীকল্যের কাজের জন্য তাঁহাদের ত্রিবেণীর তীরে ক্যাম্পে পাঠাইয়া দিলেন।

১৪ই জানুয়ারী ১৯৬০।

আজ দুপুরে মা ৺গোপালদাদার আশ্রমে ভোগ নিলেন। মা'র ভোগের পর ভক্তেরাও অনেকেই ঐখানে প্রসাদ পাইলেন। ওখান হইতেই মা ত্রিবেণী তটে চলিয়া গেলেন। পথে বিন্দুদের বাসায় আমি নামিয়া

গেলাম। মা আমাকে বলিলেন,—"বৃষ্টিতে রাস্তা খারাপ আলো ইত্যাদিও এখনো আসে নাই, তোকে এখন নেওয়া হইবে না। পরে ব্যবস্থা ভাল হইলে নেওয়া যাইবে।"

১৫ই জানুয়ারী ১৯৬০।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর সন্ন্যাস।

আজ সকালে কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মুখে শুনিলাম গতকল্য রাত্রিতে জ্যোতির্ময়ী দেবীর সন্ন্যাস হইয়া গিয়াছে। মা তাহার সহিত গঙ্গার তীরে গিয়াছিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া ভোর ৪টায় সকলকে সঙ্গে নিয়া স্নান করিয়াছেন। আজ সারাদিন মা ওখানেই থাকিবেন। রাত্রিতে সৎসঙ্গের পর মা'র এখানে আসিবার কথা।

রাত্রি প্রায় ১০টায় মা ফিরিলেন। কয়েকজন দর্শনার্থী ছিলেন। মা সকলের সঙ্গে কিছুক্ষণ নানান কথাবার্তায় আনন্দ করিলেন। রাত্রি প্রায় ১টায় মা শুইয়া পড়িলেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর সন্ন্যাসের কথাবার্তাও কিছু কিছু হইল। দিদিমার নিকট হইতেই তিনি সন্ন্যাস মন্ত্র নিলেন। নাম হইল সর্বানন্দ।

১৬ই জানুয়ারী ১৯৬০।

আজ বেলা প্রায় ১১॥০টার পর ভোগ সমাপনান্তে মা ত্রিবেণী সঙ্গমে চলিয়া গেলেন। মেয়েরা কেহ কেহ ওখানেই আছে। দিদিমা মা'র

সঙ্গেই যাতায়াত করেন। আজও সৎসঙ্গের পর মা'র ফিরিবার কথা। শুনিলাম ৫টা হইতে কান্তিভাই নারদ ভক্তিসূত্র পাঠ করেন, তার পর কীর্তনাদি হয়। ইহা ৬টা অবধি চলে। পরে আবার ৭॥০ হইতে ৮৷৹ পর্যন্ত সৎসঙ্গ চলে। ইহার মধ্যে অবধূতজীর প্রবচন চলে ১ ঘণ্টা, পরে ৮৷৹ হইতে ৯টা পর্যন্ত মৌন।

১৭ই জানুয়ারী ১৯৬০।

আজ সর্বানন্দজীর সন্ন্যাস উপলক্ষে সাধুদের ভাণ্ডারা হইল। সকলকে বস্ত্রাদিও দেওয়া হইল। তুইজন মণ্ডলেশ্বরও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। মণ্ডলেশ্বর অসঙ্গানন্দজী মা'র কথায় একটু প্রবচন দিলেন। বলিলেন, "আমি ত মা'র সেবা কিছুই করিতে পারি না। মা'র আদেশ পালন করিয়াই একটু সেবা করিতে চেষ্টা করিব।" ভোজনে বসিয়াও মণ্ডলেশ্বরজীরা কথায় কথায় বলিতেছেন—"মার আদেশ পালন করিতেই হইবে।"

আজ মা আমাকেও নিয়া গিয়াছিলেন। বেলা প্রায় ১০টায় আমি ও দিদিমা গিয়াছিলাম। পরে আমাকে আবার সন্ধ্যার পূর্বেই পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন,—"তোকে আজ মেলা দেখাইবার জন্য নিয়া আসা হইয়াছিল। সর্বদা আনা ঠিক হইবে না। এক জায়গায়ই সাবধান মত থাকা ভালো।"

আমিও বলিলাম,—"মা, তুমি যা বল তাই হইবে।"

দিদিমা আজ ক্যাম্পেই রহিয়া গেলেন।

ক্যাম্পেই সকলে মা'র দর্শনে যান। তাই বাসায় আর বেশী লোক থাকে না। মা ফিরিয়া আসিলে রাত্রি ১০॥০টার পরে তাহারাও উঠিয়া গেল।

সম্প্রতি আমরা একখানি নূতন কীর্তনের বই,—'কীর্তন রসস্বরূপ,' বাহির করিয়াছি। বহু নূতন ও পুরাণ গান, স্তবস্তুতি এবং আরও অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বইখানি জনসাধারণের মধ্যে খুবই প্রশংসিত হইতেছে। সকলে উঠিয়া গেলে এই বইখানি আমি মা'র হাতে দিলাম। মা বইখানি নিয়া বসিলেন। বই দেখিয়া চিত্রা কয়েকটি গান বলিয়া বলিয়া দিতেছে, আর মা তাহাতে সুর যোজনা করিয়া গাহিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদের চরিত্র, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস, ইত্যাদি গান খুব করুণ সুরে গাহিলেন। আমরা মাত্র কয়েকজন লোকই ঘরে তখন বসিয়া আছি। আমরা মুগ্ধ হইয়া সে গান শুনিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা শুইয়া পড়িলেন।

১৮ই জানুয়ারী ১৯৬০।

মায়ের শ্রীমুখে কয়েকটি সুন্দর বাণী।

আজও মা ত্রিবেণী তটে ক্যাম্পে চলিয়া গেলেন। সারাদিন সেখানে থাকিয়া প্রায় রাত্রি ৯॥০টায় মা ফিরিলেন। আমরা কয়েক জন মা'র ঘরে আসিয়া বসিলাম। মা কথায় কথায় বলিতেছেন,—"তাঁহার নাম নিয়া পড়িয়া থাক। নিরাশ হইতে নাই। কবে, কোন্ মূহূর্তে তাঁহার কৃপা অনুভব হইবে তুমি তাহা জান না। যত দীর্ঘ সময় তাঁহার নামে দিতে পার সেই চেষ্টা। লোকে বলে ভক্তি হইল যমুনা, কর্ম হইল সরস্বতী, জ্ঞান হইল গঙ্গা—এই ত্রিবেণী সঙ্গম। জ্ঞানীর হইল এক আত্মাই সর্বব্যাপী, দুই কিছুই নাই। একমাত্র আত্মা"—এই ভাবের কথাই আরো কিছু হইল। সিলোন হইতে যে বড় ডাক্তারটি মা'র সঙ্গে কিছুদিন থাকিতে আসিয়াছিলেন, তিনি আজ চলিয়া গেলেন। তার সঙ্গেও গতকল্য রাত্রিতে এই ভাবেরই কিছু কথা হইয়াছে।

একজনের চিঠি আসিয়াছে,—কেহ একজন কাশী আশ্রমের গলির রাস্তা পরিষ্কারের জন্য কিছু টাকা দেন। মা সেই টাকাটা রাস-লীলার জন্য দিয়া দেন। এই কথা প্রসঙ্গেই কাহারও চিঠির উত্তরে মা আমাকে লিখিতে বলিতেছেন,—"রাসেশ্বর ও রাসেশ্বরীর নিকট প্রার্থনা করি তাঁহাদের চরণ-তলে যে আমাদের যাইবার গলি যেন কৃপা করিয়া তিনি পরিষ্কার করিয়া দেন।"

কথাটা খুবই সুন্দর। আমাদের সকলেরই খুব ভালো লাগিল।

২০শে জানুয়ারী ১৯৬০।

আজও মা ত্রিবেণী হইতে রাত্রি ৯॥০টায় ফিরিয়া আসিয়া ঘরে বসিয়াছেন। আমরা কয়েক জন আছি। জয়ানন্দকে উপলক্ষ করিয়া মা কথায় কথায় যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ এই যে,—কাহারও নিকট অপেক্ষা করিতে নাই। উহাকে দেখিলে আনন্দ হইবে। উহার দ্বারা আমার উপকার হইবে, উহাকে না দেখিলে আমার কষ্ট হইবে......ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহাতে প্রকৃত শান্তির আশা কোথায়! বরং ব্যথা পাওয়া স্বাভাবিক—না পাইলেই ব্যথা। এই লক্ষ্য হওয়া চাই। একমাত্র তাঁহাকেই চাই। অর্থাৎ নিজেকেই পাওয়া চাই। নিজেকে নিয়াই নিজে থাকার চেষ্টা। আর মন একদিকে স্থির রাখা চাই। আজ জলের জন্য এইখানে কূয়া কাটিতে আরম্ভ করিলাম, দেখিলাম একটা পাথর পড়িয়াছে। আবার আর এক জায়গায় গিয়া কিছু খুঁড়িলাম, সেখানেও হয়ত কোন বাধা আসিল, ছাড়িয়া দিলাম। এইভাবে কখনো কূয়া কাটিয়া জল পাইবার আশা নাই। পাথর পড়িল, পাথর ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা কর। ঐ এক স্থানেই চেষ্টা কর। নিরাশ হইতে নাই, লাগিয়া থাকা চাই; তবেই ফল পাওয়া যায়। এই জাতীয় আরো কথা হইল।

সাধক জীবনে প্রয়োজনীয় কয়েকটি উপদেশ।

২১শে জানুয়ারী ১৯৬০।

আজিও রাত্রিতে মা নিজের ঘরে আসিয়া বসিলেন। বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন জয়ানন্দ কোথায়? পরে খোঁজ খবর করিয়া জানা গেল যে আজ দুপুরে জয়ানন্দ যায় নাই।

বালেশ্বরী প্রসাদের বাসায় আজ মা'র ভোগ হইয়াছিল। ভক্তরা অনেকেই প্রসাদ পাইয়াছিল। তিনি এবং তাঁহার জামাতা জগদীশ ও নরেশ সস্ত্রীক আসিয়া বিশেষ করিয়া মাকে বলিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। জয়ানন্দও সেখানে গিয়াছিল, কিন্তু না খাইয়াই চলিয়া আসিয়াছে। মা গাড়ী হইতে নামিবার সময়ও সে দাঁড়াইয়াছিল এবং নামিলেই সে মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ সে সকলের সঙ্গে ঘরে আসিয়া বসে, সকলে যখন উঠিয়া যায় সে-ও তখনই যায়। আজ সে অনুপস্থিত বলিয়াই মা জয়ানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আরও মা বলিতেছিলেন,—'কেমন দুপুর হইতেই উহার কথা খেয়াল হইতেছিল যে উহার মনটা ভাল না, খাওয়া হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিবার খেয়াল হইয়াছিল, কিন্তু শেষে খেয়ালটা বন্ধ হইয়া গেল'।

এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল বাড়াইয়া দিতে হয়।

যাক, মা তখনই বিন্দুকে পাঠাইয়া জয়ানন্দকে আনাইয়া নানা কথায় তাহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। মা উহাকে বলিলেন,—'মন খারাপ করিতে নাই। যে যাহা বলিবে বলুক। এই পথে আসিলে আঘাত লাগিবেই। মহাপুরুষেরা তাই বলেন, 'এক গালে চড় মারিলে অপর গাল বাড়াইয়া দিতে হয়।' কত আঘাত আসিবে, মনে করিতে হয় তিনিই আমাকে এই আঘাত দিয়াছেন, আর কেহ কিছুই করিতে পারে না। একবার এক মহাপুরুষকে একজন ভয়ানকভাবে গালাগালি করিয়াছিল, মহাপুরুষ কিছুই বলিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র। একজন সেখানে উপস্থিত ছিল

সে মহাত্মাকে বলিল,—'মহাত্মাজী আপনি এই লোকটাকে যদি একটা চড়ও মারিয়া দিতেন, উহার অনেক পাপ কাটিয়া যাইত। এখন ত ও যাহা করিয়া গেল, উহার ত সর্বনাশ হইয়া যাইবে। এক ত আপনার স্পর্শ পাইলেও উহার অনেক উপকার হইত, দ্বিতীয়তঃ একটু শাস্তি পাইলে পাপ কিছুটা কাটিত।'

মা আবার বলিতেছেন,—'দেখ একটা গাছ যখন ছোট থাকে, কত ভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে হয়, পরে সেই গাছ যখন বড় হইয়া যায়, তাহার শক্তি বৃদ্ধি হয়। তখন তাহার নীচে যদি ছোট গাছ থাকে ঐ বড় গাছটিই ছোট গাছটিকে রক্ষা করে। যেমন ঝড়-ঝাপ্টা যাহাই আসুক বড় গাছটির উপর দিয়াই সব যায়, ছোট গাছটির উপরে আর কোন ধাক্কা লাগে না'।

লোকনিন্দা এ পথের ভূষণ—ধৈর্য এ পথের পাথেয়।

"এই রকম ধৈর্য্য ধরিয়া সবই সহ্য করিবে, আর যতই সহ্য করিবে ততই শক্তি বৃদ্ধি হইবে। শক্তি বৃদ্ধি হইলে নিজের ত উপকার হয়-ই, অপরকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়।"

"কেহ কিছু বলিল, কি কিছু করিল তাহাতে মনে চোট লাগা স্বাভাবিক, কিন্তু তখনই বিচার দ্বারা সব সরাইয়া দিতে হয়। মনে করিতে হয় হয়ত আমার অজ্ঞাতসারেও আমার মধ্যে যে অহংকার ছিল তাহা সরাইবার জন্য তিনি আমাকে আঘাত দিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আমার মনের ময়লা কাটাইয়া দিয়াছেন।

দেখ, বৃক্ষের যখন শক্তি হইয়া যায়, সে বেশ বড় হইয়া যায়, তখন যদি কেহ তাহাকে ধাক্কা দেয়, আঘাত করে, তবে আঘাতকারীরই চোট লাগে বৃক্ষের কিছু হয় না।

এই যে দেয়াল দেখ—এই বলিয়া দেয়ালে কিছু ফুল ছুড়িয়া ফেলিতেই

ফুলগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল—ইহা দেখাইয়া মা বলিলেন,—দেখ দেয়ালের কিছু হইল না ফুলগুলিই ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল।

লোকনিন্দায় বা লোকের কথায় মন খারাপ করিতে নাই। সর্বদা তাহা উপেক্ষা করিতে হয়। দেখ, কবীরজীর কথা আছে,—"একটি লোক ঐ মহাত্মার খুবই নিন্দা করিত। একদিন কবীরজী কাঁদিতেছেন। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ আপনি কাঁদিতেছেন কেন?'

কবীরজী উত্তর দিলেন, 'আমার ধোবী আজ মরিয়া গিয়াছে। ঐ যে লোকটি আমার নিন্দা করিত, সে আমার বড়ই উপকার করিত, সে আজ মরিয়া গিয়াছে। সে সর্বদাই আমার দোষগুলি দেখাইয়া দিত, তাহাতে মনে অহংকার আসিবার সুযোগ হইত না। দ্বিতীয়তঃ যদি কেহ কাহারও নিন্দা করে তবে নিন্দুক যাহার নিন্দা করে তাহার পাপ নিয়া নেয়। তবেই দেখ, ঐ লোকটি সর্বদা আমার পাপ নিয়া আমাকে পরিষ্কার কারত। তাই তাহার জন্য কাঁদিতেছি। সে আমার পরম বন্ধু ছিল।"

এই সব বলিয়া মা বলিলেন,—"এক লক্ষে স্থির থাকিয়া, বাধা বিঘ্নে নিরাশ না হইয়া ধৈর্যের সহিত কাজ করিয়া যাও। শুধু ব্যবসাদারের মত পুনঃ পুনঃ হিসাব না লাগাইয়া নিজের কর্তব্য-কর্ম করিয়া যাও, তবেই প্রকৃত শান্তির আশা।"

২২শে জানুয়ারী ১৯৬০।

আজও বেলা ৫টায় মা ক্যাম্পে গেলেন। একটি জার্মান দেশীয় মেম কিছুদিন হয় মা'র সঙ্গেই ঘুরিতেছেন। তাহার সঙ্গে মা'র কিছু কথাবার্ত্তা হইল। পরে জয়ানন্দের সঙ্গেও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল।

২৩শে জানুয়ারী ১৯৬০।

আজও মা রাত্রি ৯॥০টায় ক্যাম্প হইতে ফিরিলেন। আজও কথায় কথায় কুম্ভ স্নানের কথা উঠিল। মা এবার স্নান করিয়াছেন। মা বলিলেন,—

পূর্ব অর্দ্ধকুম্ভের কথা।

"জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে গঙ্গায় যাওয়া হইল। আর কেমন যেন একটা চটপটে ভাব। খেয়াল হইতেছিল আরও হাটাহাটি করিতে পারি। এই বোধ হয় কুম্ভে চার বার স্নান হইল। হরিদ্বার দুইবার হইয়াছে। এখানে যেবার পান্নালালজী ব্যবস্থা করিয়াছিল সেবার গোপালবাবা, মোহনানন্দ বাবা ছিল, সব এক সঙ্গে যাওয়া হ'ল,—অর্দ্ধকুম্ভ ছিল। তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। (গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী) স্পষ্ট দেখা গেল। নামিয়া স্নান করিতে বলিতেছে। জল ছিটাইয়া মাথায় দিলাম মানিতেছে না। সুবোধ বলিল, একটা জামা ফেলিয়া দিলে হয়ত হইবে। তাহাই করা হইল, কিন্তু তাহাতেও মানিল না। শেষে নামিয়া ডুব দিয়া ওঠা হইল।" এই ভাবের কথা কহিয়া মা একটু চুপ করিলেন। তাহার পরে সকলে একে একে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

২৪শে জানুয়ারী ১৯৬০।

আজ কথায় কথায় জগদীশ ও নরেশ পাণ্ডিয়া বলিল, মেলায় এক সাধু নাকি আগামীকাল মেম সাহেবকে যাইতে বলিয়াছে, সে যোগের বিষয় মেমটিকে কি কি বলিয়া দিবে বলিয়াছে। আজও ইহারা মেমটিকে নিয়া সেই সাধুর নিকট গিয়াছিল। সাধুটির নাকি যোগী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। সাধুটি নাকি বলিয়াছে সকাল সাতটার সময় যাইতে, এক মিনিট দেরী হইলেও হইবে না।

ইহা শুনিয়া মা বলিলেন,—"বেশ ত, খুব ভালো কথা। একটু আগেই গিয়া বসিয়া থাকিও।"

কমলও নাকি এক সাধুর নিকটে গিয়াছিল। সে খেচরী মুদ্রা দেখাইয়াছে। প্রথমে জিহ্বা খুব টানিয়া নিল—প্রথমে হাত দিয়া পরে কাপড় হাতে নিয়া টানিল। পরে মুদ্রা দেখাইল। এই কথায় কথা হইল সাপও ছয় মাস খেচরী মুদ্রা করিয়া থাকে।

মেমসাহেবও কিছু কিছু আসন জানেন শুনিয়া মা ডাকিয়া বলিলেন,— "কাল সকালে আসিয়া আমাদেরও কিছু দেখাও না।"

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যোগের সহিত অন্তরের যোগ থাকিতে হইবে।

তাই ঠিক হইল উপরোক্ত যোগীর নিকট হইতে ফিরিয়া সে কিছু আসন দেখাইবে। মা কথা প্রসঙ্গে ইহাও বলিলেন, "যদি আসন ইত্যাদির সঙ্গে অন্তর্যোগ না থাকে, তবে আসনে শুধু শারীরিক ক্রিয়াই হয়—যেমন লোকে ব্যায়াম করে। তাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু হয় না।" ...ইত্যাদি

মেম সাহেবটি বসিয়া বসিয়া অনেকভাবে আসন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে লাগিল। সে নাকি জিমনাষ্টিকের শিক্ষক ছিল। তাই অনেক ভাবে বলিয়া বলিয়া সব বুঝাইতে লাগিল। ২।৩টি ক্রিয়াও দেখাইল, আবার বলিল অন্য কাহারও উপর এই সব ক্রিয়া দেখাইব।

পুষ্প সেখানেই ছিল। মা বলায় সে মেম সাহেবের কথা মত শুইয়া পড়িল, পরে মেম সাহেবের কথা অনুযায়ী নানাপ্রকার শারীরিক ক্রিয়া করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ করাইয়া মেমটি বলিল,—আমাদের দেশে ইহা শরীর ভাল রাখিবার জন্যই করে, মা যে অন্তর্যোগের কথা বলিলেন তাহার সঙ্গে বড় একটা যোগ নাই।

তাহার দেখান শেষ হইলে মা পুষ্পকে বলিলেন,—'তোমরা যে সূর্য প্রণামাদি কর তাহাও দেখাও'।

পুষ্প তাহা করিতেই মেম সাহেব মহা খুশী। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'চমৎকার! চমৎকার!!'

পরে কথায় কথায় মা'র শরীরে স্বতঃ প্রকাশিত আসনাদির কথা উঠিল। মা বলিতেছিলেন,—'পদ্মাসন, সিদ্ধাসন করিয়া হাঁটুর উপরই মাথা রাখিয়া শরীরের বিশ্রাম হইয়া যাইত, আবার গোমুখী আসন করিয়া তাহার উপর দিয়া মাথা বুক মাটীতে লাগাইয়া কখনো বিশ্রাম হইত, কত বছর তো এই ভাবেই বিশ্রামের সময় কাটিয়াছে। বিছানার সঙ্গে সম্পর্কও ছিল না।' এই জাতীয় কত কথাই না মা বলিলেন।

মা'র শরীরের স্বতঃ প্রকাশিত আসনাদির কথা।

আমিও কিছু কিছু এই জাতীয় সব দেখিয়াছি। তাই আমিও বলিলাম —"দেখিয়াছি, শরীরের যে গ্রন্থির হাড়গুলি তাহা যেন আলগা হইয়া শরীর লম্বা হইয়া যাইত। আবার ধীরে ধীরে শব্দ করিয়া যথাস্থানে হাড়গুলি বসিয়া যাইত। আবার কখনো শরীর একেবারে বলের মত হইয়া যাইত। আমরা ভাবিতাম শরীরে যেন হাড় নাই।"

"কখনো দেখিয়াছি, শুধু ২ হাতের কড়ি আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়া শরীর মাটি হইতে উঠিয়া যাইত। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর ভর দিয়া নানা ভাবে শরীরের নানা ক্রিয়া হইত।"

যাহা হউক এই সব কথা মেম সাহেব শুনিয়া খুবই আশ্চর্য হইয়া গেল। সে তখন বলিতে লাগিল, "আমি মা'র কাছে কি ২।১টা দেখাইলাম। মা'র যাহা শুনিলাম তাহা ত কখনো শুনিও নাই। সত্যই ঐ সব দেখাইয়া আমি খুব লজ্জিত অনুভব করিতেছি।"

এই কথা প্রসঙ্গে মা ইহাও বলিলেন,—"এই সব কিন্তু শ্বাসের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইত। হাত দিয়া ধরিয়া ওঠা, বসা, আসন প্রভৃতি

করিতে হইত না। আর ইহা শ্বাসের গতি অভ্যাস করিয়া হয় না। স্বাভাবিক ক্রমেই হইত।"

বেলা ১২টা পর্যন্ত এই সব লীলাই চলিল। আজও মা বৈকালে মেলায় গেলেন।

২৫শে জানুয়ারী ১৯৬০।

ভক্তের ব্যথা ভগবানের প্রাণে লাগে।

আজ উদাসের মন যেন কি কারণে খারাপ হইয়াছে। তাই মা-ও তাহার মনের ব্যথা দূর করিবার জন্য কত ভাবে আনন্দ করিতেছেন। বহু বার লক্ষ্য করিয়াছি কাহারও মনে কথায় বা ব্যবহারে ব্যথা লাগলে যতক্ষণ তাহার সে ব্যথা দূর না হয় মা'র সোয়াস্তি থাকে না। মা আমাদেরও এইরূপ ব্যবহার করিতে বলেন।

মা আজ মেলায় গেলে যোগানন্দের শিষ্য ক্রিয়ানন্দ ও একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক মাকে ২টি গান করিয়া শুনাইল—

১। কোলে তুলে নে মা কালী।

২। মজল আমার মন ভ্রমরা।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৬০।

বিথু, পদ্মা প্রভৃতি সব কাশী হইতে আসিয়াছে। ললিতা, নির্মল প্রভৃতিও সব এখানেই প্রোফেসারী করে। ইহারা সকলেই কুমারী এবং

খুব সৎ ভাবাপন্ন। সর্বদাই মা'র কাছে যাওয়া আসা করে। মা ইহাদের দেখাইয়া বলিতেছেন—"ইহারা সব এই শরীরটার জন্যই ছিল।"

আমিও বলিলাম,—"তোমরা যে এইরূপ শুদ্ধভাবে এতকাল জীবন যাপন করিতেছ, তারই ফল স্বরূপ আজ মা'র সঙ্গ এই ভাবে পাইতেছ এবং এই কথা তোমাদের লক্ষ্য করিয়াই মা বলিলেন।"

কি কথায় কথায় মা ললিতার নাম প্রথমে 'যোগিনী মা' রাখিলেন। পরে বলিলেন "যোগানন্দি"—এই শরীরটার নামও সঙ্গে রহিল। তাহার ত মা'র এই আদরেই আনন্দের সীমা নাই। চোখে জল মুখে হাসি। এই নামকরণ নিয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিল। ললিতা এই উপলক্ষে আজ মা'র ভোগ দিয়া সকলের প্রসাদের ব্যবস্থা করিল।

আজও মা সন্ধ্যার পূর্বেই রওনা হইয়া গেলেন। কাশী হইতে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও আসিয়াছেন। তাঁহাকেও মা সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। কলিকাতা হইতেও প্রায় ২৫।২৬ জন লোক আসিয়াছেন, তাহাদিগকেও মেলায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

২৮শে স্নান।

এলাহাবাদ কুম্ভ-ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা।

কথা হইয়াছে আজ হইতে মা ওখানেই থাকিবেন। কাজেই বাড়ী প্রায় খালি করিয়া সকলেই মা'র সঙ্গে চলিয়া গেল। ২।১ জনকে নিয়া শুধু আমি রহিলাম। রেণুর মা ও রেণুও রহিল।

মেলাতে আমাদের জায়গায় সৎসঙ্গের জন্য প্যাণ্ডাল করা হইয়াছে। আনন্দের হাট বসিয়াছে। অমাবস্যার স্নান উপলক্ষে মেলায় ভীড়ও বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ আসিয়া বলিতেছে, দিন রাত সর্বত্র ভগবৎ প্রসঙ্গ চলায় এই পবিত্র স্থানের প্রভাবই যেন অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। একে ত এই পবিত্র স্থানে কুম্ভের সংযোগ, তার মধ্যে মা'র সঙ্গের প্রলোভনেও বহু ভক্ত এখানে আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ পান্নালালজীও ম'র সঙ্গ লালসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

২৭শে জানুয়ারী ১৯৬০।

শুনিলাম মা আজ ভোর বেলাতেই গিয়া উষা কীর্ত্তনে বসিয়াছিলেন। সকলেই মাকে নিয়া আনন্দে আছেন। আমি শুধু ঘরে বসিয়া আছি। তবুও তো বুঝিতেছি এই অসুখের পরেও যে এই ভাবে মা'র সঙ্গে আসিতে পারিয়াছি, হাঁটা চলা কিছু কিছু করিতে পারিতেছি, ইহা-ত মায়ের কৃপাতেই সম্ভব হইয়াছে।

বিন্দুর বাবার কিছু দিন হয় দেহত্যাগ হইয়াছে। তাই ইহাদের পরিবারে শোকের ছায়া এখনো যায় নাই। এই সময় করুণাময়ী মা সকলকে নিয়া এইখানে আসায় ইহাদের প্রাণে খুবই শান্তি হইয়াছে। সব ভুলিয়া ইহারা মা'র সঙ্গীয় সকলের যথেষ্ট সেবা করিতেছেন। বিন্দুর মা'র স্বভাব অতি চমৎকার। ইহার নাম অচঞ্চলা। মা অনেক সময় বলেন,—"নামে ও স্বভাবে মিলিয়া গিয়াছে, বাস্তবিকই অচঞ্চলা।" সর্বাবস্থায়ই যেন ধীর স্থির।

পৌষ সংক্রান্তির স্নানে কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে গোলমাল হওয়ায়, সাধুরা স্নান করেন নাই। শোভাযাত্রাও বাহির হয় নাই। এই কথায় মা হাসিয়া বলিলেন,—"সাধুদের কাহারও স্নান হইল না। এই শরীরটাই স্নান করিয়া আসিল।" জানিনা ইহার ভিতর কিছু গভীর রহস্য আছে কি না।

২৮শে জানুয়ারী ১৯৬০।

আজ অমাবস্যার কুম্ভ স্নান। বিশেষ স্নান। ভোর ৪টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত স্নানের যোগ। মা ২।৩ দিন পূর্ব হইতেই কুশ, তিল ও হরিতকি স্নানের সংকল্পের জন্য ও কাগজে মন্ত্র লেখাইয়া সকলকে দিয়াছেন। মা'র সব ব্যবস্থাই এইরূপ পূর্ণ।

কুম্ভে আমাবস্যায় স্নান।

শুনিলাম ভোর ৪টা হইতেই ১টী করিয়া পুরুষ সঙ্গে দিয়া স্নানের জন্য

মা দলে দলে মেয়েদের পাঠাইয়া স্নান করাইয়াছেন। সকলেই ভাল ভাবে স্নান করিয়াছে, কোন গোলমাল হয় নাই।

২৯শে জানুয়ারী ১৯৬০।

আজও ট্রাফিক্ বন্ধ। তবুও মা পুলিশের গাড়ীতে করিয়া আজ আমাকে মা'র কাছে নেওয়াইলেন। আমি গেলে মা আমাকে কুম্ভের জল দিলেন।

আজ শান্তানন্দ স্বামী ও মিনিষ্টার নন্দাজী মা'র দর্শনে আসিয়াছেন। নন্দাজী কথায় কথায় মাকে বলিলেন,—'মা গভর্ণমেণ্ট হইতে সাধু-সমাজ একেবারে উঠাইয়া দিবার একটা প্রস্তাব হইয়াছিল। তারপর আমরা বলিলাম, অনেক বাজে লোকের মধ্যে ২।১টা ভাল সাধুও থাকিতে পারে তাই একেবারে উঠাইয়া দেওয়া ঠিক নয় এবং ভাল ভাল যে কয়জন আছে তাঁহাদের খোঁজ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অন্যসকল সাধুদের ভাল হইবার ব্যবস্থা করা হউক। কয়েকজন ভাল সাধু যদি সাধু-সমাজের মঙ্গলের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন তবে হয়ত সুফল ফলিতে পারে। নতুবা মন্দদের সরাইতে গিয়া ভালও সরাইয়া দেওয়া হইবে।' মা এই কথায় হাসিয়া বলিলেন,—'দেখ বাবা! একটা কথা খেয়াল হইয়া গেল, তাই বলিয়া ফেলি। একবার ২ জন বন্ধু বাজারে কিছু কিনিতে গিয়া দেখে ভয়ানক ভীড় ও গোলমাল। তখন তাহারা স্থির করিল, গোলমাল কমিলে বাজার করিবে। এই ভাবিয়া একস্থানে গিয়া বসিয়া রহিল। যখন গোলমাল বন্ধ হইয়া গেল, তখন ২ জনে বাজারে গিয়া দেখে, গোলও নাই, মালও

শ্রীশ্রীমাতৃ দর্শনে শ্রীনন্দা।

নাই।" এই বলিয়া মা হাসিতেই মিনিষ্টার ও উপস্থিত আরো অনেকে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। নন্দাজী বলিয়া উঠিলেন,—'মা একটা বড়ই কাজের কথা বলিয়াছেন। ইহা অতি ঠিক কথা।'

মা আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, সবজি ও শাকের খোসার সঙ্গে নাকি অনেক ভাল জিনিষও চলিয়া যায়। এই কথারও নন্দাজী খুবই সমর্থন করিলেন।

আজ সকালেই কুসুম ব্রহ্মচারী কলিকাতা যাইবার জন্য রেণুদের বাসায় আসিয়াছিল। ২৮শের স্নানের সব ঘটনা তাহার কাছে শুনিলাম।

প্রথমে নাকি মা অনেককেই স্নান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। খানিক পরে পান্নালালজীর আগ্রহে মা তাহাদের সঙ্গে নৌকায় গেলেন। সঙ্গমে গিয়া সকলের মনে পড়িল শ্রীযুক্ত গোপীনাথজীকে ভুলিয়া নিয়া আসা হয় নাই। মা তাঁহাকে নিবার জন্য নৌকা সহ লোক পাঠাইলেন। দেরী দেখিয়া মা নিজেই আবার ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন কবিরাজ মহাশয়কে নিয়া নৌকা চলিয়া গিয়াছে। মা'র সঙ্গে চিত্রা ও পদ্মা আছে। আরও কেহ কেহ আছে। মা কুসুম ও কেশবানন্দজীকেও নিয়া গেলেন। সঙ্গমে গিয়া দেখেন কবিরাজ মহাশয় স্নান করিয়া উঠিয়াছেন। ১২টা অবধি স্নানের যোগ। এখনো ১২টা বাজিতে কয়েক মিনিট বাকী। হঠাৎ মা নাকি জলে নামিয়া ডুব দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। স্নান করিয়া উঠিয়াই নৌকার উপর পা ঝুলাইয়া মা বসিয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া ১ জনের প্রণাম করিবার ও চরণামৃত নিবার কথা মনে পড়িল। সে ঐরূপ করিতেই অনেকেই তাহা করিল। কবিরাজ মহাশয়ও তাহাই করিলেন। ঐ সময় মা'র ভাবও যেন একটু কি রকম দেখা গেল। মা খানিকক্ষণ ঐ ভাবে বসিয়া পরে উঠিয়া কাপড় ছাড়িলেন। কুসুম ব্রহ্মচারীর মুখেই এই সব বিস্তারিত ঘটনা শুনিলাম।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

আজ বসন্ত পঞ্চমীর স্নান। শুনিলাম, মা বড় একটা নৌকা করিয়া সকলকে নিয়া ত্রিবেণীতে গিয়া স্নান করিয়াছেন। এবার অর্দ্ধকুম্ভে ৩ দিনের স্নানেই মা স্নান করিয়াছেন, অথচ পূর্ণ-কুম্ভেও মা কতবার গিয়াছেন, কিন্তু স্নান করেন নাই। আর একবার অর্দ্ধকুম্ভে পান্নালালজী ব্যবস্থা করিয়া মাকে আনিয়াছিলেন। সেবার গোপাল ঠাকুর এবং মোহনানন্দজীও সঙ্গে ছিলেন। সেবারও মা স্নান করিয়াছিলেন।

বসন্ত পঞ্চমীর স্নানে শ্রীশ্রীমা।

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

আজ ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের স্ত্রী ও কন্যাদের বিশেষ আগ্রহে মা তাঁহাদের আশ্রমে সরস্বতী পূজায় গেলেন। পরে বিন্দুদের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কুন্দনবেন উষাবেনের বিবাহ উপলক্ষে মার ভোগ দিলেন। এলাহাবাদের ভক্তদেরও প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

আজ বেলা ২টায় মা মোটর গাড়ীতে কাশী রওনা হইলেন। পথে ঝুঁসিতে প্রভুদত্তজীর আশ্রমে গেলেন। সেখানে শিরমোরের রাজমাতা বিষ্ণুযজ্ঞ করাইতেছেন, তাহা মাকে দেখান হইল। বিষ্ণু আশ্রমজীও মা'র দর্শনে আসিলেন। সন্ধ্যার পরে মা কাশীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের এলাহাবাদ ত্যাগ ও কাশী আগমন।

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

আজ মামুর বাড়ীর দোতালায় প্রবেশ হইবে। এই উপলক্ষে রাজ-রাজেশ্বর নারায়ণ শিলা নিয়াছেন। প্রথমে পূজাদি হইল, পরে মা'র ভোগ ও ভক্তদের প্রসাদ লওয়াও মামুর বাড়ীতেই হইল।

মেলাতে থাকাকালীন মা একদিন বলিয়াছিলেন,—'আগুন দেখিতেছি।' আজ খবর পাইলাম, আমরা চলিয়া আসার পর আগুন লাগিয়া ৯০খানা কুটিয়া জ্বলিয়া গিয়াছে।

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

আজ মামুর দুই ছেলে কানাই, বলাই ও বিদ্যাপীঠের দুইটি ছেলের উপনয়ন হইবে। কাল মামুর বাড়ীতে এই উপলক্ষে কালী পূজাও হইয়াছে।

পৈতা হইয়া গেলে মামুর ওখানেই মা'র ভোগ হইল। ভক্তদের অনেকে প্রসাদ পাইলেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

আজ মা বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন। তথায় আজ হইতেই অমৃতবাজার পত্রিকার তুষার কান্তি ঘোষ মহাশয়ের পুত্র তরুণ কান্তি ঘোষ বিষ্ণুযজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন। পিতা পুত্র দুই জনেই এই সময় মাকে উপস্থিত থাকিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাটুদাই আচার্য্য। মা কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া উপরে আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

বিন্ধ্যাচলে মা।

আমাকে শরীর খারাপ বলিয়া মা ২।৩ দিন পরে আসিতে বলিয়াছিলেন। ১২ই যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে। আমি মা'র আদেশে ১২ই আসিলাম।

প্রায় ৪টায় যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইল। মা-ও তথায় ঐ সময় গেলেন। সব কার্য শেষ করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। শুনিলাম আজ ৩ দিন যাবৎ ওখানে অখণ্ড কীর্ত্তন চলিতেছিল। আজ তাহারও সমাপ্তি। কীর্ত্তন সমাপ্তির জন্য মাকে আরও কিছুক্ষণ বসান হইল। পরে মাকে তাঁহারাই আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

শিবরাত্রিতে মা'র কাশী যাওয়ার কথা হইতেছে। ইহার পূর্ব পর্যন্ত মা'র এখানেই থাকার কথা।

বৃহৎ ভাবের খেলায় মা'রও ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে।

আজ রাত্রিতে কমল ও আমি মা'র ঘরে বসিয়া আছি। কথায় কথায় কথা উঠিল বৃহৎ কোন ভাবের খেলা দেখিলেই মা'র ভাবের কেমন পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এমন কি বৃহৎ জলাশয়, বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড, বহু লোকের সমাবেশ, কোনও বৃহৎ ধ্বনি প্রভৃতিতে মা'র সমাধির মত হইয়া যাইত। এবার এলাহাবাদে অর্দ্ধকুম্ভের সময় এবং আর একবার পূর্ণ কুম্ভের সময়েও বহু লোকের স্নানের আগ্রহের ভাব, চারিদিকে পাঠ কীর্ত্তন, সাধুদের ভাগবৎ প্রবচন—এই সব মিলিয়া সেখানকার আবহাওয়াটাই যখন গম্ গম করিতেছিল, তখনও মা'র ভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন চলিতে-ছিল। তবে নিজেকে নিজেই সামলাইয়া লইতেছিলেন। বাহিরে বিশেষ কোন প্রকাশ ছিল না। এই সব কথায় কথায় মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন

—"তো যদি বল, এই যে শরীর, এমন কি মাথা তালু পর্যন্ত ভিতর হইতে ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছিল। সেঁক দিয়াও গরম করিতে পারিতেছিল না। এই সবেরও ঐ একই কারণ। স্নান যে তিন দিন ধরিয়া হইয়া গেল তাহাও এই ভাবের ভিতরেই।"

এই কথাটা নূতন শুনিলাম। এই জন্যই মা'র অসুস্থতা প্রকাশ পাইলে, ডাক্তারগণ তাঁহার কিছু কারণ খুঁজিয়া পান না। অথচ শরীরের স্বাসের গতি অন্য রকম হইয়া যায়, কখনো চক্ষু বন্ধ করিয়া একেবারে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

যোগদা আশ্রমের ক্রিয়ানন্দজী আসিয়াছেন। কিছু দিন মার কাছে থাকিয়া সাধন ভজন করিবার ইচ্ছা। মা তাঁহার জন্য সব রকমের সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন।

কথা হইয়াছে মা ২৩শে কাশীধাম যাইবেন।

এস্থানে মা কিছুদিন ধরিয়াই আছেন। এখানে স্বভাবতঃই একটা নিস্তব্ধ নীরবতা আছে। সাধকগণ এখানে থাকিয়া খুবই আনন্দ পান। ক্রিয়ানন্দ, জয়ানন্দ (উভয়েই আমেরিকাবাসী) দুই জনেই এখানে বেশ সাধন ভজন করিতেছেন এবং স্থানের খুব প্রশংসা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ ও কালীদা এখানে আসিয়াছিলেন। যাইবার সময় তাঁহারাও বার বার বলিতেছিলেন যে—'যাইতে ইচ্ছাই করে না' ইত্যাদি।

বিন্ধ্যাচল সাধনের অনুকূল স্থান।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

গতকল্য প্রায় রাত্রি ১২ টায় মা'র শরীরের মামাত ভাই নিশিকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় কাশী আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন খবর পাওয়া গেল।

নিশিকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের শরীর ত্যাগ।

ইনি সস্ত্রীক কয়েক মাস যাবৎ মা'র আশ্রমে আসিয়া কাশীতেই ছিলেন। ইহার একটী ছেলে রতি ও ২টী মেয়ে চন্দন ও দীপু বিদ্যাপীঠ ও কন্যাপীঠে আছে। এই নিশিবাবুই বাজিতপুরে মা'র পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিছুদিন যাবৎই ইনি, মা কাছে গিয়া বসিলেই বলিতেন,—"শরীরের যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না, এখন শীঘ্র শীঘ্র মুক্তি দাও"। কখনো বলিতেন, "বিশ্বনাথ যেন শীঘ্র শীঘ্র তাঁর চরণে নিয়া নেন।" কখনো মার হাতখানা ধরিয়া—নিজের মাথায় লাগাইয়া বলিতেন, 'একটু ভাল করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দেও। আশীর্বাদ কর। শীঘ্র শীঘ্র পার কর'। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশ্চর্যের বিষয় মা আজই সকাল বেলা বলিতেছিলেন যে তিনি দেখিতেছেন মা'র চৌকির কাছে শূন্যের মধ্যে নিশিবাবু আসিয়া বসিয়াছেন। শরীরটা ভালই দেখাইতেছিল। পরে জানা গেল মা যখন এখানে ঐসব সূক্ষ্মে দেখিতেছিলেন তখন কাশীতে তাহাকে সৎকার করিতে নিয়া যাওয়া হইতেছিল। ভোলানাথের ভাই যামিনী বাবুকেও যে দেহত্যাগের পর মা সূক্ষ্মে দেখিয়াছিলেন, তাহাও মা বলিলেন যে সে আসিয়াই বলিয়াছিল, 'আমি আসিয়াছি'।

এখানে ক্রিয়ানন্দের ও তার সঙ্গীয় লোকটীর মা'র সঙ্গে রোজই প্রাইভেট কথাবার্ত্তা হয়। নানা বিষয়ে ধর্মপ্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা হয়। যাহার পক্ষে যাহা ঠিক মা তাহাকে তাহাই করিতে বলেন। ইহারা সকলেই আনন্দে আছে—বেশ, সুন্দর ইহাদের ভাব।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

আজ বৈকালে মা কাশী চলিয়া গেলেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

কাশীতে মা'র উপস্থিতিতে শিবরাত্রি !

আজ শিবরাত্রি। শিবরাত্রি মা'র উপস্থিতিতে যেমন হয় তেমনই হইল। দলে দলে মণ্ডলী করিয়া বসা, প্রহরে প্রহরে পূজা পাঠ সবই হইল। কোথাও কুসুম, কোথাও তপন, কোথাও নারায়ণ স্বামী মন্ত্র পড়াইল। মা সারারাতই ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছেন। অতি সুব্যবস্থার মধ্যে পূজা সাঙ্গ হইল।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

আজ ৺নিশিমামার শ্রাদ্ধাদি কার্য গঙ্গার তটে হইয়া গেল। সকলেই তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি মা'র নিকট শীঘ্র শীঘ্র মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাই হইল। মা আজ এটোয়া রওনা হইলেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

আজ অনেককে সঙ্গে লইয়া মা এটোয়ায় পৌঁছিলেন। তথায় মা'র ও তাঁর সঙ্গীদের সেবার ব্যবস্থা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

জয়চাঁদ বাজপেয়ীর বড় ছেলের স্ত্রী বিরাট ভাবে মা'র পূজা করিলেন। নানা প্রকারের মিষ্টি, থালা-বাসনপত্র, খাট বিছানা ইত্যাদি সবই পূজায় সাজাইয়া দিয়াছে। ছোটখাট একটী জিনিষও বাদ যায় নাই—এমন সুন্দর ব্যবস্থা। সিংহাসন তৈরার করাইয়া তাহাতে মাকে বসাইয়া পূজা করিলেন।

এটোয়াতে বাজপেয়ী-দের বাড়ীতে মায়ের পূজা।

আজ রাত্রিতে সৎসঙ্গ হইতে (৯ টার মৌনের পরে) ফিরিয়া আসিয়া কেমন একটা ভাব লইয়া মা শুইয়া পড়িলেন। খাইলেনও না, কথাও বলিলেন না।

রাত্রিতে একটু উঠিলেন। অস্পষ্ট ভাবে বলিলেন, 'শ্বাসের গতি ঠিক নাই।' অতি সাবধানে ২।৩ জনে ধরিয়া বাথরুমে নিয়া গেল। আসিয়া যে শুইলেন একেবারে পরের দিন বেলা ২ টায় উঠিলেন।

২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০।

আজিও শ্বাসের গতি ঠিক হয় নাই। কেমন একটা ভাব। আজ বেলা ৩টায় বাঁধে রওনা হওয়ার কথা। আমারও আজ দেরাদুন চলিয়া যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মা'র অবস্থা দেখিয়া সব বদলাইয়া দেওয়া হইল।

এখানে একটু ছোট আশ্রম করা হইয়াছে। একান্ত স্থান। মাকে একান্ত স্থানে রাখিবার জন্য সেখানে নিয়া যাওয়া হইল। কিন্তু সন্ধ্যা না হইতেই সেখানে বহু লোক একত্রিত হইল। মা, শিব এবং হনুমান মন্দিরের বারান্দায় একটু বসিলেন। আবার গিয়া শুইয়া পড়িলেন। বেশী রাত্রিতে একটু বাহিরে বসিলেন।

মা বলিতেছিলেন,—'হরিবাবা মোটর আলিগড় পাঠাইয়া রাখবে। বাবা অপেক্ষা করিবে, এই শরীরটার-ত ঘর রাস্তার কোন প্রশ্নই নাই, তোমরা পার ত আলিগড় নিয়া যাও। যা হইয়া যায়। এই শরীরের ত কোন কথাই নাই। না হয় বৃন্দাবন নিয়া চল। দোলের সময় বাবা না থাকে, মহাপ্রভু তো আছেন। তোমরা যা ভাল বোঝ কর।' কিন্তু আমরা এই অবস্থায় বাঁধ বা বৃন্দাবন কোথাও যাওয়া সঙ্গত মনে করিলাম না। দিল্লী আশ্রমে এখন যাইয়া পরে যাহা হয় হইবে এই স্থির করিয়া আগামীকল্য সকালে মোটরে দিল্লী যাওয়াই স্থির হইল।

১লা মার্চ ১৯৬০।

দিল্লীতে মা।

আজ মা দিল্লী পৌছিলেন। সকলের দর্শনের জন্য অল্প সময়ই রাখা হইল।

৪ঠা মার্চ ১৯৬০।

পিড়ীতা মা।

আজ ২।৪ দিন হয় মা'র শ্বাসের গতির সঙ্গে সর্দ্দি ও কাশী হইয়াছে। ফলে শ্বাসের গতি আরও খারাপ হইয়া পড়িল। দিন রাত্রি শোওয়া নাই। দর্শনের সময় আরও কমাইয়া দেওয়া হইল। আমরা সকলেই খুব চিন্তিত। এ দিকে মা'র শরীরে কোন চিকিৎসাও চলে না—কিছু করিলে ফল হয় উল্টা। তাই এখন মা'র কৃপাই একমাত্র সম্বল। মা'র জন্য অখণ্ড জপ বসান হইল। অনিল উদ্যোগী হইয়া ১২ ঘণ্টা গীতা পাঠ করিল, রমা বহিন রামায়ণ পাঠ করিল। মা'র শ্বাসের গতি কিন্তু ক্রমশঃ খারাপই হইতে লাগিল

ওদিকে হরিবাবা মা'র যাওয়ার জন্য কত আয়োজন করিয়াছেন। তিনি মা'র অসুখের সংবাদে লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন। মা'র ত এক কথা,—'যা হইয়া যায়।' মাকে জিজ্ঞাসা যদি করা হয়, 'মা কেমন আছ?' মা সর্বদাই উত্তর দিতেছেন 'সব সময়ই ভাল আছি।'

৬ই মার্চ ১৯৬০।

কাল সারারাত মা'র অবস্থা খুবই সংকটজনক গিয়াছে। ঐ অবস্থার মধ্যেও মা সকলকেই মা'র ঘর হইতে নীচে চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন। মাত্র ২।১টী মেয়ে উপরে আছে। কিন্তু মা বলিতেছেন যে একা ঘরেই থাকিবেন। ডাকিলে কেহ গেলেই হইবে। এর মধ্যে আবার আজ ২।৩ দিন যাবৎ দেখিতেছি মা পৌণে নটার ঘণ্টা পড়িলেই মৌন হইয়া যান আর একেবারে পরের দিন বেলা ৯টার পর কথা বলেন। ইহা ছাড়া আবার একা ঘরে রাত্রিতে কখনো কখনো দরজা বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে আরও ভয় হয়। অথচ উপায় ত কিছুই নাই। রাত্রির প্রথম দিকে দরজা বন্ধ করিয়া দিলে, একেবারে শেষ রাত্রিতে দরজা খোলেন।

৭ই মার্চ ১৯৬০।

আজ ভোর ৫টায় হঠাৎ দেখি মা উদাসকে ধরিয়া ধরিয়া আমার নীচের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। মা ঘরে ঢুকিয়া একটা মোড়ার উপরে বসিয়াই অতি মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন,—'হরিদ্বার নিয়া চল।' স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কখন?'

মা—'এখন-ই।'

ট্রেনে কি মোটরে জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন,—'তোমরা যাহা ভাল বোঝ।' আর কিছু বলিলেন না।

মা'র নীচের ঘরে দিদিমা থাকেন। সেই ঘরে মা'র জন্য একটা চৌকিও পাতা আছে। সেইখানে মাকে নিয়া বসান হইল। মা মৃদুস্বরে বলিলেন যে হরিবাবার ওখানে রাসপার্টির জন্য কাপড় তৈয়ার ছিল। ঐসব হরিবাবার ঐখানে লোক দিয়া পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর বস্ত্রাদি ও রাস ইত্যাদির জন্যও টাকা দিতে বলিলেন। এইসব করিয়া বেলা প্রায় ৭টায় রওনা হওয়া হইল। কান্তিভাই মুন্‌সার দেওয়া মোটরে মা'র শুইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হইল। মা, আমি, উদাস ও স্বামিজী মা'র গাড়িতে ও টিহরীর এক গাড়ীতে বিমলা, দিদিমা প্রভৃতি চলিল। বুনি, কৃপাল প্রভৃতিও মা'র সঙ্গে চলিল। মা'র এইরূপ ভাবে হঠাৎ চলিয়া যাইবার খবর অনেকেই জানিল না। ফোনে খবর পাইয়া টিহরীর রাজমাতা ও মহারাণী, মণ্ডির রাজারাণী, সপরিবারে খান্নাসাহেব আসিয়াছেন। সকলেই মা'র এইভাবে চলিয়া যাওয়ায় চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। টিহরীর রাজমাতা আনন্দপ্রিয়া পৌঁছিয়াই, মা'র চরণের নিকট বসিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন,—'মা আমার সব আয়ু নিয়া তুমি ভাল হইয়া ওঠ।' মহারাণী টিহরী দূরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। মা সকলকে ডাকিয়া, তাহাদের নিকট হইতে বিদায় নিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। পথে আগা সাহেবদের সঙ্গেও দেখা হইল।

পীড়িত অবস্থায় মা'র হরিদ্বার আগমন।

যাক্, প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা পর আমরা হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। পথে মা এক বাগানে একটু বিশ্রাম করিলেন। মোটরে মা বসিয়া বসিয়াই আসিয়াছেন। চলার পথেই মা বলিলেন, 'পরমানন্দ, এখন যোগী ভাইয়ের ওখানে যাইও না। নিতাই বহুবার তাহার কনখলের বাড়ীতে যাইতে বলিয়াছিল, এখন ওখানেই চল।'

নিতাই বহুকাল বিপত্নীক। তাহার আর কেহও নাই—একাই কনখলে থাকিয়া সাধন ভজন করে। গঙ্গার তটেই বাড়ী। বাড়ীর নাম 'শান্তি নিকেতন।'

আমরা 'শান্তি নিকেতনে' গিয়া পৌঁছিলাম। নিতাইয়ের ইহা ধারণাতীত। মা যে হঠাৎ তাহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। মা বাড়ীতে ঢুকিয়াই বলিতেছেন,—'বাঃ বেশ আশ্রম আশ্রম লাগিতেছে। সুন্দর জায়গা।' তারপর নিতাইকে বলিতেছেন,—'কি নিতাই! যোগীভাইয়ের ওখানে যাই?' নিতাই হাত জোড় করিয়া বলিল,—'আচ্ছা মা, আমিও বৈকালে যাইব।' একটু পরেই আবার হাত জোড় করিয়া সাহস করিয়া বলিতেছে,—'তবে মা যদি কৃপা করিয়া এখানে থাকেন, মা'র কৃপায় সব ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। বিশেষ কিছু অসুবিধা হইবে না।'

মা হাসিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, তবে থাকি?' নিতাই ত আনন্দে অধীর। তাড়াতাড়ি সে মাকে নিজের পূজার ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে গেল। মা কিন্তু সোজা ওপরে উঠিয়া গেলেন। সিঁড়ি দিয়া মা উদাসকে ধরিয়া ধরিয়া ওপরে উঠিয়া গেলেন। উপরে ছোট একখানি ঘর আছে; ওখান হইতে বেশ গঙ্গা দেখা যায়। মা সেইখানেই থাকিবেন বলায়, সেই ব্যবস্থাই করা হইল।

কনখলে শান্তি-নিকেতনে মা।

যথাসময়ে যোগীভাইকেও খবর দেওয়া হইল। সেইখানে শিবপুরাণ পাঠ হইতেছে। যোগীভাই সন্ধ্যায় আসিলেন। অন্যান্য সকলেও আসিয়া পৌঁছিল।

আজ রাত্রিতে মা'র অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। কি ব্যাপার কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

৮ই মার্চ ১৯৬০।

আজ সকালে মা বলিলেন,—'গতকালই আজ রাত্রিতে যে এইরূপ হইবে খেয়াল হইতেছিল, তাই ভোরেই চলিয়া আসা হইল। যদি বৈকালে আর না আসাই যায়। খেয়াল ছিল এই রাত্রিটা এখানে থাকার।'

কাল রাত্রিতে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কালই সন্ধ্যায় টিহরীর রাজকন্যা শীলা ও জামাতা ধ্রুব আসিয়া উপস্থিত। বলিল, 'বাসায় থাকিতে পারিলাম না, চলিয়া আসিয়াছি।' একটু বেলা হইলে মণ্ডির রাজা-রাণী আসিলেন। তিনি বলিলেন,—'মা'র সঙ্গেই আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দেখিলাম গাড়ীতে জায়গা নাই, তাই আর কিছু বলি নাই'। ইহারা সকলেই, 'মা ভাল হও।' বলিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের পীড়াতে ভক্তগণের ব্যাকুলতা।

এদিকে নারায়ণ দাস বিরলার প্রেরিত এক বৈদ্য নিয়া আসিয়াছেন। মা হঠাৎ হরিদ্বার চলিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া খুব ব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিজের বৈদ্যকে নারায়ণ দাসজীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বলিয়া দিয়াছেন মা'র কাছেই এই বৈদ্য থাকিবে। ঔষধ মা যদি না-ও খান, সর্বদা অবস্থা দেখিয়া বিরলাজীকে সে সংবাদ দিবে।

মা এই সকলকে দেখিয়া বলিতেছেন,—'তোমাদের কত স্নেহ এই শরীরটার উপর। কত কষ্ট করিয়া সকলে আসিয়াছ। আর এই শরীর দিয়া ত কাহারও সেবাই হয় না।' ইত্যাদি……

এই সব কথা শুনিয়া সকলে বলিতে লাগিল,—'মা এই সব কি বলিতেছেন, আপনি ভাল হইয়া উঠুন, ইহাই আমাদের একমাত্র কাম্য।'

আজিও সারা দিন রাত্রি মা'র শ্বাসের গতি খুবই খারাপ চলিল। দিল্লীতেই মা বলিয়াছেন, 'শ্বাস নীচের দিকে যায়-ই না, শুধু উপরে উপরে চলিতেছে।

তাহাও আবার স্বাভাবিক নহে। সাধারণ শরীর হইলে ঐরূপ শ্বাসের গতিতে কি যে হইয়া যাইত বলা যায় না।'

মা এই গতি নিয়াই আজ কয়দিন চলিতেছেন। ইহা নিয়াই হরিদ্বার আসিলেন। রাস্তায় এক একবার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছিল, বলিতেছিলেন। মা'র শরীরে তো কোন কিছু করাই সম্ভবপর নহে। মা নিজে কৃপা করিয়া শরীর রক্ষা করিতেছেন, নতুবা আমরা ত কিছুই করিতে পারি না।

দিল্লীতে একদিন মাকে চুপ করিয়া একটু শুইয়া থাকিতে দেখিয়া চিত্রা প্রভৃতি মনে করিতেছিল মা বুঝি একটু ভাল। কিন্তু পরে মা বলিয়াছেন শ্বাসের গতি এত খারাপ যে মা'র শরীর এলাইয়া পড়িয়া ঐ বিপরীত শ্বাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে ভাবটা এইরূপ তালে তালে চলিতেছিল যেন যা হইয়া যায় দেখিয়া যাইতেছিলেন। কাহারও কিছু করিবারও নাই।

আজ শীলা মাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজি হইলেন না, রাত্রিতে এইখানেই রহিয়া গেলেন। সেও রাত্রি ১২টায় মাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মনে করিল, মা একটু ভাল। কিন্তু তখনো শ্বাসের গতি খুবই খারাপ ছিল। ৪।৫ রাত্রি সমানে বসিয়াই আছেন, বলিলেন, 'আজ শরীরটা এলাইয়া পড়িয়াছিল, আর বাহিরে যেমন বেশী শ্বাসের গতির প্রকাশটা ছিল, তাহা না হইয়া ভিতরে ভিতরে সূক্ষ্মভাবে ঐরূপই চলিতেছিল।'

মা ত পৌনে ৯টায় মৌন হইয়া যান, শুধু দিল্লী হইতে আসিবার দিন সকালে একটু কথা বলিয়াছিলেন।

আজও ইসারায় জানালা দরজা সব খোলা রাখিতে বলিলেন। ইসারাও অতি সামান্য।

৯ই মার্চ ১৯৬০।

আজ বলিতেছিলেন, 'কাল রাত্রিতে শ্বাসের গতি এত খারাপ ছিল যেন চালাইতেই পারা যাইতেছিল না। তাই দরজা, জানালা সব খুলিতে বলা

হইল। তোমরা অক্সিজেন দেও না? সেই রকম আর কি। তবে এই শরীরের কোন কষ্টই নাই কিন্তু। যা হইয়া যায়।'

এইসব শুনিয়া আমরা-ত স্তম্ভিত!

বিড়লাজীর বৈদ্য অনেক প্রার্থনা করিতেছে, 'মা ঔষধ না খাও, সাধারণ খাদ্যের জিনিষ যেমন পিপুল, এলাচি প্রভৃতি দিয়াই একটা তৈয়ার করিয়া দিতেছি, তাহা একটু নেও।' মা বলিতেছেন,—'এখন থাক পিতাজী দরকার হইলে নিব।' অনেক বলার পরে মা বলিলেন,—'আচ্ছা তৈয়ার কর গিয়া, দরকার হইলে নিব।' এই কথা শুনিয়া সে মহানন্দে তৈয়ার করিতে গেল। এমনিতেও পরীক্ষা করিয়া কিছুই পাওয়া গেল না, শুধু শ্বাসের গতি খুবই দ্রুত। বৈদ্য ঔষধ তৈয়ার করিতে গেল, তখন বেলা প্রায় ১২টা। এর মধ্যে মা'র শ্বাসের গতি হঠাৎ স্বাভাবিক হইয়া গেল। আমরা ২।৪ জন ঘরে আছি। মা বলিয়া উঠিলেন, 'দ্যাখ দিদি, বৈদ্য ঔষধ তৈয়ার করিতে গেল আর হঠাৎ শ্বাসের গতি কি রকম স্বাভাবিক হইয়া গেল। এখন যেন আর খুঁজিয়াও পাওয়া যাইতেছে না।' পরমানন্দজীকেও ডাকিয়া দেখান হইল।

আজ ৯।১০ দিনের মধ্যে এই রকমটা আর হয় নাই। আমাদের ত মহা আনন্দ। আমি বলিলাম, 'আর খুঁজিবার দরকার নাই। মা এইবার ভাল হও। খেয়াল করিলেই ত হয়।'

মা বলিলেন,—'বৈদ্য বেচারা কেন পরিশ্রম করিতে গেল, নিষেধ কর।' স্বামিজী ও আমি বলিলাম, 'নিষেধ করিবার দরকার কি? করিয়া আনুক না।'

মা বলিলেন,—'কাল রাত্রেও মাথা ঠাণ্ডা হইয়া সেক দিতে হইল তারপর এই ভালর দিক আসিল।'

বেলা প্রায় ৪টা পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে শ্বাসের গতি একটু খারাপ হইলেও এক প্রকার ভালই রহিল। প্রায় ৪॥০ টায় বৈদ্য দেখিতে আসিল। বিড়লার আদেশে এখনো তিনি এখানেই আছেন। প্রয়োজনীয় সব দেখা শোনা

করিতেছেন। তিনি বলিলেন,—'বিড়লাজীকে সব খবরও দিতে হইতেছে, তাই সব পরীক্ষা করিয়াও দেখিলেন।'

বৈকালে মা বলিলেন,—'পিতাজী সব ঔষধ খাইয়া দেখিতে পারি কিন্তু ফল কি হইবে বলিতে পারি না। দায়িত্ব যদি তুমি নেও তবে বল?'

সে হাত জোড় করিয়া বলিল,—'মা আপনি আশীর্বাদ দিলে পারিব, নতুবা আপনার দায়িত্ব কে নিবে?'

সন্ধ্যার পরে যোগীভাই মণ্ডীর রাজা-রাণী, টিহরীর মেয়ে জামাই প্রভৃতি আসিয়া বসিয়াছেন। বৈদ্যজীও আছেন। তখনও আবার কথায় কথায় ঔষধ খাওয়ার কথা উঠিল। যোগীভাই এবং আমরা সকলেই ঔষধ খাওয়ার বিপক্ষে। বৈদ্যকে আবারও মা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈদ্যজীও ঐ উত্তরই দিলেন। কিন্তু যোগীভাই, মণ্ডী প্রভৃতি সকলেই নিষেধ করিতে লাগিলেন। ২।১ বার কিরূপ বিপরীত ফল হইয়াছে তাহাও বৈদ্যজীকে শোনান হইল। তখন সে আর সাহস করিল না। মা বলিলেন, —'পিতাজী, এর পর ঔষধ দিবার পর বিপরীত ফল হইলে তোমাকেই সকলে মন্দ বলিতে আরম্ভ করিবে। এ শরীর ত তা চায় না যে পিতাজীর উপরে দোষ পড়ে। তুমি ত তোমার ভাব মত ভালর জন্যই করিবে।' আবার বলিতেছেন,—'পিতাজী তুমি কি মন্ত্র জান বল দেখি? সকালেও তুমি চলিয়া যাইবার পরেই শ্বাসের গতি বেশ স্বাভাবিক হইয়া গেল, আবার বিকালেও তুমি দেখিয়া যাইবার পরেই শ্বাসের গতি স্বাভাবিক হইল। তুমি ত পিতাজী মিরাকেল্ দেখাইলে।' সে বেচারা ত হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিল 'মা সবই আপনার আশীর্বাদ।'

ঔষধ প্রয়োগে মা'র শরীরে বিপরীত ফল হয়।

যোগীভাই আজ দক্ষেশ্বর শিব মন্দিরে মৃত্যুঞ্জয় জপ আরম্ভ করাইলেন।

জপ আরম্ভ হইল বেলা প্রায় ১১।১১॥০ টায়। মা হাসিয়া বলিতেছেন দেখ, যোগীভাই ক্রিয়া আরম্ভ করাইয়াছে ১১ টায় আর ১১টা হইতেই শ্বাসের গতিও এতদিন পর কিছুক্ষণ স্বাভাবিক হইল। আবার মণ্ডির রাজা বিশেষ ভাবে মা'র ভাল হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কাল বেশী রাত্রিতেও আসিয়া মা'র খবর লইবার জন্য বসিয়া রহিলেন। বেশী রাত্রে খারাপ হয় শুনিয়া তিনি যাইতে রাজী ছিলেন না। অনেকে বলায় তবে উঠিলেন। আবার মণ্ডীর রাণী বলিতেছিলেন, মা আমি খাওয়া ত্যাগ করিব যদি তুমি ভাল না হও। এখনই করিতাম রাজা সাহেব গোলমাল করিবেন বলিয়া করিতেছি না।

মা সব শুনিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন। এই সব কথাই চলিতেছে। মা আবার বলিতেছেন, তোমাদের আগ্রহেই শ্বাসের গতিটা এইরূপ স্বাভাবিক হইতেছে। ইহা শুনিয়া সকলেই বলিতেছে, 'মা আর যেন খারাপ না হয়'—এই বলিয়া সকলেই বার বার প্রণাম করিতেছে।

এদিকে নারায়ণ দাসজীর ইচ্ছা মাকে সপ্তর্ষি-আশ্রমে নিয়া যান। পূর্বেও একবার এ কথা তিনি জানাইয়াছিলেন। মা নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কয় দিন থাকিলে তোমার আনন্দ হইবে। সে বলিয়াছিল,—'সাত দিন।' সাত দিন হইয়া গিয়াছে। তাই মা আজ বলিলেন,—'আজ ত রাত্রি হইবে। যদি শরীর ঠিক থাকে, তবে আগামীকাল দুপুরে সপ্তর্ষি-আশ্রমে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।'

তাহাই স্থির রহিল। আগামীকাল মা'র সঙ্গে সকলেরই তথায় যাওয়া হইবে। নারায়ণ দাসজী সব ব্যবস্থা করিবেন। শুনিলাম গণেশ গোস্বামীজীর দেহান্তের পর ট্রাষ্টী থাকিলেও নারায়ণ দাসজীর উপরই বিশেষ ভার। সুতরাং তিনিই সব ব্যবস্থা করিবেন.

১০ই মার্চ ১৯৬০।

মা'র সপ্তর্ষি আশ্রমে আগমন।

আজ দুপুরে মা সকলকে নিয়া সপ্তর্ষি-আশ্রমে আসিলেন। নারায়ণ দাসজীই সব ব্যবস্থা করিতেছেন। ইনি খুবই ভাল লোক। যেমন কর্মী, তেমনই ধর্মপ্রাণ। একেবারে খাঁটি লোক। বয়স ৭৪ বৎসর। তাঁহাকে কিছু প্রশংসা করিলে বলেন, "আমার অবস্থা ত প্রায় হইয়াই গিয়াছিল—আমি উঠিতে পারিতেছিলাম না—মা'র কৃপাতেই আজ আবার আমার এই শক্তি।"

মা'র উপর ইঁহার খুবই বিশ্বাস। মা নিজেও ইহার খুব প্রশংসা করেন।

এখানে আসিয়াও মা'র কিন্তু শ্বাসের গতি কিছুতেই স্বাভাবিক হইতেছে না। রাত্রিতে অবস্থা মাঝে মাঝে ভীতিজনকই হয়। মা'র কিন্তু কোন উদ্বেগ বা কষ্ট নাই। বলেন,—'বেশ, এক কীর্ত্তন হইতেছে।' বিরলাজীর বৈদ্য ব্রজলাল ত্রিবেদীও মা'র সঙ্গেই আছেন। তিনিও মা'র শ্বাসের গতি দেখিয়া ভীত হইয়া পড়েন। তিনি বলেন,—'মা কি করিব, আমার কথা ত আপনি স্বীকার করিতেছেন না। আপনার ত কোন কষ্ট নাই, কিন্তু আমাদের ত কষ্ট হয়। আপনি কৃপা করিয়া আমাদের কষ্ট দূর করুন। আমিও আপনার সন্তান—আমাকে আনন্দ দিন...'ইত্যাদি ইত্যাদি।

১২ই মার্চ ১৯৬০।

মা'র অবস্থা প্রায় এক প্রকারই চলিতেছে। রাত্রিতে একটু বিশেষ খারাপ হয়—দিনে একটু ভাল দেখা যায়। এই ভাবেই চলিতেছে।

১৩ই মার্চ ১৯৬০।

আজ দোলপূর্ণিমা। মা বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। একটু বসিয়াই মা ঘরে চলিয়া গেলেন। সকলে মা'র চরণে আবির ও ফুল দিতেছে, মা-ও সকলকে আবিরের ফোঁটা দিতেছেন। মণ্ডির রাজা-রাণী এখানেই একটা কুটিয়া করিবেন। তিনি মাকে তাঁহাদের জমিতে নিয়া গেলেন। ভক্তদের জন্য মা সবই করেন। এই অবস্থা নিয়াও মা একটু সময়ের জন্য তথায় গেলেন।

১৪ই মার্চ ১৯৬০।

আজ হরিবাবা মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। হরিবাবার সঙ্গে সুন্দরলাল পণ্ডিতজীও আছেন।

মায়ের নিকট ব্যাকুল হইয়া শ্রীহরিবাবার আগমন।

এবার বাঁধে দোলের সময় মা'র যাওয়ার কথা স্থির হইয়াছিল। মা'র অসুস্থতার সংবাদ লইয়া কান্তিভাই, কেশব বাঁধে গিয়াছিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল সেখানে নাকি হরিবাবা মাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নানা প্রকারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তারপর কান্তি ভাইয়ের মুখে হরিবাবা যখন মা'র অসুস্থতার সংবাদ পাইলেন, তখনই তিনি সেই সাজাইয়া-তোলা উৎসব ফেলিয়া চলিয়া আসিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার ভক্তদের ত চক্ষু স্থির। উপায়ান্তর না দেখিয়া এক ভক্ত, শ্রীরামেশ্বরজী বলিলেন, তিনি আসিয়া মা'র সংবাদ নিয়া যাইবেন এবং সম্ভব হইলে মাকেও নিয়া যাইবেন। এই বলিয়াই তিনি দিল্লী রওনা হইলেন।

যাহা হউক হরিবাবা আসিয়া দেখেন আজ পর্যন্তও মা'র শ্বাসের গতি

সম্পূর্ণ ঠিক হয় নাই। তাঁহার সঙ্গে কথায় কথায় মা হঠাৎ বলিলেন,—'যদি নিজের না খেয়ালটা আসিত তবে আর এই শরীর দেখিতে হইত না'—এই ভাবেরই একটা কথা বলিলেন। মোদী নগরের মোদীর স্ত্রী-ও আসিয়াছেন। তাহাকেও মা কথায় কথায় বলিলেন—'এবার কেমন যেন শ্বাস ঠিক হউক—এ খেয়ালটা আসিতেই ছিল না। যা হইয়া যায়। পরে কি জানি কেন একটু খেয়াল আসিতেই শ্বাসের গতির একটু পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।' আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি যে মা কৃপা করিয়াই শরীর রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের শক্তি ও ক্ষমতায় আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না।

দুই দিন পরে হরিবাবা চলিয়া গেলেন। মা বিশ্বো, কৃপাল, পুষ্প, বুনি, উদাস, চিত্রা, শোভা প্রভৃতিকে দেরাদুন হঠাৎ পাঠাইয়া দিলেন। মা'র শরীর এত খারাপ, তার মধ্যে ইহাদের পাঠাইয়া দেওয়ায় একটু ভয়ই পাইলাম এই ভাবিয়া যে, মা'র ঠিক মত সেবা হইবে কি ভাবে? আমি ত প্রায় অকর্মণ্য, একটু একটু হাঁটা হাঁটি করিতে পারি মাত্র। তবে চিরদিনই দেখিয়া আসিতেছি মা'র এই নিয়ম। কাহার-ও অপেক্ষা মা রাখেন না। মা'র সব অবস্থাতেই চলে। মাকে একটু বলায় মা বলিলেন,—'দিদি হইয়াই যাইবে, তুই চিন্তা করিস্ না।' তাহাই হইল। দেরাদুনের নরেশের মেয়ে ও পরশুরামজীর মেয়ে মা'র কাছে আসিয়াছে। মা তাহাদের নিয়াই চালাইয়া লইতেছেন। বেলুও মা'র অসুখের সংবাদ পাইয়া আসিয়া উপস্থিত। মা হাসিয়া বলিলেন,—'দেখলি দিদি, যার কাজ সেই করে। বেলুও আসিয়া উপস্থিত।'

মাতৃদর্শনে শ্রীঅনন্ত শয়নম্ আয়েঙ্গার।

নারায়ণ দাসজী ও বিড়লার বৈদ্যজী সঙ্গেই আছেন। যোগীভাই, মণ্ডির রাণী তাহারাও আছেন। একদিন লোক সভার স্পীকার শ্রীঅনন্ত শয়নম্ আয়েঙ্গারও সস্ত্রীক মা'র দর্শনে আসিলেন।

একদিন নারায়ণ দাসজীর প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন,—'দেখ যতক্ষণ সন্তোষ বা দুঃখ মনে হইবে, ততক্ষণ কর্ত্তব্যও আছে। আর যদি কাহারও তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর হয় যে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাই ঠিক তবে নিজের কোন দুঃখ সুখ থাকে না, আর কোন কর্ত্তব্যও থাকে না।'

সপ্তর্ষি আশ্রমটি অতি সুন্দর। গঙ্গা তটে ৺গণেশ গোস্বামীজী ইহা নির্মাণ করাইয়া গিয়াছেন। একটি হলে পুলস্ত, পুলহ আদি সপ্তঋষির মূর্তি রহিয়াছে। সেই হলেই সৎসঙ্গাদি হয়। একটি শিব মন্দিরও আছে। তাহাতে মূর্তি ও লিঙ্গ দুইই আছে। প্রতি ঋষিদের নামে এক একটি কুটিয়াতে সাধুদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। মা-ও এইরূপ একটি কুটিয়াতেই আছেন। কয়েকজন ছাত্রও সেখানে থাকিয়া পড়াশোনা করে। তাহাদের আহারের বন্দোবস্তও আশ্রম হইতেই করা হয়।

যাহা হউক, মা আজ প্রায় বৈকাল ৪ টায় আনন্দকাশী রওনা হইলেন।

সপ্তর্ষি আশ্রম হইতে মা'র আনন্দকাশী গমন।

যোগীভাইও সঙ্গে আছেন। আমরাও চলিলাম। যাইবার পূর্বে মা শিব মন্দিরে গিয়া শিবলিঙ্গ, শিবমূর্তি, গণেশ, পার্বতী প্রভৃতি সব মূর্তির গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। পরে শিবের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'আসি।'

আজ রাজমাতা টিহরীর বিশেষ আহ্বানেই মা আনন্দকাশী যাইতেছেন। ১৫ই মার্চ যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মা'র অসুস্থতার জন্য যাওয়া হয় নাই। এখন যদি মা'র একান্ত বাসে একটু শরীর সুস্থ হয়, এই ভরসায়ই যাওয়া হইতেছে।

২২শে মার্চ ১৯৬০।

আজ আমরা আনন্দকাশী পৌঁছিলাম। হরিদ্বার হইতে ইহা মোটরে ১॥০ ঘণ্টার পথ। এখানকার শোভা অপূর্ব। পাহাড়ের কোলে একেবারে

গঙ্গাতটে রাজমাতা এই স্থানে মা'র জন্য একটি আশ্রমের মত বানাইয়াছেন। আজ একটু বৃষ্টি থাকায় একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছে।

২৪শে মার্চ ১৯৬০।

আজ সকালে মা স্থানীয় শিব মন্দিরের বারান্দায় একটু হাঁটিলেন। পরে রৌদ্রে বসিলেন। বৈদ্যজী, শৈলেশ ব্রহ্মচারী ও আমরা ২।১ জন আছি। বৈদ্যজী আজ চলিয়া যাইবেন, তাই কথায় কথায় মাকে বলিতেছেন,—'মা বিড়লাজী বলেন, মা'র এই সব অসুস্থতা আসে কেন? তাঁহাকে গিয়া কি জবাব দিব? আর আপনার কি হইয়াছিল জানিতে চাহিলে কি বলিব?'

ইহার উত্তরে মা বলিলেন,—'শ্বাসের গতি যেমন হইয়াছিল, কেমন একটু খেয়াল হওয়ায় শ্বাসের গতি নূতন ভাবে তৈয়ার করিতে হইয়াছে নতুবা আর শ্বাস চলিত না।' এই ভাবের কথা শুনিয়া আমরা ত স্তম্ভিত।

তারপর বলিতেছেন,—'এখন ত অনেক ভাল দেখিয়া, এখানে রাখিয়া যাইতেছ,—পিতাজীকে বলিও। আর রোগরূপী অতিথি আসিয়াছে, তোমরা যেমন আস।'

বৈদ্যজী—'বেশ মা, তাহাকে এখন বলিয়া দেও তোমার সময় হইয়া গিয়াছে, তুমি এখন যাও।'

মা—'কেন পিতাজী, তোমাদের কি বলা হয় যে তোমরা এখন যাও। আর দেখ কোথায় যাইতে বলিব? এক ছাড়া ত দুই নাই। কোথায় সরাইব? জায়গা কোথায়? আর রোগও যে আমিই বা তুমিই। আর সরাইবার যদি জায়গাই থাকে তবে আর হইল কি? সর্বদাই বলা হয়, সব নিয়াই ত এক আর করিবার সময় রোগকে সরাইয়া দেওয়া। তবে আর তোমরা

রোগও মায়েরই—(সরাইব কোথায়)

এখানে আস কেন? মা বল কেন? সরাইবার হইলে ত দুই হইল, কি বল? দুই কোথায়? কথা হইল সবই যে এক-ই, কাজেই যা হইয়া যায় সবই আনন্দ। শ্বাসের গতি ঐ ভাবে চলিতেছিল, সে-ও বেশ আনন্দ-কীর্ত্তন।'

বৈদ্যজী—'আমরা ত ঐ শ্বাস দেখিয়া ভয়ানক ভয় পাইতেছিলাম।'

কেমন যেন একভাবে মা এইসব কথা বলিয়া যাইতেছিলেন, সম্মুখে পর্বতমালা, নীচে ভাগিরথী প্রবাহিতা। খোলা স্থানে বসিয়া মা এই সব কথা বলিয়া যাইতেছিলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিলাম, কাহার চিকিৎসা কে করিবে। কাহাকে নিয়া খেলা করিতেছি। কি করিব বুঝিবার শক্তি তিনি না দিলে কে বুঝিতে পারে।

শ্বাসের গতির কথা উঠিলে মা বলিলেন,—'শ্বাসের যে গতি হইয়াছিল ফিরাইবার খেয়ালই হইতেছিল না। এই শরীরের ত যা হইয়া যায়। তারপর যখন একটু খেয়ালটা আসিল ফিরাইবার, তখন নূতন করিয়া শ্বাসের গতি তৈয়ার করিয়া নেওয়া হইল, নতুবা শ্বাসের গতি এইভাবে ফিরিতই না।

যোগীভাই এই কথায় মাটিতে পড়িয়া, প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'মা এইরূপ করিও না।'

কি ভয়ানক অবস্থা হইয়াছিল মা'র এই কথায়-ই অনুমান করা যায়। মা-ই কৃপা করিয়া ফিরিয়াছেন, নতুবা আমাদের ত কোন উপায়-ই ছিল না।

২৫শে মার্চ ১৯৬০।

আজও মা'র শ্বাসের গতি একটু এলোমেলোই চলিয়াছিল। আজ অনিল ও রণজিৎ মা'র দর্শনে আসিয়াছে। জলন্ধর হইতে সাধুসিংহের ডাক্তার ছেলে এবং দিল্লী হইতে লাল তার মাকে নিয়া আসিয়াছে। সকলেই মা'র অসুখের সংবাদে ভয় পাইয়া মাকে দেখিতে আসিয়াছে।

৩০শে মার্চ ১৯৬০।

মা আনন্দ-কাশীতেই আছেন। এখন পূর্বাপেক্ষা মাকে একটু ভাল মনে হয়। সকালে বিকালে একটু বাহিরে হাঁটেন। ভাবটিও অনেকটা স্বাভাবিক, তবে রাত্রিতে শুইবার ভাব একেবারেই থাকে না।

আজ সন্ধ্যার পরে মা'র মাথা আবার একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে। সেঁক দেওয়াতে ধীরে ধীরে তাহা ঠিক হইয়া গেল।

গত ২৭শে দুপুরে টিহরীর মহারাজা সপরিবারে মা'র দর্শনে আসিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার পর আবার ফিরিয়া গেলেন। মাকে দেখিতে আরও কেহ কেহ আসিল।

মেয়েরা কিশনপুর আশ্রমে আছে। সেখান হইতে মাঝে মাঝে ২।১ জন করিয়া আসিয়া মা'র সঙ্গ করিয়া যায়। মা সর্বদাই বলেন,—'এই পথে যখন একবার তোমরা আসিয়াছ, তখন সাধন ভজন নিয়া থাকিতেই হইবে। সাধন ভজন না থাকিলে এই জীবনে প্রকৃত সেবার কাজ নিয়া থাকা কঠিন। এই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াও তোমাদের বৃত্তিগুলি যাইতেছে কই? এই শরীর দিয়া ত কোন সেবা হয় না। তবু তোমাদের পক্ষে যাহা মঙ্গল—কল্যাণের দিক তাহাই ত বলা হয়।'

বড় মেয়েদের মধ্যে কয়েকজনকে মা কিশনপুরে রাখিয়াছেন। তাহারা মাকে ছাড়িয়া থাকার জন্য কান্নাকাটি করিতেছে। মা তাহাদের বুঝান—সেখানে থাকার সমস্ত সুযোগ সুবিধাও করিয়া দিয়াছেন দৈনন্দিন কার্যক্রমও মা ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তাহারা উপস্থিত সাধন ভজন নিয়াই থাকুক, ইহাই মায়ের খেয়াল। মায়ের সঙ্গেও অনেকদিন থাকিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের রাগ অভিমান প্রভৃতি বৃত্তিগুলির প্রকাশ বন্ধ হইতেছে কই? এই কারণেই তাহাদিগকে এখন কিছুদিন সাধন ভজনের মধ্যেই রাখিবার মায়ের খেয়াল। এইসব কথাও মা বলিতেছেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—হঠাৎ শনিবার সকাল হইতে আমার পেটে একটা ভয়ানক ব্যথা আরম্ভ হইল, কয়েকবার বমিও হইল। বিনা কারণে হঠাৎ এইরূপ হওয়াতে খুবই দুর্বল হইয়া পড়িলাম। পরে মায়ের কাছে শুনিলাম, মা পূর্বদিন রাত্রিতেই এক বিকট রোগমূর্ত্তি দেখিয়াছেন। তাহাকে মা নিজে গিয়া কিছুদূরে আগাইয়া দিয়া আসিয়াছেন, তবুও বুঝিলাম শরীরে বেশ একটু ক্লেশ রাখিয়া গিয়াছে। মা বলিলেন,—'কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বেশ করিয়া দেখিতেছিল।'

মায়ের রোগমূর্ত্তি দর্শন।

মা'র শরীরটা বিশেষ ভাল না। নড়িবার চলিবার খেয়াল বিশেষ নাই। তবুও ১৩ই দিদিমার সংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষে মা'র দিল্লীতে যাওয়ার কথা হইয়াছে।

আজ মা হঠাৎ আমাকে ও দিদিমাকে বলিলেন,—'তোমরা যদি এই শরীরটাকে ছুটি দেও তবে এই শরীর এখান থেকে সোজা দেরাদুন চলে যেতে পারে। তোমরা দিল্লীতে গিয়া উৎসব করিয়া আস।'

অবশ্য পরে রাজমাতার বিশেষ আগ্রহে এইখানেই দিদিমার উৎসব হইবে স্থির করা হইল। সেই অনুসারে সকলকে এখানেই আসিতে লেখা হইল।

১লা এপ্রিল ১৯৬০।

মা আনন্দ কাশীতেই আছেন। আজ ক্রিয়ানন্দ এখানে মা'র দর্শনে আসিয়াছে। ২।৩ দিন থাকিবে। মা'র শরীরের অবস্থাও প্রায় এক রূপই চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়। বেলু, বিমলা মা'র সেবা করে। মা বেলুকে বলিতেছেন—'তোরা সব এক এক বাহানায়

সংসার ছাড়িয়া এই শরীরটার জন্যই যেন এদিকে আসিয়া কত ভাবে সেবা করিতেছিস্।' মা এমন ভাবে এসব বলেন যে বেলুর চোখে জল আসে। বলে,—'মা, আমরা তো তোমার সেবা কিছুই করিতে পারি না, নিজে কৃপা করিয়া যতটুকু করাইয়া নেও।'...ইত্যাদি।

২রা এপ্রিল ১৯৬০।

আজ ক্রিয়ানন্দ, রাজমাতা, যোগীভাই প্রভৃতি সন্ধ্যার সময় মা'র কাছে বসিয়া আছেন। রোজই সন্ধ্যায় আনন্দপ্রিয়া বহিনজী মা'র নিকট রামায়ণ পাঠ করেন, তার পর বিভূ কীর্তন করে। আজ ক্রিয়ানন্দকে মা গান করিতে বলিলেন। সে গাহিল। মৌনের পরেও একটু কথাবার্তা হইল ক্রিয়ানন্দ কালই চলিয়া যাইবে বলিয়া, নহিলে মৌনের পরে সকলেই মা'র বিশ্রামের জন্য চলিয়া যায়।

ভক্তের অনুভূতি মায়ের কাছে স্বর্গসুখ আছে।

ক্রিয়ানন্দ বলিতেছে,—'মা, আপনার কাছে স্বর্গসুখ আছে। এখানে সবই ভাল, সুন্দর।'

মা বলিলেন,—'তুমি ভাল, তাই সবই ভাল দেখ।'

৩রা এপ্রিল ১৯৬০।

আজ বাসন্তী পূজার সপ্তমী। মা বলিয়াছেন এই তিন দিন এখানে শিবের মন্দিরে শিবের উপরেই পূজা হইবে। মা'র আদেশ মত দেরাদুন

হইতে ফল ইত্যাদি আনান হইয়াছে। শিবের ও দেবীর ছবিও আনান হইয়াছে। গতকালই মা নিজে মন্দিরে গিয়া সব পরিষ্কার করাইয়া, বাসন-পত্র সব মাজাইয়াছেন। ছবি ২ খানি আনন্দপ্রিয়াকে সাজাইয়া রাখিতে বলিয়াছেন। শিবলিঙ্গ ত আছেই। কয় বৎসর পূর্বে এই সময়েই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা শৈলেশকে দিয়া মা'র উপস্থিতিতে করান হইয়াছিল। যাক্, এবার মা'র নির্দ্দেশ মত কমল পূজক, কান্তিভাই চণ্ডী পাঠ করিবে, বিভূ কীর্তন করিবে। হেমিদি, বেলু, বিমলা নৈবেদ্য ও ভোগের সব ব্যবস্থা করিবে —এই ভাবে সব স্থির হইয়া গেল। আশ্রমের নিয়মে আজ নারিকেল ভাজা, মুগডাল, আলু সিদ্ধ, পায়েস ও লুচি দিয়া ভোগ দেওয়া হইল। সবই খুব সুন্দর মত হইয়া গেল। মা মন্দিরের সামনে গিয়া বসাতে, সকলেই গিয়া বসিল। আনন্দপ্রিয়া মাকে ফুলের মালা দিয়া সাজাইলেন। মা-ও গান করিলেন। পূজান্তে শিবের উপরেই সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। মা উপস্থিত থাকিয়া পূজার প্রসাদ বিতরণ করাইলেন। মা নিজেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—'বাঃ, বেশ সুন্দর ভাবে পূজা হইয়া গেল।' বিভূকে বলিলেন, 'এখানে মায়ের কীর্তন করিবে, তাহাতেই কাশীর পূজার-ও কীর্তন হইবে।'

আনন্দ কাশীতে বাসন্তী পূজা।

মা ইহা বলিতেই আমি বলিলাম,—'মা, এই পাহাড় জঙ্গলেও তোমার ব্যবস্থায়, তোমার উপস্থিতিতে সবই সুন্দর হইয়া উঠিল। আর এইরূপ ত সর্বদাই হয়। জঙ্গলেও মঙ্গল হইয়া ওঠে।' রাজমাতাও এই কথার সমর্থন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

মা'র ব্যবস্থায় জঙ্গলেও মঙ্গল হয়।

৪ঠা এপ্রিল ১৯৬০।

আজ অষ্টমী। বশিষ্ঠ গুহার পুরুষোত্তমানন্দ স্বামিজী আসিয়াছেন। তিনি আজ এখানেই ভিক্ষা নিলেন। আজও পূজা খুব ভাল ভাবেই হইয়া গেল।

৫ই এপ্রিল ১৯৬০।

আজও নবমীর পূজা বেশ ভাল ভাবেই হইয়া গেল। মা'র শরীরও প্রায় একই প্রকার আছে।

৬ই এপ্রিল ১৯৬০।

সপ্তমীর দিন সুইজারল্যাণ্ড হইতে একটি বৃদ্ধা মেম বয়স প্রায় ৬০ বৎসর এবং একটি যুবক সাহেব, বয়স ৩৩ বৎসর মা'র দর্শনে নানা স্থান ঘুরিয়া এখানে আসিয়াছে। মা'র সঙ্গে তাহাদের একটু একটু কথাবার্ত্তাও হইতেছে। শুনিলাম মেমটি সুইজারল্যাণ্ডে একটি যোগ শিখাইবার স্কুল খুলিয়াছেন। সাহেবটি সেখানেই যোগ-ক্রিয়া শিখিয়াছে। বৃদ্ধা সাহেবটিকে পুত্রস্নেহে প্রায় ১২ বৎসর ধরিয়া কাছে রাখিয়াছে। উভয়ে তাহাদের জীবন-কাহিনী মাকে শুনাইয়াছে। দেখিলাম সাহেবটির মেজাজ খুবই গরম। চেহারাটিও খুব তেজস্বী।

মায়ের নিকট সুইজারল্যাণ্ড হইতে আগত একটি মেম ও সাহেব।

প্রথম দিন সন্ধ্যায় সাহেবটি ম'র কাছে বসিয়া আছে, রাজমাতাও উপস্থিত। তিনিই মাকে ইহাদের কথা বুঝাইতেছেন। সাহেবটি মাকে বলিতেছেন,—'তুমি আমার গুরু হইতে পারিবে? পার ত আমাকে এখন-ই কিছু দর্শন করাও, করাইতেই হইবে। যেমন রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দকে দেখাইয়া ছিলেন।' এইরূপ বলিতে বলিতে সে একেবারে মা'র চৌকির কাছে চলিয়া গেল। একটু উদ্ধত ভাবেই বলিতেছে, 'দেখাইতে পার ত এখন-ই দেখাও'। দিল্লীর আর একটি মেম-ও সেখানে উপস্থিত ছিল, সে যেন মাকে কি বলিতে যাইতেই যুবকটি তাহাকে এক

ধমক দিয়া উঠিল। বলিল,—'তুমি কিছুই বোঝ না, কি কথা বল?' বেচারী ধমক খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

মা বলিলেন,—'দেখ বিবেকানন্দ হইলে, রামকৃষ্ণদেব-ও তাহার সামনে।' কিন্তু সে কথা কে শোনে!

তাহার বোধ হয় মনে মনে ধারণা সে বিবেকানন্দের মতই একজন। আসন ইত্যাদি করায় মেমটির এবং ইহার একটু গর্বের ভাব আছে। মেমটি ত নিজেকে একটু বিশিষ্ট কিছু-ই মনে করে।

যাক্ মা'র সঙ্গে তাহাদের আরও অনেক কথাবার্তা হইল। তাহারা মা'র নিকট পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, যেমন কালা বোর্ডের চিহ্নিত স্থানে তীর মারা হয়, সেইরূপ তীর বিদ্ধ করিয়া আমাকে চূর্ণ কর। কিছু দিতে পার তো দেও। এই ভাবের-ই নানান্ কথা বলিতেছে।

এই সব শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন,—'দেখ, এই শরীরের ত সেবা আসে না, যদি সেবা করাইয়া নিতে পার, তবে যা হইয়া যায়।'

সে হয়ত মনে করিয়াছিল যে, মা-ও সাধারণতঃ যেমন লোকে বলে, 'আমি এই করিয়া দিব,' 'ঐ করিয়া দিব' এই সবই বলিবেন, কিন্তু মা সে দিক দিয়া-ও গেলেন না। বলিলেন, 'যেমন বাজাইবে সেই রূপ শুনিবে'—এই ভাবের-ই সব কথা মা বলিলেন।

আবার সাহেবটি প্রশ্ন করিল,—'আমি যাহা চাই তুমি বোঝ কিনা? তুমি ভবিষ্যতের কথা বলিতে পার কিনা?'

মা হাসিয়া বলিলেন,—'তোমার কথায় ঢাকার একটি কথা মনে পড়িল।' ঢাকায় মা একবার সধবাদের সিন্দুরের ফোঁটা দিতেছিলেন। একটি সধবা তখন মাকে বলিয়াছিল,—'বুঝিয়া সিন্দুরের ফোঁটা দিও। যদি সিন্দুর চিরদিন বজায় থাকে তবেই দিবে, নতুবা তোমার হাতের ফোঁটা নিব না।'

ঢাকার একটি কাহিনী।

মা বলিয়াছিলেন,—'বেশ, এতগুলি সধবা মেয়েলোক আছে, সকলকেই ফোঁটা দিতেছি, তোমাকেও দিতে আসিয়াছি। কিন্তু তুমি যাহা বলিলে, সেই ভাবে বুঝিয়া বুঝিয়া যদি ফোঁটা দিতে বল, তাই দিতে পারি কিন্তু ইহাতে অন্য সকলের প্রাণে যে ব্যথা লাগিবে সেই জন্য পাপের ভাগী তুমি হইবে তো?' এই কথায় সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

এই গল্পটিই মা সাহেবকে বলিলেন, এবং পরে ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া বলিলেন,—'দেখ, ভগবান ভবিষ্যৎ জানিতে দেন না ভালই, নতুবা ভাবী দুঃখের খবর পাইয়া প্রথম হইতেই প্রাণে ব্যথা ভোগ করিতে থাকিত—ইহা কি ভাল হইত?'

ভগবান ভবিষ্যৎ জানিতে দেন না—ইহাও জীবের সুখের জন্যই।

ইহা শুনিয়া সাহেবটি হাসিয়া বলিলেন,—'সমুদ্রে এক প্রকারের মাছ আছে, তাহাকে ধরা যায় না, কেবল পিছলাইয়া যায়। মা-ও সেই রকম। মা এমন কথা বলেন যে মাকে আটকান যায় না।'

সাহেবটির উদ্ধত ভাব ও রাত্রে তাহার ঘুম হয় না, মাথা গরম, জীবনও দুঃখের, Spirit-এর ভয় হয়—এই সব কথা শুনিয়া আনন্দপ্রিয়া বহিনজী আপনা হইতেই তাহাকে কিছুদিন মা'র কাছে থাকিতে বলিলেন। ইহারা ৪।৫ দিন এখানে ছিল। সাহেবটির এই কয়দিনেই আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিলাম।

যাইবার সময় হইলেও যাই যাই করিয়া আরও ৫।৬ দিন থাকিয়া গেল। বলে—'এখান হইতে যাইতে ইচ্ছা করে না'।

মা তাহার নাম দিলেন 'রামানন্দ' আর মেমসাহেবটির নাম দিলেন 'করুণাময়ী'।

একদিন সাহেবটি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—'শংখ বাজায় কেন? আরতি করে কেন? ফুল চন্দন দিয়া পূজা করা এই সবই বা কি?'

মা বলিলেন,—'শংখের শব্দ—শব্দ ব্রহ্ম। আরতি, প্রণাম—ভগবানে

নিবেদিত জিনিষ নিজের মধ্যে নেওয়া। তেজ নেওয়া—ইহাতে শুদ্ধ ভাব জাগে। পঞ্চভূত দ্বারা ভগবানের পূজা করা, ইহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের প্রতীক। এই ভাবে করিতে করিতে আসল পূজা—নিজেকেই নিজে পূজা, নিজেকেই পাওয়ার জন্য, তবেই তাঁকে পাওয়া হয়।'

শংখ বাজাইবার ও আরতি করিবার গুহ্য অর্থ।

এই সব শুনিয়া সাহেবটি খুব খুশী।

৭ই এপ্রিল ১৯৬০।

আজ সাহেব ও মেমটি চলিয়া যাইবে। যাওয়ার সময় মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। মা তাহাদের তোয়ালে ও বস্ত্র দিলেন। সাহেবটি মাথায় করিয়া নিল এবং মা'র কোলের কাছে প্রণাম করিল। বলিল,—'আমি আবার শীঘ্রই মা'র কাছে আসিব।'

যাওয়ার সময় উহার কান্না কান্না ভাব, যেন যাইতেই পারিতেছে না। একটু যায়, আবার দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া মাকে দেখে। উহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আনন্দপ্রিয়া মহা খুশী।

হৃষিকেশের শিবানন্দ স্বামীজীর আশ্রম হইতেও দলে দলে সাহেব মেম আসিয়া মাকে দর্শন করিয়া যাইতেছে। শিবানন্দজীই নাকি সকলকে মা'র দর্শন করিতে পাঠাইতেছেন। মাকে দেখিয়া অনেকেরই এই ভাব যে এমনটি আর দেখি নাই।

৮ই এপ্রিল ১৯৬০।

প্রফেসর উপেন দত্ত মুসৌরী হইতে আসিয়াছেন। ইনি বহু পুরাতন ভক্ত। মা যখন বহু বৎসর পূর্বে দাদা মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নিয়া হরিদ্বার গিয়াছিলেন, তখন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ও ইনি ওখানেই ছিলেন। তখন একদিন সমাধি অবস্থায় ইনি মাকে দেখিয়াছিলেন। আজ যখন সকলে সন্ধ্যার সময় মা'র ঘরে বসিয়াছেন, তখন তিনি ঐ কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন,—'ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতেছে, মা একভাবে পড়িয়া আছেন। তারপর যখন সমাধির ভাবটা ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল তখনকার দৃশ্য আমি জীবনে ভুলিব না। কী সুন্দর সে দৃশ্য।' তিনি আরও একটি ঘটনা বলিলেন, যে এবার মহাষ্টমীর দিন ইনি ও ইহার বৈবাহিক মুসৌরীতে এক ঘরে শুইয়া আছেন। ইহার বৈবাহিকও মা'র কাছে অনেকদিন হইতেই যাতায়াত করেন। যাক্ হঠাৎ নাকি তাঁহার বৈবাহিক বলিয়া উঠিলেন,—'আরে, মা যে এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মাথায় হল্‌দে রংএর মুকুট, আপনি দেখিতেছেন না'? উপেনবাবু ইহা শুনিয়া বলিলেন—'আমি ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। তবে শুনিয়াছি মা'র সোনার মুকুট আছে, জন্মোৎসবে পরান হইয়াছিল, আপনি বোধহয় তাহাই দেখিতেছেন।'

কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা।

এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দপ্রিয়া বহিনজীকে বলিলাম,—'দেখুন, মহাষ্টমীর দিন আপনি মাকে হলদে রংএর ফুল দিয়া মুকুট পরাইয়াছিলেন, না? তাহাই হয়ত ইহার বৈবাহিক মহাশয় দেখিয়াছেন।'

আনন্দপ্রিয়া ইহা শুনিয়াই আনন্দের সঙ্গে বলিলেন,—'হ্যাঁ, হলদে মুকুট ত মাকে পরান হইয়াছিল।'

এই কথায় মা একটু হাসিয়া বলিলেন,—'আরও একটা কথা এই যে

যখন উহারা মুকুট মালা প্রভৃতি পরাইতেছিল তখন এই শরীরটার ইহার বেয়াই জ্যোতি কাঞ্চনের কথা খুবই খেয়াল হইতেছিল। একবার আমার ও জ্যোতিষের হাঁটিতে হাঁটিতে মুসৌরীতে উহাদের ওখানে যাওয়া হইয়াছিল। তখন জ্যোতি কাঞ্চনের স্ত্রী লুচি তরকারী করিয়া এবং আরও কি কি যেন খাওয়াইয়াছিল। এই সব কথাও তখন খেয়ালে আসিতেছিল। পরে ওখান হইতে যখন ঘরে আসিতেছিলাম, তখন পর্যন্তও ঐ খেয়ালটা ছিল।

"ঐ সময় আরও একটা কথা খেয়ালে আসিতেছিল—ঐদিন আরও কিছু সময় মুসৌরীতে থাকিয়া আবার রৌদ্রের মধ্যেই দেরাদুন ফিরিয়া আসা হইল। ফিরিবার সময় রৌদ্রের মধ্যে হঠাৎ পিপাসা পাইল। কিন্তু পথে জল পাইবার কোনও উপায় নাই। এর মধ্যে পরিষ্কার দেখা হইল রাজসাহীতে অটল বেশ সুন্দর খণ্ড খণ্ড তরমুজ কাটিয়া কাটিয়া ভোগ দিতেছে। এমন হইল যে ইহা দেখিতেই পিপাসা মিটিয়া গেল। যেন তৃপ্তি হইয়া গেল। জ্যোতিষকে এই কথা বলা হইল। তখন ছিল বৈশাখ মাস। দেরাদুন আসিয়াই জ্যোতিষ অটলকে চিঠি দিল। চিঠিতে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ দিন, ঐ সময় তুমি কি করিতেছিলে? অটল জবাব দিল, বৈশাখ মাস তাই ঐ সময় তরমুজ কাটিয়া ভোগ দিতেছিলাম মাকে।"—এই কথা বলিয়া মা হাসিয়া বলিলেন,—"এই সব কথাই ঐ সময় খেয়ালে আসিতেছিল।"

৯ই এপ্রিল ১৯৬০।

আজ বৈকাল প্রায় ৫৷৷৹টায় মা বাহির হইয়া একটু হাঁটিয়া বারান্দার ছোট চৌকিখানার উপরে বসিলেন। ডাক্তার অমল রায় কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়াছে। ইনি নাকি ভোলানাথের নিকট দীক্ষিত। বড় বেশী

আসেন না। তিনি তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা বলিলেন যে কিভাবে মায়ের কৃপায় তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। এই জাতীয় আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সব শুনিয়া মা-ও বলিলেন,—'আনন্দপ্রিয়া, মোদীর গল্প ত তোমাদের নিকট বলাই হয় নাই। একবার মোদী উড়া জাহাজে কোথায় যাইতেছে, হঠাৎ এমন ভয়ানক তুফান উঠিল যে জাহাজ রক্ষা করিবার আর কোন উপায়ই রহিল না। জাহাজের সকলকে এই সংবাদ দিয়া দেওয়া হইল। জাহাজে ভয়ানক একটা চঞ্চলতা ও কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। ঐ অবস্থায় নাকি মোদী তখন বলিয়া উঠিল,—'এই সব কান্নাকাটি করিয়া এখন ত আর লাভ নাই। ইহারা যাহা বলিতেছে তাহাতে প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই সকলের মৃত্যু নিশ্চিত; ইহাই ভগবানকে ডাকিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। এমন সময় আসিবে না। মৃত্যুর পূর্বে ভগবানের স্মরণে ভব-সাগর পার হয়। এস আমরা তাই করি।' এই বলিতেই সকলে ভগবানের নাম করিতে লাগিল। কী আশ্চর্য! পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। সকলের মুখেই আনন্দের প্রকাশ ফুটিয়া উঠিল।

পরে যথাসময়ে মোদী নামিয়া গেল। তাহার কিছুক্ষণ পরেই নাকি একটা Electric তার লাগিয়া না কিভাবে উড়ো জাহাজে আগুন ধরিয়া গেল, এবং সেই উড়ন্ত জাহাজের সব লোক মারা পড়িল। দেখ কি ঘটনা।'

আনন্দপ্রিয়া বহিন বলিল, হয়ত মোদীর জীবন রক্ষার জন্যই প্রথমবার জাহাজখানা বাঁচিয়া গিয়াছিল। সকলেই এই কথার সমর্থন করিল।

মা'র শরীরটা এখনো যেন সম্পূর্ণ ঠিক হইতেছে না। বিশ্রামেই বেশী সময় থাকেন। আমি এখন মা'র কৃপাতে ভালই আছি। যেন নূতন জীবন পাইয়াছি।

আহমেদাবাদ হইতে কান্তি-ভাইয়ের ডাক্তার লিখিয়াছে যে মায়ের

কৃপাতেই আমি আবার হাটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছি নহিলে এই রোগে এরূপ হয় না, প্রাণে বাঁচিলেও পঙ্গু হইয়া থাকিতে হয়। বম্বের ডাক্তার শেঠও লিখিয়াছেন,—'দিদি, আপনি মনে রাখিবেন আপনার পুনর্জন্ম হইয়াছে।" সত্যই ইহা যে আমার প্রতি মায়ের একান্তই অহৈতুকী কৃপা, তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়!

১২ই এপ্রিল ১৯৬০।

আগামী কল্য দিদিমার সন্ন্যাসোৎসব। সাধুরা আসিবেন। মা খুব সুন্দরভাবে সব সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছেন। এমন সুন্দরভাবে সাজাইতেছেন যে সাধারণের পক্ষে সেরূপ করা সম্ভবই না। কোথায় সাধুরা বসিবেন, তাহাদের আসন, মালা, পূজার ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই অতি সুন্দর ভাবে করা হইয়া গেল।

১৩ই এপ্রিল ১৯৬০।

আজ দিদিমার সন্ন্যাসোৎসব। উষার আলোক ফুটিতে না ফুটিতেই, কীর্ত্তন ও দিদিমার আরতি করা হইল। পাঠ কীর্ত্তনাদি সারা দিনই চলিল।

আনন্দ কাশীতে দিদিমার সন্ন্যাসোৎসব।

দুপুরে মুক্তানন্দ গিরীজীর পূজা ও ভোগ হইল। শিবের মন্দিরেও শিবের পূজা ও ভোগ হইল। ঋষিকেশ হইতে মণ্ডলেশ্বর শুকদেবানন্দজী, ভজনানন্দজী, বশিষ্ঠ গুহা হইতে পুরুষোত্তমানন্দজী প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। শিবানন্দ স্বামিজীর আশ্রম হইতেও অনেক সাধু ব্রহ্মচারী

আসিয়াছেন। সকলকেই ভোজন, ফল, বস্ত্রাদি দেওয়া হইল। বিশেষ বিশেষ স্বামিজীদের রুদ্রাক্ষের মালাও আনন্দপ্রিয়াকে দিয়া মা দেওয়াইলেন। অতি সুন্দরভাবে উৎসবাদি হইয়া গেল।

১৪ই এপ্রিল ১৯৬০।

আজ ১লা বৈশাখ; তাই আজ সকলেই এখানে থাকিয়া কাল ফিরিবে এইরূপ কথা হইল। ১লা বৈশাখে মাকে ছাড়িয়া কেহই যাইতে রাজী নহে।

আজও শিবের ভোগাদি হইল। কাল মা চলিয়া যাইবেন, আনন্দপ্রিয়ার মনটা তাই অপ্রসন্ন। আবার সামনের বছর মাকে আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইতেছেন। ভাইয়া আজ সকালে আসিয়া বিকালে চলিয়া গেলেন। আমার মনে পড়িল, আমার অসুখের চরম অবস্থায় যখন বম্বেতে প্লাষ্টার লাগান হইল, তখন ভাইয়া আমাকে আনন্দ দিবার জন্য বলিয়াছিলেন, —"দিদি, তুমি ভাল হইয়া উঠিবে, আর আমি তোমাকে নিয়া আনন্দকাশী যাইয়া তোমার হাতের রান্না খাইব।"

মা ত আমার অসুখের মধ্যে আরও ২বার আনন্দকাশী আসিয়াছেন, কিন্তু আমার আর আসা হয় নাই। এবার আমি আসিয়াছি, তাই মা ভাইয়াকে লিখাইলেন,—"দিদি আসিল আনন্দকাশী, এখন ভাইয়া দিদির রান্না খাইতে কবে আসিবে!"

ভাইয়ার এত কাজ যে আসিবার সময় করিয়া উঠিতেই পারেন না। আজ কয়েক ঘন্টার জন্য আসিয়াছেন। আমি আজ একটু রান্না করিলাম। রান্না করিয়া বেলু, বিমলা ও উদাসের বিশেষ আগ্রহে এত বছর পরে মাকে খাওয়াইতে বসিলাম। মা, আনন্দপ্রিয়া, যোগীভাই, ভাইয়া ও মেয়েদের সকলকে দেখিবার জন্য ডাকিলেন। মৃত্যুমুখ হইতে মা'র কৃপায় ফিরিয়া

আজ এতদিন পরে আবার মাকে খাওয়াইতে পারিতেছি,—আমার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ভাইয়া ত আমার এই কার্যক্ষম অবস্থা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মা-ও ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'ভাইয়ার আজ দিদিকে সুস্থ দেখিয়া কত আনন্দ।'

বাস্তবিকই ভাইয়াকে দিয়া মা আমার জন্য কি সেবাটাই না করাইলেন। যদিও জানি মা'র-ই কৃপা, মা'র-ই কাজ, তবুও যন্ত্রস্বরূপ যিনি, তাঁর প্রশংসা না করিয়া থাকিব কিরূপে। তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন,—'দিদি যখন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে তখন মা আমাকে দিয়া যাহা বলাইয়া ছিলেন, আজ তাহা সফল হইল।'

খাওয়ার পরে ভাইয়া দিল্লী চলিয়া গেল।

আজ আরও একটি ঘটনা ঘটিল। মা কালই রাত্রিতে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, কাল ১লা বৈশাখ, শিবের পূজা ও ভোগ যেন হয়। পূজাদি ত সব ঠিক ঠিক করা হইল, কিন্তু রান্নার জিনিষ দিয়া ভোগ দিতে আমার ভুল হইয়া গেল। তখন বেলা প্রায় ৩টা। মাত্র আমি ও হেমিদি না খাইয়া আছি। হঠাৎ আমার খেয়াল হইল শিবের ভোগের কথা। মনটা খুবই খারাপ হইয়া গেল—একে ত শিবের ভোগ হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ মা'র আদেশ লঙ্ঘন হইল। আমি খাইলাম না। মা উঠিলে মাকে সব বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিব। মা বলিলেন,—এখনই হেমিদিকে দিয়া ভোগ পাক করাইয়া. শিবকে ভোগ দিয়া প্রসাদ নিবে। তাহাই করা হইল। মা পরে বলিলেন,—'শিবের মহিমা প্রকাশ হইল। দেখ প্রথম হইতেই কথা হইতেছে, দিদি আজ রান্না করিবে, মা'র ভোগ হইবে, ভাইয়া দিদির হাতের রান্না খাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই শিবজী আজ কেন দিদির হাতের রান্না ভোগ নিবেন? শিবের জন্য ত রান্না করিস নাই। বেশ করেছেন শিব। কাল কিন্তু তোমার ২।১টা পদ রান্না করিয়া শিবের ভোগ দিতে হইবে।'

আমি বলিলাম,—'মা, তাহাই হইবে।'

১৫ই এপ্রিল ১৯৬০।

বেলা প্রায় ২টায় মা সকলকে নিয়া দেরাদুন রওনা হইলেন।

আনন্দকাশী হইতে মা'র দেরাদুন আগমন।

দেরাদুনের ডাক্তার সোম মারা গিয়াছেন। তাঁর বিধবা স্ত্রীর মা'র ওপরে ভয়ানক অভিমান। মা আজ আসিবার পথে তাঁর বাসায় কিছুক্ষণ বসিয়া আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন।

১৯শে এপ্রিল ১৯৬০।

মা'র শরীর এখনো সম্পূর্ণ ঠিক হইতেছে না। তবে অনেকটা ভাল। মা'র ২৯ তারিখে বম্বে রওনা হইবার কথা হইয়াছে।

আজ রাত্রি প্রায় ১২।১২॥০টা বাজে। মা ঘরের মধ্যে শুইয়া আছেন।

একটি বিচিত্র ঘটনা।

সকলেই প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আমি মাত্র আসিয়া শুইয়াছি। এই সময় মা হঠাৎ একটা আওয়াজ করিয়া উঠিলেন। পুষ্প, বিমলা, আমি, বেলু, পারুল শব্দ শুনিবামাত্র দৌড়াইয়া মা'র ঘরে গেলাম। আমি ঘরে ঢুকিয়াই মা'র গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। মা'র মুখ হইতে প্রথমে অস্পষ্ট পরে স্পষ্ট ভাবে বাহির হইতে লাগিল,—'ঘরে আস, ঘরে আস।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি মা?'

মা বলিলেন—'ঘরে আসিয়া তোরা কিছু বুঝিতেছিস্ না'?

আমি বলিলাম,—'আমার শরীর যেন একটু ঝংকার দিতেছিল'।

পুষ্প বলিল,—'ঘরে ঢুকিয়াই আমার যেন কেমন লাগিল। আমি মা'র চৌকি ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম'।

মা বলিলেন,—'এখন আর কিছু বলিব না, পরে দেখা যাইবে'।

বেলু একটু পরেই বলিল,—'দেখ, কি আশ্চর্য, শুইবার সময় আমি বিমলাদিকে বলিয়াছিলাম আমাদের ঘরের সামনের দরজার জালির দরজাটা বন্ধ করিয়া দেও। কিন্তু বিমলাদি বলিল খোলা থাকুক। পরে স্বপ্নে কি রকম একটা ভয়ের ভাব লইয়াই বলিতেছি, বড়দি, দেখ দেখ এই দরজা দিয়া সোজা মা'র ঘরে চলিয়া গেল। ইহার মধ্যেই মা'র শব্দ শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দৌড়াইয়া মা'র ঘরে গেলাম, কিন্তু কিছু দেখিলাম না।'

মা এই কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—'এই দিক দিয়াই ত আসিয়াছে।'

আর কিছু বলিলেন না।

২০শে এপ্রিল ১৯৬০।

আজ মাকে কাল রাত্রির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মা বলিলেন,—'ঠিক ঐ দিক দিয়া আসিয়াই ঘরে ঢুকিল। তার প্রভাবটা তোমাদের নিবার জন্যই। প্রথম হইতেই বলিতেছিলাম,—'ঘরে আস, ঘরে আস।' প্রথমে আওয়াজটা পরিষ্কার হয় নাই, পরে তোরা বুঝিতে পারিয়াছিলি।'

কে যেন জিজ্ঞাসা করিল,—'ভাল কেহ নাকি?' আবার কে বলিল,—'ভাল হইলে ভয় করিবে কেন?' মা বলিলেন,—'তার কোন কথা নাই। সকলে ত সবটা সহ্য করিতে পারে না।'

২১শে এপ্রিল ১৯৬০।

মা আজ আরও একটি ঘটনা বলিলেন। আমাদের কাশীর আশ্রমে একটি প্রকাণ্ড আকন্দ ফুলের গাছ আছে। সেইটির কথায় মা বলিলেন,—

একটি ঘটনা—মায়ের খেয়ালের পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী।

"গঙ্গাদি যে বাড়ীটা এখন কিনিয়াছে, সেই বাড়ীটা যখন তোরা কিনিয়া পরে বিক্রয় করিয়া দিলি, ঐ বাড়ীতে একটা বড় আকন্দ গাছ ছিল। একটু খেয়াল হইতেছিল, এত বড় আকন্দ গাছ—সেই বাড়ীটা বিক্রয় হইয়া গেল! আশ্রমে একটা আকন্দ গাছ থাকিলে বেশ হইত। শিব আছেন। ও মা, কি আশ্চর্য এই আশ্রমে নিজে নিজেই আকন্দ গাছটা হইল। আর কি প্রকাণ্ড গাছ! এই রকমটা বড় দেখা যায় না।"

এই কথা শুনিয়া বুঝিলাম মা'র খেয়ালেই এই গাছটা হইয়াছে। বাস্তবিকই গাছটা প্রকাণ্ড। একবার ত অনেকটা অংশ কাটিয়াও দেওয়া হইয়াছিল, আবার যেন দ্বিগুণ বড় হইয়া উঠিল।

আজ মুক্তিবাবা দিল্লী হইতে আসিলেন, তিনি অপারেশনের জন্য দিল্লীতে সন্তোষ সেনের নার্সিং হোমে ছিলেন। গতকাল হইতেই মা মুক্তিবাবার সুবিধার জন্য সব ব্যবস্থা করিতেছেন। সাধুদের প্রতি মায়ের এই যে যত্ন ইহা দেখিবার জিনিষ। না দেখিলে বোঝান যাইবে না।

২২শে এপ্রিল ১৯৬০।

মা এখানেই আছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য মাকে দর্শনের সময় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সকালে আধ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টা সময় রাখা হইয়াছে।

পূর্বের কথা মত আনন্দপ্রিয়াজীর বিশেষ আগ্রহে তাঁর গৃহ-প্রবেশে মুসৌরীতে তিনি মাকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নিয়া যাইবেন।

২৮শে এপ্রিল ১৯৬০।

আজ অক্ষয় তৃতীয়া। মা সকালেই মুসৌরী রওনা হইয়া গেলেন। কথা হইয়াছে মা আজ ওখানে থাকিয়া কাল এখানে আসিয়া আবার কালই বম্বে রওনা হইবেন। দিল্লীতে শ্রীশ্রীহরিবাবাও মা'র সঙ্গে মিলিত হইবেন এবং একত্রে বম্বে যাইবেন। অবধূতজী ও বিষ্ণু আশ্রমজীও পরে প্লেনে বম্বে যাইবেন।

২৯শে এপ্রিল ১৯৬০।

আজ মা দিল্লী চলিয়া গেলেন। সঙ্গে গেল দিদিমা, বেলু, বিমলা পানু ও চিন্ময়। আমরাও আজই মুসৌরী একস্প্রেসে রওনা হইব। কাল সকালে দিল্লী পৌঁছিয়া Frontier Mail-এ দিল্লী হইতে বম্বে যাইব। মা-ও ঐ গাড়ীতেই যাইবেন।

৩০শে এপ্রিল ১৯৬০।

মা বম্বে রওনা হইতেছেন। দিল্লী স্টেশন লোকে লোকারণ্য। আমরাও সকলে মা'র সঙ্গে রওনা হইলাম। আমাদের এক পার্টি পূর্বেই রওনা হইয়া গিয়াছে।

১লা মে ১৯৬০।

আগামীকল্য হইতে মা'র জন্মোৎসব আরম্ভ হইবে। আমরা ট্রেণ দেরী হওয়ায় বেলা ১২॥০ টায় পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে বহু লোক ছিল। সকলেরই মহা আনন্দ—মা আসিয়াছেন, জন্মোৎসব এখানে হইবে। মা'র সঙ্গে আমরা সকলেই ভাইয়ার বাড়ীতে আসিলাম। লীলাবেনের এক খুড়িমা তাঁর স্বামীর নামে একটি স্কুল করিয়াছেন—নানাবতী গার্ল'স্ স্কুল। বিশাল স্কুল বাড়ী। সেইখানেই প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল তৈয়ার করা হইয়াছে। সাধুদের বসিবার জন্য যথোপযোগী ব্যবস্থা আছে। ভক্তেরা সকলেই প্রায় ঐ বাড়ীতেই থাকিবেন স্থির হইয়াছে। একটি ছোট মন্দিরের মতও করা হইয়াছে। সেইখানেই প্রত্যহ মা'র পূজা ও চণ্ডীপাঠ হইবে। লীলাবেন, কানিয়া প্রভৃতি সকলেই সুব্যবস্থার জন্য খুবই পরিশ্রম করিতেছেন।

৩রা মে ১৯৬০।

গতকাল শেষ রাত্রে বেশ সুন্দর ভাবে মা'র জন্মদিনের পূজা ভাইয়ার বাড়ীতে প্যাণ্ডেলে হইয়া গেল। ব্রহ্মচারী কুসুম পূজা করিল। বাগানে প্যাণ্ডেলের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে পূজার স্থানটি সাজানো হইয়াছিল। মহাত্মাদের মধ্যে শ্রীহরিবাবাজী, অবধূতজী, মাধবতীর্থজী প্রভৃতি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পূজায় উপস্থিত ছিলেন। মাকে সময় মত পূজার স্থানে আনিয়া বসানো হয়। মা নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখনও আরতি হয় নাই, হঠাৎ দেখি মা আসন হইতে উঠিলেন এবং ৫১ পদের যে ভোগ সাজানো হইয়াছিল তাহা হইতে একখানা থালা উঠাইয়া নিয়া হরিবাবাকে গিয়া নিজহস্তে দিলেন। আর একখানা থালা দিলেন

শাশ্বতানন্দ স্বামিজীকে। এইরূপ আর পূর্বে কখনও দেখি নাই। সকলেই বিস্মিত হইলেন। পূজা শেষ হইলে আরতির পরে সকলে মাকে প্রণাম করিল। মা গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

৮ই মে ১৯৬০।

মা'র জন্মোৎসব বেশ ভালভাবে চলিতেছে। মা দিনের মধ্যে প্যাণ্ডেলে গিয়া প্রোগ্রামে যোগ দেন। সৎসঙ্গ বেশ চলিতেছে। ইতিমধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা শুনিলাম।

দুই জন পার্শী ভদ্রমহিলা মা'র দর্শনে আসিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন যে মা তাঁহাদের মধ্যে একজনকে একটি ফুল দিয়াছিলেন। কিন্তু খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় যে আট মাস পরেও ফুলটি একটুও বিবর্ণ হয় নাই। পরে আবার একদিন খুব সযত্নে সেই ফুলটি রাখা সত্ত্বেও কিভাবে তাহা আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা যে মা'রই অলৌকিকত্বের বিকাশ তাহাতে তাঁহাদের সন্দেহ নাই।

আরও একটি ঘটনা। স্থানীয় কয়েকজন বাঙ্গালী মহিলা এবং পরিবারের আরও কেহ কেহ মুম্বা দেবীর দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন মা গেরুয়া কাপড় পড়িয়া রহিয়াছেন; সঙ্গে আর একজন ঐ বস্ত্রধারী তাহার সহিত মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। মেয়েদের মধ্যে একজনের নাম বীণা চক্রবর্তী। তাহার সঙ্গে ছিলেন তাহার মা ও বোন এবং আর একটি মেয়ে, তাহার নাম আরতি। বীণা ও আরতি বলিতেছিল মাকে গেরুয়া কাপড় পরা দেখিয়া উহারা ওখানে দাঁড়াইয়া আছে, মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি বাঙ্গালী?"

বীণা—হাঁ আমরা বাঙ্গালী; আপনি কি বাঙ্গালী?

মা বলিলেন—"অনেকে আমাকে বাঙ্গালী বলে না, তোমাদের কি মনে হয় ?"

বীণা বলিল—"সত্যি আপনাকে বাঙ্গালী বলে মনে হয় না।"

বীণারা ৪।৫ জন ছিল একসঙ্গে। তাহারা দেবীর মন্দিরে দেবীকে প্রণাম করিতে চলিয়া গেল। বীণার মা প্রথমে ওখানেই মাকে দেখিয়াছিলেন লাল পেড়ে শাড়ী পরা। তিনি মা'র কাছে না গিয়া সোজা দেবীকে প্রণাম করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। বীণারা যেই মন্দিরে প্রণাম করিতে যাইতেছিল, পিছন দিক হইতে শুনিতে পাইল মা হাততালি দিয়া হাসিয়া (যেমন হাসেন) বলিতেছেন, "কেউ আমাকে চিনিতে পারিল না ; শুধু ঐ নুম্বা দেবী চিনিয়াছে।" বীণার মা দেবীকে প্রণাম করিয়া, মাকে প্রণাম করিতে আসিয়া আর মাকে দেখিতে পাইল না। মা'র কাছে আসিয়া উহারা ৩।৪ জন এই কথাই বলিতেছিল। আমি বাহিরে ছিলাম। মা আমাকে ডাকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"দিদি! শোন্ ইহারা কি বলিতেছে।" আমিও আসিয়া সব শুনিলাম।

মা হাসিয়া বলিতেছেন "তোমরা কিছু খাইয়া গিয়াছিলে নাকি?" তাহারা বলিল "মা! কেন আমাদের ভুলাইতেছেন? আপনি নিজে সব করিয়া এখন অন্য কথা বলিয়া আমাদের ভুলাইতেছেন।" তাহার পর উঁহারা মা'র সঙ্গে একান্তে নিজেদের কথা বলিলেন। ইহার পর হইতে প্রত্যহই উঁহারা আসিতে লাগিলেন।

ভীড় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। যে দিকেই মা, ভক্তগণ পিপীলিকার মত সেই দিকে গিয়া একত্রিত হয়।

সাধুরাও অনেকে আসিয়াছেন—শ্রীযুক্ত হরিবাবাজী, অখণ্ডানন্দজী, অবধূতজী, বিষ্ণু আশ্রমজী, মাধব তীর্থজী, সদানন্দজী যোগেশ ব্রহ্মচারীজী। এখান হইতেও মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মহেশ্বরানন্দজী, মোহান্ত মহারাজ, বাসুদেবানন্দজী, স্বতন্ত্রানন্দজী এবং আরও কেহ কেহ সৎসঙ্গে সম্মিলিত

হইয়া বক্তৃতা দিতেছেন। অখণ্ড জপ কীর্ত্তনাদিও চলিতেছে। এক আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরের মত এ বৎসরেও মায়ের ছবি বসাইয়া নিত্য পূজা ভোগ আরতি, মাকেও দুই বেলা আরতি; তাহা ছাড়া সাধুভোজন, সাধুদের বস্ত্র দান, কুষ্ঠরোগীদের খাওয়ান, ১০৮ কুমারীকে ও ১০টি বটুককে খাওয়ান ও বস্ত্র দান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইল। মায়ের জন্মোৎসবে শতচণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে। এবার ভুলক্রমে বাটুদা বিনাসম্পুটিত পাঠ সংকল্প করিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাই পুনরায় সম্পুটিত শতচণ্ডী পাঠ হইল। শত শত ভক্ত প্রত্যহ প্রসাদ পাইতেছে। চমৎকার ভাবে উৎসব চলিতেছে।

মাকে একদিন প্রেমকুটিরে সন্ন্যাস আশ্রমে বিশেষ আগ্রহ করিয়া নিয়া গেল। বাসুদেবানন্দজী (সন্ন্যাস আশ্রমের মোহান্ত) প্রবচন দিবার সময় মাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া অনেক কিছু বলিলেন।

ভাইয়ার বাড়ীতেই এবার মা'র তিথি পূজা হইল। রাত্রি তিনটার সময়ে কুসুমভাই (নির্বাণানন্দ) পূজা করিল। সাধুরা ও স্ত্রী পুরুষ বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। যোগীভাই, মুকুন্দভাই, লীলাবেন প্রভৃতি সকলে মাকে ওখানে নিতেই বাটুদা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বেদগান করিতে লাগিলেন। পূজান্তে মহারাজা টিহরী ও সোপোরী সাহেব প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যাহাতে সকলে মাকে প্রণাম করিবার এবং পুষ্প নিবেদনের সুযোগ পায়। একে একে সকলে প্রণাম করিয়া যাইতেই তাহাদের প্রত্যেকের হাতে প্রসাদ, বিভূতি ও কুঙ্কুমের পুরিয়া দেওয়া হইল। যোগেশ ব্রহ্মচারী, বাসুদেবানন্দজী, মনুভাই আরও সাধুরা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও একে একে মায়ের পায়ে ফুল দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। মা একভাবে পড়িয়াই আছেন। হরিবাবা পূজার সমাপ্তির কিছু পূর্বেই কীর্ত্তনের জন্য উঠিয়া গিয়াছেন। টিহরীর মহারাজার অনুরোধে যোগীভাই বম্বেবাসীদের এই উৎসব এতো সুন্দরভাবে করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদ দিলেন। বাস্তবিক উৎসব খুবই বিরাট ভাবে সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

অনেক বেলায় মাকে কোনও প্রকারে ধরিয়া ধরিয়া আবার মা'র ঘরে নিয়া আসা হইল। মা অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন।

১৫ই মে ১৯৬০।

নন্দার বিশেষ আগ্রহে আজ মা'র সঙ্গে আমরা প্রায় ৬০ জন পুণায় আসিলাম। মা আসিলেন মোটরে, সঙ্গে ছিল আরও দুইখানি মোটর। অবশিষ্ট সকলে আসিল ট্রেণে। প্রায় চার ঘণ্টায় আমরা পুণাতে পৌঁছিয়া নন্দার বাড়ীতে আসিলাম। অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। নন্দা সস্ত্রীক মায়ের ও অন্যান্য সকলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। কাহারও যেন কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে ইহাদের বিশেষ দৃষ্টি।

প্যাণ্ডেল করিয়াছে। প্রত্যহ নিয়মিত সৎসঙ্গ হইতেছে। স্বামী মাধব তীর্থ ও যোগেশ ব্রহ্মচারীজী আসিয়াছেন। তাঁহারা সৎসঙ্গে প্রবচন করিতেছেন। একদিন ব্রহ্মচারীজী কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, "আমি বেদান্তবাদী নহি"। এই ভাবের কী কথায় মা বলিলেন "বাবা, কোনটা বাদ দিতে নাই। তবেই পরদা পড়িয়া গেল। সবটার মধ্যেই সবটা আছে। তবে কোন কোনও পথটা প্রধান এইমাত্র বলিতে পারো।"

আর একদিন রাত্রে একজন আর্য-সমাজের ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করিলেন "মনুষ্য-শরীরে তো কখনও পরমাত্মা আসিতে পারেন না; তবে মনুষ্য-শরীরে পূজার ব্যবস্থা কী করিয়া হয়?" বেশ একটু জোরের সহিত তিনি কথাটি বলিলেন। উত্তরে মা বলিলেন "মা! ঠিকই বলিয়াছ। মনুষ্য-শরীরে মনুষ্য-বুদ্ধিতে পূজা করিলে অপরাধই হয়। কিন্তু কুমারী পূজার বিধান, বাল-গোপালের পূজার বিধান এসব মনুষ্য-বুদ্ধিতে করা হয় না। তৎ-বুদ্ধিতে

করা হয়। আচ্ছা, গুরু-পূজার বিধান আছে ত? তাহা তো মনুষ্য-শরীরেই করা হয়। পাথরে শিবপূজা, নারায়ণ শীলার পূজায়—এসব কিন্তু পাথর-বুদ্ধি থাকিলে শিব-পূজা হয় না, শীলা-বুদ্ধি থাকিলে নারায়ণ পূজা হয় না।" আর্য-সমাজে গুরু-পূজার বিধান তো আছেই।" সেই মহিলা একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আর একদিন একজন কথা উঠাইল—"সেবা অথবা ভগবানের নাম—কি করা দরকার? কেহ কেহ বলিতেছেন সেবা বড়, কাহারও কাহারও মতে নাম বড়।" মা বলিলেন, "অধিকার অনুসারে কর্ম তাহারা নিজেরাই নিয়া নেয়। কাহারও কাহারও বসিয়া বসিয়া নাম করিতে মন বসেই না। তাহাদের পক্ষে সেবা করিয়া চিত্তশুদ্ধি ভাল। আবার দেখ, আসল কথা—নামে চিত্তশুদ্ধ না হইলে সেবা ঠিক ঠিক মত হয়ই না। আবার কাহারও সেবায় চিত্তশুদ্ধ হইলে তবে ঠিক ঠিক ভাবে নাম হয়। অধিকারী অনুসারে কথা। কেহ কেহ হয়তো বলিবে নাম হইতে সেবা বড়—এ কী রকম কথা? বড়-ছোটর কোনও প্রশ্নই নাই। শিখদের তো সেবাই বড়।" তার পরে আবার বলিলেন—"যত্র জীব তত্র শিব; যত্র নারী তত্র গৌরী।"

১৭ই মে ১৯৬০।

মা'র সঙ্গে এবার বেলু আসিয়াছে। সে শীঘ্রই বিন্ধ্যাচল চলিয়া যাইবে। আজ রাত্রে বেলু মাকে একান্তে একটি ঘটনা বলিল। ঘটনাটি এই—মা'র ঘরের পাশেই একটি ছাপরার ঘরে বেলু রাত্রে শুইয়া আছে; কেমন একটু স্বপ্নের মত ভাবে দেখিতেছে একজন আজানুলম্বিত বাহু কৌপীনধারী সাধু দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তিনি ইসারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মা কোথায়? বেলুও ইসারা করিয়া মা'র ঘর দেখাইয়া দিল। সাধু

সেই দিকে যাইতেছেন দেখিয়া বেলুও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া মায়ের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং দেখিল সাধু চলিয়া যাইতেছেন। বেলু বলিয়া উঠিল—"চলিয়া গেল"। কিন্তু সে তখনই দেখিল সাধু চলিয়া যান নাই, মা'র ঘরটি প্রদক্ষিণ করিয়া মা'র দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেই মাও হঠাৎ দরজা খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাকে দেখিয়াই সেই সাধুটি নিজের লম্বা লম্বা হাত দুখানি উঠাইয়া নৃত্যের ভঙ্গী করিলেন। পরে যেন আগুন বা জ্যোতির অক্ষরে মায়ের সামনে লিখিল "সনাতনী"; তার পরে "প" অক্ষরটি লিখিতেই মা হাত দিয়া সব অক্ষরগুলি মুছিয়া ফেলিলেন এবং হাত মুঠা করিয়া সাধুর ব্রহ্মতালুর উপর রাখিতেই হাতের মধ্য হইতে নক্ষত্রের মত জ্যোতিপুঞ্জ বাহির হইয়া সাধুর সর্ব অঙ্গে ঝরিতে লাগিল। পরক্ষণেই সাধু বা মা কেহই ওখানে নাই। বেলু অবাক্ হইয়া এইসব দেখিতেছে। তখনই উহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। যখন জ্ঞান স্বাভাবিক হইল তখন বেলু দেখে মা'র ঘরের দরজায় বেলু প্রণামের ভঙ্গীতে পড়িয়া আছে। সে ভাবিল: "এ কি! আমি এখানে?" শরীরটা যেন টলমল। সে বেড়া ধরিয়া ধরিয়া নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তখনও রাত্রি আছে। "প"-অক্ষরটা আমরা ভাবিলাম "পরব্রহ্ম" লিখিতেছিল কিনা কে জানে?

এখানে লোকের ভীড় ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। নন্দার ও নন্দার স্ত্রীর সেবা-ভাবের যেন তুলনা হয় না। করজোড়ে সর্বদা সকলের কাছে নিবেদন করিতেছে—সেবার ত্রুটি না হয়। অদ্ভুত ইহাদের শিষ্টাচার ও সেবাপরায়ণতা।

১৯শে মে ১৯৬০।

আজ মাকে প্রায় ১৪ মাইল দূরে সন্ধ্যায় বেড়াইতে নিয়া গেল। শুনিলাম ওখানে বিরাট স্থান নিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ওখানে

নাকি একটি নিমগাছ ছিল এবং মা নাকি তাহাকে খুব আদর করিয়া আসিয়াছেন। প্রত্যহই সৎসঙ্গের পর প্রায় সন্ধ্যা ৬৷৷৹টায় মাকে একটু বেড়াইতে নিয়া যাওয়া হয়।

. . .

২০শে মে ১৯৬০।

আজ ধ্রাংগাধ্রা রাজার বাড়ী হইতে মা'র ভোগ দিয়াছেন। আজই সন্ধ্যায় তাহাদের ওখানে যাওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

সন্ধ্যায় ধ্রাংগাধ্রা রাজার ওখানে যাওয়া হইল। রাণী ও রাজমাতাগণ মায়ের পূজা করিলেন। কীর্তনাদি হইল। রাজপরিবারের সকলে মিলিয়া মাকে গান শুনাইলেন। পরে তাঁহারা মা'র গান শুনিবার প্রার্থনা জানাইলেন। মাও "ধরো লও ধরো লও লওরে কিশোরী প্রেম"—গানটি গাহিলেন। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবে আসিয়াছে, মা'র সঙ্গে সঙ্গেই আছে। সেও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিল ও বাজনা বাজাইল। তাহার এখন কলিকাতায় খুব খ্যাতি হইয়াছে। অনেকগুলি প্রোগ্রাম ফেলিয়া সে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছে। এই রকমটা বড় কেহই করে না। তাই কলিকাতারও অনেকেই ইহাতে আশ্চর্য হইয়াছে ও বাধা দিয়াছে। কিন্তু ছবি মায়ের নিকট চলিয়াই আসিয়াছে। ছবির ভাবটা বেশ ত্যাগের। মায়ের কথামত পূজা ভোগ নিয়মিত ভাবে করিয়া যাইতেছে। গানে যেমন নাম হইয়াছে, এই ত্যাগের ভাবে আরও সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছে। এইভাবে এতগুলি প্রোগ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসার কথা উঠিলে মা হাসিয়া বলিলেন—"ইহাও রেকর্ড থাকিবে। সাধারণতঃ টাকা বা সম্মান ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে খুবই কম দেখা যায়।"

২১শে মে ১৯৬০।

এই সহরে একটা হল (Hall) আছে। সেখানে গুরুগ্রন্থ আছেন। সাধুরা প্রবচন দেন। সেই স্থানে মাকে নিয়া গেল। মা ফিরিয়া আসিলে সৎসঙ্গের পর নামযজ্ঞের অধিবাস আরম্ভ হইল। বীরেন সঙ্গেই আছে। স্থানীয় ভক্তদের আগ্রহে নামযজ্ঞের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ১২টার সময়ে ছেলেরা অধিবাস করিয়া চলিয়া গেল। মেয়েরা নাম ধরিল। ছবি ও এই বাড়ীর কর্ত্রী প্রমীলা এবং কানিয়ার স্ত্রী জয়াও আসিয়াছে, ইহাদের বিশেষ আগ্রহে। মেয়েরা সারা রাত নাম করিবে এইরূপ স্থির হওয়াতে মেয়েরা নাম ধরিয়াছে। মা সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা করিয়া উৎসাহ দিতেছেন। মা মেয়েদের গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। মেয়েরা মাল্য-চন্দনে সজ্জিত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম করিতেছে; কাহারো গলায় খোল, কাহারো গলায় হারমোনিয়াম। মহা আনন্দে নাম চলিতেছে। ছেলেরা কেহ সেখানে নাই। রাত্রি প্রায় ২টায় মাকে একটু বিশ্রাম করিতে কুঠিরাতে নিয়া আসা হইল। আবার ৪টার সময়ে মা কীর্ত্তনে গিয়া ৫টা পর্য্যন্ত সেখানে ছিলেন। নামও করিয়াছেন। ভোর ৫টায় ছেলেরা নাম ধরিল। নাম হইতেছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

২২শে মে ১৯৬০।

আজ সারাদিন নাম চলিতেছে। সন্ধ্যায় সমাপ্তি হইবে। কিন্তু সন্ধ্যায় সমাপ্তি না হইয়া, চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ করিয়া রাত্রি দশটার সময়ে নাম সমাপ্ত হইল। নাম কীর্ত্তন ও ভোগাদি খুবই সুন্দর ভাবে হইয়া গেল।

২৩শে মে ১৯৬০।

মায়ের শরীর খুব বেশী ভাল নয়—মাথার শব্দটা আজকাল খুব বেশী বলিতেছেন। কিন্তু সকলের সঙ্গে ব্যবহারের সময় তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। নিত্য নিয়মিত সৎসঙ্গাদি চলিতেছে। স্বামী মাধব তীর্থ আগামীকল্য চলিয়া যাইবেন। মা বলিতেছেন—বাবা কালই চলিয়া যাইবে? মাধব তীর্থজী বলিলেন—মা মনটা তো এখান হইতে যাইতে চাহে না। কিন্তু যাইতেই হইবে।

মা সৎসঙ্গ হইতে প্রায় ১০/১০॥টায় কুঠিয়ায় আসেন। আমরা চেষ্টা করি তখন মাকে বিশ্রাম দেওয়া যায় কিনা। কিন্তু তখন কাহারও কাহারও প্রাইভেট থাকে। তা ছাড়া মায়ের নিকট হইতে লোক সরানো মহা দায়। তবুও আমি চেষ্টা করি। এই করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত দিলীপ রায়ের নিকট হইতে দুই জন লোক তাঁর চিঠি লইয়া আসিয়াছে। তাঁহারা চিঠিখানি দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কখন আসিলে মায়ের দেখা হইবে। আমি লিখিয়া দিলাম কাল বেলা দশটার সময় যেন আসেন।

২৪শে মে ১৯৬০।

আজ বেলা প্রায় দশটায় দিলীপ রায় মহাশয় আসিয়াছেন। সঙ্গে ইন্দিরা দেবী এবং দুইজন সিন্ধি ভক্ত। কথায় কথায় দিলীপ রায় বলিতেছেন—"মা! আপনার মুখে সেই যে 'ধরো লও ধরো লও' কীর্ত্তনটি শুনেছিলাম, তা শুনবো।" প্রথমে মায়ের কুঠিয়াতে আনিয়া সকলকে বসানো হইয়াছিল। ভীড় বেশী হইবে বলিয়া মা সকলকে নিয়া প্যাণ্ডেলে

গিয়া বসিলেন। রায় মহাশয়কে গান করিতে অনুরোধ করায় তিনি হার্মোনিয়াম নিয়া বসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"মা! আপনি গান শোনাবেন তো? তা না হলে আমি গাইব না।" তারপর অবশ্য তিনি দুইটি গান গাইলেন এবং মাকে বিশেষ অনুরোধ করায় বিভু ও ছবি ব্যানার্জি প্রথমে "ধরো লও ধরো লও" গানটি আরম্ভ করিল। পরে মা-ও ধরিলেন। এই গানটি শেষ হইবার পরে রায় মহাশয় আবার মাকে অনুরোধ করিলেন "হে ভগবান হে ভগবান" গানটি গাহিতে। সেই গানটিও গাহিয়া মা বলিলেন—"বাবা! তোমার গানের পর আবার এইরূপ গান ধরা এই মেয়েটা ছাড়া আর কেহ করিবে না। কি বলো বাবা?" বাবা হাত জোড় করিয়া বলিলেন—"আর অপরাধী করবেন না। আপনার গানও আমার খুব মিষ্টি লাগে। আপনার কথাই যেন গান।" সত্যি, ইন্দিরাও অনেক সময় বলে—"মা'র কথা এতো মিষ্টি; এমন যেন শোনা যায় না।" মা-ও হাসিয়া বলিলেন—"ছোট্ট মেয়েটার তোতলা বুলি বাবার কাছে মিষ্টিই লাগে। এও তাই"। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা বিদায় নিলেন। ইন্দিরাকে গান করিতে বলায় তিনি বলিলেন—"আজ শরীর ঠিক নেই, আর একদিন এসে গান শোনাবো।" মা-ও হাসিয়া বলিলেন—"বেশ তাহলে আর একদিন আসতে হবে। মা যখন কথা দিয়েছে। ভালই হ'ল।" রায় মহাশয়ও বলিলেন—"কথা যখন দিয়েছে, আসতেই হবে।" স্থির হইল আগামী বৃহস্পতিবারে আসিবেন। ইনি নূতন আশ্রম করিয়াছেন। সেইখানে মন্দিরে সোম, বুধ ও শুক্রবারে বিশেষভাবে পাঠ ও আরতি হয়। ছবি মেয়েদের নিয়া আগামীকাল উঁহাদের ঠাকুর দর্শন করিতে যাইবে ইহাও স্থির হইল।

বীর, বীরের স্ত্রী কুমুদ, রমা, কমলা সবাই আসিয়াছে। কথায় কথায় শাশুড়ীর সঙ্গে ব্যবহারের বিষয় উঠিয়াছে। মা এমন সুন্দরভাবে সেই বিষয়ে বীরকে এবং বীরের স্ত্রীকে বলিলেন, বীর বলিতেছে—"মা! অপূর্ব তুমি!

এই সব বিষয়েও কি করিয়া এমন সুন্দর ভাবে বলো ? আবার যখন সাধুদের সঙ্গে বসিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথা বলো, তখনও অদ্ভুত। আবার এই সব বিষয়ে যখন বলো, তখন আশ্চর্য্য হই, কি করিয়া তুমি এই সব এতো জানো!" আমি হাসিয়া বলিলাম—"যিনি পূর্ণ হন। তিনি সব দিকেই পূর্ণ। তাঁহার অজানা অদেখা কিছুই থাকে না।" অনেকক্ষণ এই ব্যাপার চলিল। বীরের স্ত্রী আজ দিদিমার নিকট হইতে দীক্ষা নিল। তাই দিদিমাকে ও মাকে মাল্য ও বস্ত্রাদি দিয়া আরতি করিল। এই উপলক্ষ্যে মা'র ঘর হইতে লোক বাহির করা বড়ো কঠিন। অনেক চেষ্টায় ঘর খালি করিয়া মাকে বিশ্রাম দেওয়া হইল।

প্রায় পাঁচটায় মা সৎসঙ্গে প্যাণ্ডেলে যান। তাহার পর মাকে একটু বেড়াইতে নিয়া যাওয়া হয়।

২৫শে মে ১৯৬০।

নিত্য নিয়মিত কার্যক্রম চলিতেছে। এখানে গরম অনেক কম। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হয়। তাহাতে গরম আরও কমিয়া যায়। আজ কোহলাপুর হইতে মা'র দর্শনে দুইজন আসিয়াছে—একটি মধ্যবয়সী, দ্বিতীয়টি ১৯।২০ বছর বয়সের ছেলে। মা যখন প্যাণ্ডেলে গেলেন, তখন তাহারা মাকে দর্শন করিল' মা নাকি ছেলেটিকে দেখিয়াই তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে তাহার পরিচয়াদি নিজ হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন। ছেলেটির পিতা কোহলাপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ছেলেটি বি. এ পড়ে। নাম—দত্তবাল। মা'র সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছে।

মা উহার কথায় বলিতেছেন "ছেলেটির এখনো পর্যন্ত বেশ একটা

বিশেষত্ব আছে। এতো ঘটনা এমনটা বড়ো শোনা যায় না। আর কথা বলিলেও বেশ যেন বোঝে। কাজও করে। বলা হইয়াছে এখন তো বেশ ভাবটা—বেশ—কিন্তু ভয়ঙ্কর বয়স আসিতেছে। খুব সাবধান মত না চলিলে ভয় আছে।"

২৮শে মে ১৯৬০।

দিন দিনই লোক সংখ্যা বাড়িতেছে। মৌনের পর যোগেশ ব্রহ্মচারীজী অথবা আর কেহ মাকে প্রশ্ন করেন। নানা কথা হয়। দত্তবাল ছেলেটি রোজই আসে। কথাবার্ত্তা হয় একান্তে। হিন্দিও ভাল বোঝেনা বলিয়া ইংরাজীতে বুঝাইতে হয়। তাই কমলও থাকে। উহার কথায় মা আবারও বলিতেছিলেন—"অদ্ভুত ছেলে।" উহার প্রকাশ করিবার ভাব একেবারে নাই। কোনও কথাই কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে চাহে না; শুধু মাকে বলিতে চায়। পণ্ডিচেরীতে "মাদার" (mother)-এর নিকট কয়েক মাস হইল গিয়াছিল—তাঁহারই শিষ্য। তিনি নাকি মাথায় হাত দিয়াছিলেন। বলে তাহাতেই আমাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছুই নাকি হয় নাই। মা'র কাছে কয়দিন যাবৎ সব জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেছে। মা যদি বলেন—"গুরুর কাছে জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিয়া গুরু যাহা বলেন তাহাই করিবে", ছেলেটি জবাব দেয়—"আমার কাছে আপনার ও তাঁহার মধ্যে কোনও তফাৎ মনে হয় না। আপনার সঙ্গে দেখা করিতে কথাবার্ত্তা বলিতেই শুধু আমি আসিয়াছি।" মা বলেন—"উহার স্বাভাবিক ক্রমেই অনেকটা হইয়া যায়। কাজ করে, যাহা হইবার হইয়া যায়।" আশ্চর্য সব কথা!

কমল বলে—"এই ছেলেটিকে দেখিয়া মনে খুব আনন্দ হইতেছে যে তবুও একজনকে দেখিলাম। Mother একটা centre এদিকে খুলিয়া দিয়াছেন। এই ছেলেটির তাহাতে বক্তৃতা করিতে হয়।"

২৯শে মে ১৯৬০।

চিনু ভাই ও আরও একজন শেঠ আহমেদাবাদ হইতে মা'র দর্শনে আসিয়াছেন। তাঁহারা এখনই ফিরিয়া যাইবেন। খাইতে বলা হইতেছে। তাঁহারা খাইবেন না বলিতেছেন। মা হাসিয়া তাঁহাদের বলিলেন—"একটু খাইয়া যাও—সামনের খাওয়া ফেলিয়া যাইতে নাই।"

মায়ের একটি গল্প আছে—সে গল্পের চারটি উপদেশ—(১) ছোট যদি বড় হয়, বড়র মান্য করতে হয় (২) ছোটকে নিন্দা করিও না (৩) বড় ঘরের কথা বাহির করিও না (৪) সামনের খাওয়া ফেলিয়া যাইও না। সেই গল্পটি মা তাঁহাদের শুনাইলেন। তখন তাঁহাদের খুব আনন্দ হইল এবং প্রসাদ পাইতে রাজি হইলেন।

৩০শে মে ১৯৬০।

আজ মাকে কপুর সাহেবের বাড়ীতে নিয়া গেল। সেই বাড়ী যাওয়ার পূর্বে আরও একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বাড়ী নিয়া গেল। সেই স্থানটি ১৬ মাইল দূরে; কপুরের বাড়ী হইতে ৪।৫ মাইল। এখানে এবং কপুরের বাড়ীতে কীর্তনাদি হইল। যোগেশ ব্রহ্মচারীজীর অনুরোধে কপুরের বাড়ীতে

মা একটু নাম গান করিলেন। উপরোক্ত পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বাড়ী হইতে তুকারামজীর গ্রাম ৩।৪ মাইলের ভিতরে। সকলে মাকে তথায়ও নিয়া গেলেন। তুকারামজী যে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে পূজা করিতেন, সেই মন্দিরে নিয়া যাওয়া হইল। বহু বৎসরের পুরাতন মূর্তি। তুকারামজীরও রূপার মূর্তি স্থাপিত আছে। মা রাধাকৃষ্ণের মূর্তির মাথা হইতে পা পর্যন্ত হাত বুলাইয়া দিলেন। সকলে তুলসী নিয়া মা'র হাতে দিল (তুলসীপাতা মন্দির দ্বারে বিক্রয় হইতেছিল) মা তাহাও দিলেন। তুকারামজীর মূর্তিতেও হাত বুলাইয়া আসিলেন। জন্মস্থানটি এই গ্রামেই। তাহাও কেহ কেহ দেখাইল। আরও একটু দূরে তুকারামজী সশরীরে অপ্রকট হইয়াছিলেন। মা'র আর তথায় যাওয়া হইল না; সঙ্গীয় কেহ কেহ গেল। মৌনের পর কপুরের বাড়ী হইতে নন্দার বাড়ীতে আসা হইল। এখান হইতে কপুরের বাড়ী প্রায় ১০।১২ মাইল।

ইতিমধ্যে আর একদিন ভূতা সাহেবের স্ত্রী (যাঁহার বাড়ীতে মা গতবার ছিলেন) বম্বে হইতে আসিয়া মাকে তাঁহার বাড়ীতে নিয়া গেলেন, কীর্তনাদি হইল। পরে মাকে নিয়া সকলে মাদ্রাজীদের গণেশ মন্দিরে গেলেন। সকলের বিশেষ আগ্রহেই মাকে নানা স্থানে নিয়া যাওয়া হইতেছে। একদিন কির্কি-তে সীতারাম বাবার ভক্তরাও কীর্তনে মাকে নিয়া গেল।

৩১শে মে ১৯৬০।

আজ মাকে পাশের এক বাড়ীতে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে সঙ্গীয় মেয়েদের থাকিবার জায়গা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারাই আজ ভাণ্ডারা দিলেন। মিসেস্ ল' বিধবা। ইঁহার ভাইও দিল্লী হইতে আসিয়াছেন।

তিনি মা'র সঙ্গে একান্তে কথা বলিলেন। ভাই বোনের ভাবটি বেশ। শুনিলাম মিসেস্ ল' ও তাঁর স্বামী এখানকার এক বিশেষ সাধুর নিকট দীক্ষিত হন। পরে ভাইয়ের গুরুর নিকটও দীক্ষিত হন। ভাইয়ের নাম সুদর্শন। অল্পদিন হয় গুরু দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাই গুরুর জন্য মনটা বেশ খারাপ। মা'র সহিত গুরুর কথা অনেক বলিলেন। আর একটি বিশেষ কথা বলিলেন—ইনি অনেক দিন হয় শ্রীশ্রী মা'র নাম শুনিয়াছেন। কিন্তু গুরু আসিতে আদেশ দেন নাই বলিয়া দর্শন করিতে আসিতে পারেন নাই। মৃত্যুর পূর্বদিনে নাকি গুরু ইঁহাকে বলিলেন—তোমার এখন মাতাজীর নিকট যাওয়ার সময় হইয়াছে। এই মাকে প্রথম দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলেন। একথা তিনি বার বার বলিতেছিলেন। অনেক সময় মা'র সঙ্গে সঙ্গে আছেন। বেশ সৎ ভাব। ইনি বলিতেছিলেন—গুরুর কিছু আবশ্যকতা নাই। কথাপ্রসঙ্গে মা বলিলেন—"দেখ! এই যে এইটা করো, ওটা ক'রোনা, এই করলে এই হয়, ওটা করলে এই ক্ষতি হয়,—এই সব কথা জানবার জন্যই গুরু দরকার।" সে তখন গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করিল।

১লা জুন ১৯৬০।

আজ পণ্ডিত রাধেশ্যামজী ও আরও একটি ভদ্রলোক মা'র সঙ্গে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন। আমি ঘরেই ছিলাম। সঙ্গীয় ভদ্রলোকটি জ্ঞানবাদী তার্কিক। নন্দা ভাইও ইঁহার কথা মাকে বলিয়াছিলেন। মা তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"সেই দিন প্যাণ্ডেলে তুমিই না প্রশ্ন করিয়াছিলে নাম ভাল না সেবা ভাল?" তিনি বলিলেন—"হাঁ মা! আমিই সেই।"

অনেক কথাবার্তা হইল। মর্ম্মার্থ এই—মা বলিলেন, "নাম করিতে করিতে সবই হয়। কিন্তু সকলের মধ্যে সব কথা হয় না। সকলের ভাব সমান নয় ত। তাই সমষ্টি ভাবে কথা বাহির হয়। কাহারও কাহারও হয়তো নামে মন বসেই না। তাহাকে সেবার মধ্য দিয়াও যাইতে বলা হয়। আর ঠিকই কাহারও নাম প্রধান। কাহারও সেবা প্রধান হয়। কেহ কেহ নাম করিতে করিতে নিষ্কাম সেবার অধিকারী হয়। আবার কেহ কেহ নিষ্কাম সেবা করিতে করিতে প্রকৃত নাম করিবার অধিকারী হয়। কাজেই সবটাই দরকার।" ঐ ভদ্রলোকটি প্রথমে যেন একটু তর্কের ভাব নিয়াই বসিয়াছিলেন। মা'র কথায় বেশ সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার জিজ্ঞাসায় মা তাঁহাকে মনস্থির করিবার প্রণালী কিছু কিছু বলিয়া দিলেন। মনে হইল তিনিও কাজ করেন। মা বলিলেন—"এই ভাবে কাজ করিয়া যাও, ইহাতে তন্ময়তা আসিতে পারে। সকলকে এসব কথা বলা হয় না। তোমরা যেমন বলাইয়া নিলে বলা হইল।"

সেই ভদ্রলোকটির নাম চিমন্‌লাল। ইনি এখানে সেবার কাজও করিতেছেন। হাতজোড় করিয়া বলিলেন—"মা, এই পর্যন্ত আমার অনুভব হইয়াছে ; এর আগে আমাকে বলিয়া দিও।" মা হাসিয়া বলিলেন— "পিতাজী! পাকা অনুভব হয় নাই। স্থিতি হওয়া চাই। অর্থাৎ যেখান হইতে আর ফিরিয়া না আসিতে হয়। আর দেখ, আম পাকিলে বলিতে হয় না যে পাকিয়াছে। আপনিই তাহার প্রকাশ হয়।" তখন চিমন্‌লালজী বলিলেন—"হাঁ মা! আমি করিতেছিলাম ; পরে সব বন্ধ করিয়া দিয়াছি।" মা বলিলেন—"তাই বলিতেছিলাম লক্ষণ প্রকাশ হওয়া চাই, বন্ধ করিলে চলিবে না। একাধারে হয়তো দশ/পনেরো বছরও লাগিতে পারে।" আরও একান্তে অনেক কথাবার্তা হইল। তিনি নিরাকার—নিরাকার বলিতেছিলেন। মা বলিয়া দিলেন—"সাকার নিরাকার একই, জলই বরফ হয়, বরফই জল হয়।" ভদ্রলোকটি খুবই খুশী হইয়া গেলেন। তিনি

বলিলেন—"মা আজ আমাকে বড়োই কৃপা করিলেন।" মা চলিয়া যাইবেন, তখন নিজের অবস্থা কি করিয়া মাকে জানাইবেন, তাই মাকে বলিতেছেন "এখনই আরও কিছু আগে বলিবার মত বলিয়া যাও।" মা বলিলেন "তাহা ঠিক নয়। সময়ে সবই হইয়া যায়, যদি সঠিক তাঁর উপর নির্ভর করিয়া কাজ করা হয়।" আমি বলিলাম—"যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, মা যেখানে থাকিবেন খবর নিয়া সেখানে চলিয়া আসিবেন।

সন্ধ্যায় ৺মহেশ ভট্টাচার্যের ছেলে হেরম্ব বাবুর জামাই শশাঙ্ক ও মেয়ে গীতা আসিয়াছে। আরও দু চার জন আসিয়া মা'র ঘরে বসিয়াছেন। কপুর ও তাঁর স্ত্রীও আসিয়া বসিয়াছেন। কপুর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা পাপ কী? পুণ্য কী? মা বলিলেন—"যে কাজে ভগবানের দিকে নিয়া যায়, তাই পুণ্য; যে কাজ ভগবানের নিকট হইতে দূর নিয়া যায় তাহাই পাপ।"

২রা জুন ১৯৬০।

আজও প্রতিদিনের মত বেলা প্রায় এগারোটার সময় মা প্যাণ্ডেলে সৎসঙ্গে গেলেন। আজ মা যোগেশ ব্রহ্মচারীজীর অনুরোধে খানিকটা কীর্তন করিলেন। "ধরো লও ধরো লও" কীর্তন এবং "হরিবোল হরিবোল" নাম করিলেন।

খুবই আনন্দ চলিতেছে। অনেক গৃহস্থরা গৃহকর্ম ফেলিয়া মাতৃদর্শন ও সৎসঙ্গে যোগদান করিবার জন্য প্রতিদিন এখানে মিলিত হইতেছেন। বম্বে হইতেও অনেকে আসিয়া এখানেই আছেন। অনেকেই বলিতেছেন কাহারও আর কোন কথাই যেন মনে হয় না। কী বার, কোন্

তারিখ তাহা অনেকেরই ভুল হইয়া গিয়াছে। সকলেই যেন একটা আনন্দের মধ্যে ডুবিয়া আছে।

মাকে আজ বিকাল বেলা স্থানীয় বিরাট মিলিটারি কলেজে লইয়া গেল। বেড়াইবার সময় প্রত্যহই কোথাও না কোথাও নিয়া যাওয়া হইতেছে।

৪ঠা জুন ১৯৬০।

আজ শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার কিছুদিন মায়ের সঙ্গে থাকিবার কথা। বম্বে হইতে এক ভদ্র মহিলা মহারতনজীর সঙ্গে আসিয়াছেন। শুনিলাম মণিপুর রাজপরিবারের মেয়ে—নাম সরোজ। মহারতনের মেয়ে বিমলার সঙ্গে এক বাড়ীতে উপরের তলায় থাকে। বিমলার সঙ্গে খুব ভাব। ইনি মহারতনের সঙ্গে আসিয়া মায়ের সঙ্গে প্রাইভেট করিলেন। যাহা শুনিলাম ঘটনাটি এই :—জন্মোৎসবের সময় মহারতন নাকি বিমলাকে বলিয়াছিল ইহাকে মায়ের নিকট নিয়া যাই। ইহার যাইবার খুবই আগ্রহ। কিন্তু বিমলা নাকি বলিয়াছিল ইহার স্বামীর বিশেষ মত নাই, তাই নিয়া যাওয়া ঠিক হইবে না। সেইজন্য আর নিয়া যাওয়া হয় নাই। ইনি কখনও মাকে দেখেন নাই। একদিন প্রায় রাত্রি ১২টার সময়ে বিমলা প্রসাদী ফুল ফল লইয়া বাড়ী ঢুকিতেছে সেই সময়ে সরোজ বহিন ও তাহার স্বামীও বাড়ী ঢুকিতেছিলেন। দেখা হইতেই সরোজ নাকি বিমলার হাত হইতে একটি আম ও একটি হলদে ফুল নিয়া বলিল—"মা তোমার একলার নয়, আমারও মা ; তাই মায়ের আশীর্বাদ ও প্রসাদ আমিও নিব।" পরে রাত্রে শুইবার সময়ে সেই ফুলটি বুকে রাখিয়া সে শুইয়া পড়িতেই স্বপ্ন দেখিতেছে মা যেমন গরমের সময় চুলগুলি উল্টাইয়া নিয়া মাথায় ঝুঁটির

মতন বাঁধিয়া রাখেন সেই রকম করিতেছেন। আর সরোজকে দেখিয়া বলিতেছেন—"বেটী, তুমি আমার কাছে আস।" সে কাছে আসিতেই মা নাকি বলিতেছেন—"বেটী, তুমি সর্বদা ভগবানকে স্মরণে রাখিবে। আমার কাছে যাওয়া-আসা করিও।" স্বপন দেখিয়াই সে মায়ের কাছে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইল। পরে এখানে আসিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া মায়ের কাছে আসিয়াছে। চোখের জল ফেলিয়া হাত জোড় করিয়া কেবলই মাকে বলিতেছে—"মা আমাকে চরণে রাখিবেন। আমি যেন ভগবৎভাবে থাকিতে পারি" ইত্যাদি। সন্তান নাই। মা বলিলেন—"এই শরীরই তোমার সন্তান। তুমি বিশ্বাস করিও এই মেয়েটা সর্বদাই তোমার কাছে আছে। আর প্রথম স্বপ্নে যে-ভাবে দেখিয়াছ সেই ভাবেই মনে রাখিও।" আরও সে অনেক কথা বলিল। শুনিলাম তাহার পিতা-মাতা সন্ন্যাস নিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা নাকি একই সময়ে বেলা প্রায় ১০॥০টায় হাতে ফুল নিয়া পূজা করিতে করিতে দুই জনেই এক সঙ্গে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আর মৃত্যুর পূর্বে মেয়েকে চিটি দিয়া গিয়াছেন যে "যখন এই চিঠি তোমার কাছে পৌঁছিবে তখন আমরা ভগবানের চরণে চলিয়া যাইব। তুমি দুঃখ করিও না। কেহ কাহারও নয়। একাই আসিয়াছ, একাই যাইতে হইবে। একমাত্র ভগবানেরই চিন্তা করিবে। আর কেহই কাহারও নয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশ ভদ্র মহিলা। মা-ও বলিয়াছিলেন—"যখনই ইচ্ছা হইবে এই শরীরের কাছে চলিয়া আসিবে।"

৫ই জুন ১৯৬০।

মাকে আজ মিলিটারীদের শিবমন্দিরে এবং সংস্কৃত কলেজের যেখানে ভিত্তি স্থাপন হইবে সেইখানে আগ্রহ করিয়া নিয়া গেল। কবিরাজ মহাশয়,

যোগেশ ব্রহ্মচারীজী এবং আরও কয়েকজন ভক্ত ৩।৪ খানা গাড়ীতে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। প্রায় ৮টায় রওনা হইয়া প্রায় ১১টায় ফিরিলেন।

মন্ত্রী শ্রীগুল্‌জারীলাল নন্দা গত কাল মাতৃদর্শনে আসিয়াছিলেন। ইনি এই পরিবারের আত্মীয়। মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ সদালোচনা করিলেন। ইনি সাধু সমাজ অর্থাৎ সাধুদের একত্রিত করিয়া যাহাতে দশের ও দেশের কল্যাণ হয় সেইজন্য উপযুক্ত সাধুদের দ্বারা সকলকে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। সাধুদের মধ্যে এবং জনসাধারণের মধ্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা অসদ্ব্যবহার ইত্যাদি যাহাতে দূর হয় সেইজন্য বিশেষ পরিশ্রমও করিতেছেন। মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন যাহাতে এই কার্য সফল হয়। মাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন কিভাবে ইহা বাস্তবিক পরিণত হইতে পারে। মা একটু বলিলেন—"শিশুকাল হইতে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠন শিক্ষা-প্রণালী বিশেষ দরকার। যেমন পূর্বে ব্রহ্মচর্য আশ্রম ছিল। মূল ভিত্তি ব্রহ্মচর্য আশ্রম ঠিক থাকিলেই পরে গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই তিনটা আশ্রম ভাল ভাবে হওয়ার আশা।" ইনিও একথা স্বীকার করিলেন। বলিতেছেন "পিতামাতার নিকট শিশুদের প্রথম শিক্ষার স্থান। তাহা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পিতামাতার নৈতিক জীবনও যে ভয়ানক ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা হইল। দেখিলাম ইহার যেন এই জন্য বাস্তবিক একটা প্রবল আগ্রহ, শুধু বাহিরের কাজ না। কি করিয়া এই দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে সৎপথে নেওয়া যায় সেইজন্য প্রবল একটা ইচ্ছা।

শুনিলাম ইহার ছোট বেলা হইতেই সৎপথে থাকিয়া জনসাধারণের সেবার ভাব ছিল। উচ্চশিক্ষিত হইয়াও গবর্ণমেণ্টের অনুরোধেও বড় চাকরি নেন নাই। সাধারণভাবে জীবন-যাপন করিয়া জনসাধারণের সেবা করিয়াছেন। মজুরদের শিক্ষা, তাহাদের সৎপথে চালনা করা এই সব কাজে ছিলেন। ঘটনাচক্রে আজ এই পথে আসিয়াছেন।

আজ তিনি এখানেই দুপুরে আহার করিলেন। বলিয়া গেলেন তিনি

আজ বিকালে আসিয়া মায়ের কাছে একটু বসিবেন। বৈকালে প্রায় ৬টার সময়ে আসিয়া তিনি মায়ের ঘরে একা কিছুক্ষণ বসিলেন। পরে মা বলিয়াছেন—"এমন সুন্দর আসন করিয়া বসিল—আধ ঘণ্টা বসিল একেবারে স্থির ; তোমরা statue না কি বলো সেই রকম। বলিল রোজই এই রকম বসে।" পরে মা বাহিরে ময়দানে বসিলে সকলে সেখানে বসিল। নন্দাজীও বসিলেন। যোগেশ ব্রহ্মচারীজীর কথায় তিনি উপস্থিত ধর্ম সম্বন্ধে কী দরকার সেই বিষয়ে একটু বলিলেন। তারপরে মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীযুক্ত কাট্জুও এখানে আসিয়াছেন। তিনিও মাতৃদর্শনে আসিলেন এবং মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

একজন পার্শি দাঁতের ডাক্তার মায়ের নিকট প্রায়ই আসেন। মা একদিন একান্তে আমাকে বলিলেন—"দিদি! কী দেখেছি জানিস্? ঐ ডাক্তারটি যেন এই শরীরের নিকট আসিয়া বলিতেছে 'কিছু দিন।' সেই ভদ্রলোক কালও মায়ের নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই কথা কিছু বলিলেন না। মা-ও অবশ্য এইরূপ দেখিয়াছেন কিছু বলিলেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজ সেই ভদ্রলোক আসিয়া বলিতেছেন মায়ের সঙ্গে একান্তে কথা আছে। কথা বলিতে গিয়া ঠিক ঐ কথাই বলিলেন—'মা, তুমি আমাকে কিছু দাও।' পরে মা বলিলেন—"যেখানে যেমন ভাবে বসা দেখা হইয়াছিল ঠিক ঠিক তাই।"

আজ এখানকার একজন বড়ো অফিসার তাঁহার স্ত্রীকে নিয়া আসিয়াছেন। ৺সুধীন মজুমদারের বোনের সঙ্গে আসিয়াছে। তাহারাও একটি ঘটনা বলিল। ঘটনাটি এই :—এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর পিঠে একদিন ভয়ানক ব্যথা, নড়িতেও পারে না, ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে। এর মধ্যে একদিন স্বপ্ন দেখিতেছে মা উহার নিকট গিয়া দাঁড়াইতেই সে প্রণাম করিল। মা নাকি তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন। তখনই তাহার মনে হইল ব্যথা একেবারে নাই। জাগিয়া দেখে সত্যই তাহার ব্যথা একেবারেই নাই। আজও মহিলাটি মাকে

প্রণাম করিতেছে, তাহার স্বামী মাকে বলিল—"মা আপনি উহার পিঠে একটু হাত দিয়া দেন।" মা একটু হাসিয়া যেমন বলেন—"নারায়ণ নারায়ণ। এক তিনিই তো সব!"

১৬ই জুন ১৯৬০।

মা, হরিবাবা উপস্থিত। সৎসঙ্গে সকলেরই বেশ আনন্দ চলিতেছে। রাস, মহাপ্রভুর লীলা সবই চলিতেছে। স্থানীয় লোক অনেক উপস্থিত হইতেছে। ঝালোয়ারের রাজমাতা, ধ্রংগধ্রার রাজমাতা ও রাণী, প্রতাপগড়ের রাজমাতা, করোলীর রাজপুত্রবধূ প্রভৃতি অনেকেই প্রত্যহ আসিতেছেন। ইঁহারা সকলেই ভাণ্ডারাও দিতেছেন। নন্দার বাড়ীতে যেন মহোৎসব চলিতেছে। নন্দা সস্ত্রীক কিভাবে এতো লোকের সেবা প্রাণ দিয়া করিতেছে দেখিবার বিষয়।

আজ রাত্রিতে বেশ একটা সুন্দর ঘটনা ঘটিয়াছে। সন্ধ্যার কীর্ত্তনের পর হরিবাবা যখন ভক্তকথা বলিতেছিলেন তখন মা হঠাৎ পিছন ফিরিয়া বিল্লোজীকে কিছু বলিলেন। ভক্তকথা হইয়া গেলে শোভন ব্রহ্মচারী হরিবাবাকে প্রশ্ন করিল—"বাবা! আমাদের একটা আবেদন আছে। আমরা তো ভগবানের পথে যাইতে চাই, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন বিঘ্ন আসে যে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা বরং অন্য দিকে চলিয়া যাই। অথচ শাস্ত্রে লেখা আছে যে আমরা যদি ভগবানের দিকে এক পা অগ্রসর হই, তবে তিনি সাত পা অগ্রসর হইয়া আসেন। বাস্তবে তো ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখা যায়। এর উদ্দেশ্য কি?" হরিবাবা উত্তরে বলিলেন—"বিঘ্ন আসা তো স্বাভাবিক, কারণ ইহাতে ধৈর্য্য বাড়ে এবং ভগবানকে পাওয়ার

জন্য ব্যাকুলতা আসে। সুতরাং আধ্যাত্মিক যে প্রতিবন্ধতা আসে, সেটা তাঁর কৃপা মনে করিয়া নিতে হইবে।" এ উত্তরে কেহ তৃপ্ত হইল মনে হইল না। বীরেন, বিভু শোভনের সঙ্গে যোগ দিয়া বলিতে লাগিল—"বাবা! আমাদের উপর কৃপা করিতেই হইবে। দিন তো প্রায় শেষ হইয়া আসিল কিন্তু আমাদের তো কিছুই হইল না।" মা মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"এটা বেশ হয়েছে যে তোরা বাবার কাছে প্রাণের কথা খুলে বলতে পেরেছিস।"

শোভন, বীরেন প্রভৃতির এই কাতরতা উপস্থিত সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। হরিবাবা তখন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"উর্দ্দুতে একটা কবিতা আছে, তার ভাবার্থ এই: হে প্রভু আমাদের কিস্তী তো ডুবিতেছে, তুমি আমাদের দেখো।"

শোভন এই কথা শুনিয়া খুশী হইয়া বলিল—"বেশ হইয়াছে, মা! আমাদের অন্তিম দিনে তোমার দৃষ্টি কিন্তু আমাদের উপর থাকিবে।"

উপস্থিত সকলের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নিরাশার ভাব যেন দূর হইয়া গেল।

ইহার পরে হরিবাবা চলিয়া গেলেন। মা প্যাণ্ডেল হইতে বাহিরে আসিলেন। একটু বাদে মা পুষ্পকে একান্তে ডাকিয়া কিছু বলিলেন। পুষ্প প্যাণ্ডেল-এ চলিয়া গেল। মা-ও প্যাণ্ডেলে আসিয়া খাটের উপর বসিলেন। পুষ্প মায়ের নির্দেশ মত গান করিতে লাগিল—

"হে ভগবান হে ভগবান
অপরাধ ক্ষমা করো।
ভুলে হুয়েকো সুধারো
হে প্রিয়, সুধারো—সুধারো—সুধারো
কৃপা করো, দয়া করো
জ্বালা নিবারো—নিবারো—নিবারো।"

মা-ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক সুমিষ্ট স্বরে গাহিতে লাগিলেন। গানের পদ তো এইটুকু মাত্র। কিন্তু মায়ের এমন একটি অপূর্ব সুর যে একটা দিব্যভাবে সকলের মন ভরিয়া গেল। যে-কাতরতা শোভন প্রভৃতির প্রশ্নে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই যেন এই কীর্ত্তনে ফুটিয়া উঠিল। প্রকৃত পক্ষে প্রশ্ন উঠিবার আগেই মা বিল্লোজীকে ঐ দুই লাইন (line) বলিয়াছিলেন। গানের ভিতর দিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। ভগবানের কাছে আমাদের প্রার্থনা কি রকম হওয়া উচিত—তাহাই এই সংক্ষিপ্ত গানের মধ্য দিয়া অত্যন্ত মার্মিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গানের পদ, সুর, তাল বড়োই মর্মস্পর্শী।

পরের দিন লোকমুখে এই সব কথা শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মায়ের মুখে এই গান শুনিতে চাহিলেন। গান এবং কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কী সুন্দর! মা যেন আমাদের সকলের প্রতিনিধি হইয়া ইহা রচনা করিয়াছেন। সুরের মধ্যে ভগবানের নিকট যেন আকুল আবেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

গত ৭ই জুন মায়ের পরমভক্ত পরশুরামজী দেরাদুনে দেহরক্ষা করিয়াছেন—এই খবর আসিয়াছে। নরেশের চিঠিতে জানা গেল যে পরশুরামজী মৃত্যুর দিন সন্ধ্যাবেলা নরেশের বাড়ীতে গিয়া তাহাকে দেরাদুনের মন্দির বাবদ ৫০০৲ টাকা দিয়া স্বামী পরমানন্দকে পাঠাইতে বলিয়াছে। তিনি রায়পুর আশ্রমের খরচ কিছু দিতেন। তাহাও তিনি নরেশের হাতে দিয়া বলিয়াছেন—'কিছু তো বলা যায় না। আমি ঋণ রাখিতে চাহি না।' রাত্রিতে তিনি নিজের ঘরে শুইয়া পড়েন। পরের দিন সকালবেলা তাঁহার ঘরে গিয়া দেখা গেল তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। কখন মারা গেছেন কিছুই জানা যায় নাই। যেদিন পরশুরামজীর দেহান্ত হয় সেদিন মা আর সৎসঙ্গে যান নাই। অনেকক্ষণ একলা ঘরে শুইয়া ছিলেন। সেই সময়ে মায়ের ভাব দেখিয়া অনেকেরই মনে হইয়াছিল কাহারও কিছু হয় নাই ত? পরশুরামজী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। মা বলিয়াছিলেন, "এইরূপ

চরিত্রের ব্যক্তি কম দেখা যায়।” বাস্তবিক পক্ষে পরশুরামজীর মত নীরব কর্ম্মী বড়ই দুর্লভ। পরশুরামজীর মৃত্যুতে আমাদের সকলের মনে খুবই আঘাত লাগিয়াছে।

২০শে জুন ১৯৬০।

কাল রাত্রিতে মৌনের পর ট্রাঙ্ক কল আসিয়াছে কলিকাতা হইতে—রাহুল ভাইয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। সে হাসপাতালে আছে। মা খবর শুনিয়া বলিলেন—তোমরা রাত্রি বারোটার সময়ে ট্রাঙ্ককল করিয়া বেবীকে বলো ‘ধৈর্য্য ধরো, খবর দাও।’ পরে সকলে ঠিক করিল বারোটার সময়ে না করিয়া ভোর পাঁচটার সময়ে টেলিফোন করা হইবে। রাত্রি প্রায় এগারোটার সময়ে মা প্যাণ্ডেলে শুইতে গেলেন। আমরা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। মা খাটে বসিয়া একটু বাদে বলিতে লাগিলেন “পরশুরামজীরও মৃত্যুর দিন মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল। রাহুলের কি শরীর খারাপ রাত্রিতেই হইয়াছে?” আমি বলিলাম—“হাঁ, মা! রাত্রিতেই অবস্থা খারাপ হয়।” মায়ের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমাদের অনেকের মনে হইল এযাত্রা বোধ হয় রাহুলের রক্ষা নাই। মা শুইয়া পড়িলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম। মায়ের কাছে পুষ্প, বিল্ব, শোভা এবং চন্দন শুইয়া রহিল। ভোর ৪টার সময়ে ট্রাঙ্ক কল্-এ খবর আসিল রাহুল রাত্রি প্রায় দেড়টার সময়ে মায়ের কোলে আশ্রয় পাইয়াছে। আমরা আর তখন মাকে খবর দিলাম না, কারণ রাত্রিতে মায়ের যে শুইবার ভাব ছিল না তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। সকালবেলা বাথরুমে মুখ ধুইতে ধুইতে মা বলিলেন যে কাল রাত্রি প্রায় ২টার সময়ে মা প্যাণ্ডেল হইতে ঘরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। প্যাণ্ডেল হইতে আসিবার সময়ে মা পুষ্পকে বলিয়াছেন “গান গাইলো” পুষ্প বলিল ‘কে’? মা

বলিলেন—"আমিই গাইলাম—'হরিনাম লিখে দিও অঙ্গে, আমার প্রাণ যেন যায় হরিনামের সঙ্গে।'—এই দুই লাইন করিতেছিলাম।" প্রকৃতপক্ষে পুষ্প বা অন্য কেহ মাকে রাত্রিতে গান গাইতে শোনে নাই। তারপর মা বলিলেন—"দেখ দিদি! দেখলাম কি একটা শাদা ঝক্‌ঝকে মূর্ত্তি এসে দাঁড়ালো, চারিদিকটা যেন থম্‌থম্ করছিল, সমস্ত বায়ুমণ্ডলটা যেন কি রকম হয়ে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রোজ রাত্রে চৌকীদার লাঠি ঠক্ ঠক্ করে পাহারা দেয় কিন্তু আজ আর সে ছিল না। চারিদিক নিস্তব্ধ কোনও শব্দ নাই। মূর্ত্তিটা আসতে আমি তাহাকে সৎসঙ্গে আমার বসবার খাট দেখিয়ে বললাম—ঐখানে থাকো। খাটের উপর যে-চাদরটা পাতা থাকে, সেটাও পরিষ্কার চোখের উপর ভেসে উঠল। খেয়াল হল ও তো এখানে রইলো, এরা আবার ভয় না পায়। এজন্য পুষ্প এবং আর যারা ছিল তাদের ঘরে চলে আসতে বলা হ'ল।" মা আরও বলিলেন—"তোমরা ত আমাকে কোনও খবর দেও নাই। আমি রাত্রিতেই পুষ্পকে এ সব কথা বলেছি।"

আজ সকালে সৎসঙ্গে আবার এই কথা উঠিল। মা কবিরাজ মহাশয়কে সব বলিলেন। ইহাও আমাদের মনে হইল যে যেটা রাহুলভাইয়ের করার কথা, মা সেটা গানে সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন। বিশেষ ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। আজ সারা দিন ও রাত্রি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রসঙ্গই চলিতে লাগিল। ছবি কাল কলিকাতা যাইতেছে। মা আমাকে দিয়া রাত্রি বারোটার সময়ে বেবীকে চিঠি লিখাইলেন। চিঠি লিখিতে লিখিতে প্রায় দুইটা বাজিল। চিঠি ছবির সঙ্গে দেওয়া হইল। মা কথায় কথায় প্রকাশ করিলেন—"এ শরীরটার উপর রাহুলের বিশেষ টান ছিল।" কবিরাজ মহাশয়কে মা বলিলেন—"দিদি প্রায়ই বলে মানুষের বাহিরের ভাব দেখিয়া বিচার করা আমাদের মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না, কারণ যাহাকে আমরা অতি সাধারণ মনে করি, তাহাদেরই গতি অনেক সময়ে এমন অপূর্ব হয় যে তাহা অনেক সময়ে সাধু

মহাত্মাদের পক্ষেও দুর্লভ।" মা আরও বলিলেন—"বেবীর সবটাই ভাসিয়া উঠিতেছে।" কলিকাতা হইতে চিত্রার মা'র যে-চিঠি আসিয়াছে, তাহাতে খবর পাইলাম যে শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত রাহুল ভাইয়ের হাতে মায়ের ছবি ছিল। বাস্তবিক এরূপ সুন্দর গতি খুবই অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

২১শে জুন ১৯৬০।

গতকাল মা রাত্রি বারোটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত চার ঘণ্টা মায়ের চৌকীর পাশে মেয়েদের জপ করিতে বলিলেন। এক এক জনের পর এক একজন বসিতেছে। প্যাণ্ডেলেই মা শুইতেছেন। সেইখানেই জপ হয়।

আজ সকালের সৎসঙ্গের পর রামটিকৃরীর শারদারাম উদাসীন বাবার ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে মা ও হরিবাবা তাঁহার আশ্রমে যান। আশ্রমটি খুবই সুন্দর, পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা যখন গেলাম, তখন আসন হইতে বাবা উঠেন নাই। মাকে এবং হরিবাবাকে ভক্তরা আশ্রম দেখাইতে লাগিল। আশ্রমে গুরু নানকের মূর্তি আছে। গুরু নানকের কাছে গ্রন্থসাহেবও রক্ষিত আছেন। গুরু নানকের দুই পুত্র ছিলেন; একজন সাধু হইয়া যান, অপর জন গৃহস্থ ছিলেন। যিনি সাধু হইয়া যান, তিনিই নাকি এই উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁহার একটি মন্দির আছে। শারদারাম বাবা যে গুহাতে বারো বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন সেই জায়গাটি দেখিলাম। মা যখন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া দেখিতেছিলেন, তখন শারদারাম বাবা মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মাকে "হল"-ঘরে নিয়া বসাইলেন। "হল"-ঘরটি বেশ সুন্দর। মা কিছুক্ষণ বসিলেন। একটু কীর্তন হইল। শারদারাম বাবার ভক্তরা দুধ ফল মিষ্টি দিয়া মায়ের ভোগ

দিল। হরিবাবা, কবিরাজ মহাশয় সকলেই মহাত্মাকে দেখিয়া খুব খুশী। তাঁহারা বলিলেন এখন এরূপ কঠোর তপস্বী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

২২শে জুন ১৯৬০।

আজ সন্ধ্যা ৭টার সময়ে মা ও হরিবাবাকে দর্শন করিতে শারদারাম উদাসীন বাবা আমাদের এখানে আসেন। তিনি যে আসিবেন তাহা আগেই জানা ছিল। হরিবাবা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। ফল, মালা, মিষ্টি, বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করা হইল। তিনি অল্প সময় ভাষণ দিলেন। প্রায় সাড়ে নয়টার সময় তিনি শিষ্য এবং ভক্তসহ মায়ের কাছ হইতে বিদায় নিলেন।

২৩শে জুন ১৯৬০।

আজ বিকালের সৎসঙ্গের পরে মা প্যাণ্ডেলের বাহিরে বসিলেন। একটু পরে মা পুষ্পকে ডাকিতে লাগিলেন। পুষ্প আসিলে মা বলিলেন "গানটা কর।" পুষ্প বলিল তাহার গান মনে পড়িতেছে না। মায়ের হাতের সামনে একটা ছবি ছিল। মা তাহা দিয়া পুষ্পকে একটু স্পর্শ করিলেন। একটু পরেই পুষ্প গাহিতে লাগিল :—

হরিনাম বিনা সুখ নাই—নাই—নাই
হরি হরি ভজ মন প্যারে।

মা বলিলেন "আজ দুপুরে যখন শুয়ে ছিলাম তখন দেখলাম বিভূ তন্ময় হয়ে এই গানটা করছে। পুষ্প কাছে ছিল ; তাকে পরে আমি গানটা শুনালাম। পুষ্পকে বলা হ'ল—"যখন বলবো তখন এই গানটা করবে।" পুষ্প গানটা একদম ভুলিয়া গিয়াছিল। মায়ের স্পর্শেতেই তাহার মনে পড়িয়া গেল। মা এর পরে পুষ্পকে প্যাণ্ডেলে যাইয়া গানটা করিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন 'বিভূকে এটা সঙ্গে সঙ্গে করতে বললাম।' মা নিজেই একটু পরে প্যাণ্ডেলে গিয়া বসিলেন। বিভূ গানটা ধরিল। মা-ও সঙ্গে সঙ্গে গাইতে লাগিলেন। মা করতাল বাজাইয়া বাজাইয়া স্বাভাবিক মধুর স্বরে গাইতে লাগিলেন। মা বিভূকে বলিলেন—"হরিবাবা না আসা পর্যন্ত এটা করতে থাকবি।" তারপর মা নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

আর একদিন রাত্রে রাজমাতাগণ এবং রাণীগণ (রাজমাতা ধ্রংগধ্রা, রাজমাতা প্রতাপগড়, রাজমাতা যোধপুর, রাজপুত্রবধূ করোলী) মেয়েদের ও সেবিকাদের নিয়া মায়ের কাছে আসিয়া একটু বেশী রাত্রে গড়বা নাচ, রাসলীলা নাচ ইত্যাদি নানা ভাবে নাচিয়া গান করিতে লাগিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভোর হইয়া নাচিতেছে, গাইতেছে। পূর্বেই মা পুরুষদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভক্তিভাব দেখিয়া সকলেরই খুব আনন্দ হইল। মন্দিরে ও দেব-দেবীর সামনে এদেশের স্ত্রীলোকদের এইভাবে নাচিয়া নাচিয়া গান করা খুবই আনন্দ ও ভক্তির বিষয়। সত্যই সকলেই যেন এই ভাবে ভাবিত হইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। সকলকে খবরও দেওয়া হয় নাই, কারণ তাহা হইলে ইহারা মায়ের কাছে খোলা ভাবে এই আনন্দ করিতে পারিবে না। রাত্রি অনেক হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহারা বলিতেছেন—"মা মন ভরিতেছে না। সারা রাত চলিলে বেশ হইত।" সুন্দর ভাবে মগ্ন হইয়া ইঁহারা নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছেন। আবার ধ্রংগধ্রার রাজমাতার দুই বোন। এক বোন (ঝালোয়ারের রাজমাতা) মাঝখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রথমে গান করিয়া বলিয়া দিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে সকলে

গাহিতেছে। আর এক বোন ঢোলক নিয়া বাজাইতে বসিয়াছেন। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের নাচগান বন্ধ হইয়াও যেন বন্ধ হইতেছে না। শেষে অগত্যা যাইতে হইবে বলিয়া সকলে চলিলেন, কিন্তু আবার গান ধরিলেন। গানের মর্ম্মার্থ এই :—মা! তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে বড় কষ্ট হইতেছে। পা চলিতেছে না। মা! কৃপা করিয়া আবার শীঘ্র তোমার চরণে ডাকিয়া নিও।

মায়ের বম্বে যাইবার দিন ১লা জুলাই স্থির হইল। হরিবাবাজী গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় সকলে মায়ের সঙ্গেই রওনা হইবেন। মা যাওয়ার পূর্বে আরও একদিন রাণী, রাজমাতা, রাজকন্যারা আসিয়া ঐভাবে নাচ গান করিল। আজও মা পুরুষদের সব সরাইয়া দিয়া পর্দা টানাইয়া দেওয়াইলেন। আজ রাজকন্যারা অনেকেই বেশ সাজিয়া নাচের পোযাক পরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাহিতেছেন। আর বয়স্কা রাজমাতারা মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া ঐভাবে গান করিয়া করিয়া পদ বলিয়া দিতেছেন। মহা আনন্দে সকলে বিভোর। মা চৌকীতে বসিয়া আছেন। প্যাণ্ডেলে যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।

মণ্ডীর রাজার মেয়ে ইন্দিরা প্রায় রোজই আসিয়া বাহরেই বসিয়া থাকে। মায়ের যদি অসুবিধা হয় ভাবিয়া ভীড় করে না। মা ঘরে আছেন এই ভাবিয়াই নাকি তার আনন্দ। সারাদিন এবং রাত্রেরও অনেক সময় সে এই ভাবেই কাটাইয়া দিতেছে।

রাসলীলা ও মহাপ্রভুর লীলাও খুব জমিয়া উঠিয়াছে। বিপিন বাবু দিল্লী হইতে আসিয়াছেন হরিবাবাকে দর্শন করিয়া তাঁহার পাণ্ডারপুর যাওয়ার কথা। সৎসঙ্গে আসিয়া তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মায়ের শরীর কেমন আছে? হরিবাবা তখনই বলিয়া উঠিলেন—"মা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করাই অপরাধ। আমি এতো বছরের মধ্যে মায়ের কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

এতো আনন্দের মধ্যে পুণাতে নিরানন্দের ছায়া পড়িল। মা যাইবেন এই কথা ভাবিয়াই সকলের বিষাদ। সময় তো বসিয়া থাকে না। দেখিতে দেখিতে মায়ের যাওয়ার সময় হইয়া আসিল। প্রমীলার চোখে জল, বিষন্ন মুখ; নন্দা ভাইয়েরও বিষাদ; বাচ্চাগুলির পর্যন্ত মুখে দুঃখের ছায়া।

১লা জুলাই ১৯৬০।

ভোর বেলা প্রায় ছয়টার সময়ে মা, হরিবাবা, কবিরাজ মহাশয় সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া রওনা হইলেন। গতকল্য রাস পার্টি ও আরও অনেকে চলিয়া গিয়াছিল। বৃষ্টি প্রায় অনবরত চলিতেছে। এর মধ্যে অন্ধকার থাকিতেই অনেকে উপস্থিত হইয়াছেন—মাকে আর একবার দেখিতে পাইবেন এই আশায়।

প্রায় চার ঘণ্টায় আমরা বম্বে পৌঁছিলাম। এখানেও কতই না আগ্রহে ভাইয়া, লীলাবেন, কানিয়া, জয়াবেন ও অন্যান্য সকলে মায়ের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

৪ঠা জুলাই ১৯৬০।

এখানেও আনন্দের হাট বসিয়াছে। হরিবাবাও আসিয়াছেন। তিনি অন্যত্র আছেন। সেখানে রাসে সকলে মাকে নিয়া যান। বিকালে ৫টায় হরিবাবা ভাইয়ার বাড়ীতে আসিয়াই ৫টা হইতে ৬টা পর্যন্ত রামায়ণ পাঠ করেন। আবার সন্ধ্যা প্রায় ৮টায় মাকে হরিবাবার ওখানে নিয়া যাওয়া হয়। প্রায় ৯॥০টায় মা ফিরিয়া আসেন।

মা আজকাল এই কথাটা প্রায়ই বলেন, "জাগতিক সুখভোগে পুণ্যক্ষয় হয় আর জাগতিক দুঃখভোগে পাপক্ষয় হয়। তাই বলা হয় তিনি দুঃখ দিয়া দুঃখ হরণ করেন।"

কথা হইয়াছে ৬ই জুলাই আমরা মায়ের সঙ্গে দিল্লী রওনা হইব। এবার সেখানকার ভক্তদের আগ্রহে গুরুপূর্ণিমা দিল্লীতেই অনুষ্ঠিত হইবে।

৬ই জুলাই ১৯৬০।

আজ ভোরে একটি দলকে দিল্লী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বেলা প্রায় ১১টায় আমরা মায়ের সঙ্গে দিল্লী রওনা হইলাম। হরিবাবাও বৃন্দাবন যাইবার জন্য এই সঙ্গেই রওনা হইলেন। কানিয়া ভাই অদ্ভুত পরিশ্রমী। এতোগুলি লোকের এই সব যাওয়ার টিকেট করা এবং অন্যান্য সব ব্যবস্থা তিনিই করিতেছেন। বলিতে গেলে বিশ্রামের সময় তাঁহার নাই। হাসিমুখে মায়ের সেবা ভাবিয়া সব করিতেছেন। লীলাবেন্-এর এবং ভাইয়ার-ও তুলনা নাই। এতোগুলি লোক তাঁহাদের বাড়ীতে, সব ঘর বাড়ী সকলের সুবিধার জন্য ছাড়িয়া পরম আনন্দে সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছেন। মা বাড়ীতে আসিয়াছেন—এই আনন্দেই তাঁহারা ভরপুর।

৭ই জুলাই ১৯৬০।

বেলা প্রায় ১১টার সময়ে আমরা দিল্লী পৌছিলাম। অনেকেই ষ্টেশনে মাকে নিতে আসিয়াছেন। মাকে আশ্রমে নিয়া যাওয়া হইল। আগামীকল্য গুরুপূর্ণিমা। উদয়াস্ত নাম চলিবে স্থির হইয়াছে।

৮ই জুলাই ১৯৬০।

আজ গুরুপূর্ণিমা। আশ্রম লোকে লোকারণ্য। হরিবাবার থাকিবার জন্য একটি নূতন ঘর হইয়াছে। সেই ঘরেই নারায়ণ পূজা, যজ্ঞ, গুরুপূজা সব হইল। বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখন মায়ের সঙ্গে রহিয়াছেন। তিনিই পূজাদি করিলেন। খুবই ধূমধামের সহিত আজিকার উৎসব হইয়া গেল। প্রায় ৭।৮ শত লোক প্রসাদ পাইল। কমলা জয়সওয়াল আজ ভাণ্ডারা দিলেন। যুগল কিশোর বিড়লাজী মায়ের দর্শনে আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে প্রায়ই এই কথা—“কি করিলে আবার ধর্মরাজ্য স্থাপিত হয়।” সকলের প্রাণে ধর্মভাব জাগে এই তাঁহার প্রার্থনা। আশ্রমে সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা তিনিই করিতেছেন। পূর্বেও মা এখানে কয়েকবার যখন আসিয়াছেন তিনি অনেক ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

৯ই জুলাই ১৯৬০।

আগামীকল্য নামযজ্ঞ হওয়া স্থির হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে অধিবাস হইয়া গেলে মেয়েরা নাম ধরিল। সারা রাত কীর্তন হইল।

আজও বিড়লাজী একবার আসিয়াছিলেন। আগামীকাল নামযজ্ঞ উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারার সমস্ত ব্যবস্থা তিনিই করিতেছেন।

১০ই জুলাই ১৯৬০।

আজ সকাল হইতেই নাম চলিতেছে—

“শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিতানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥”

মা মধ্যে মধ্যে গিয়া কীর্তনের স্থানে বসিতেছেন। মাকে একজন নামাবলী গায়ে জড়াইয়া দিলেন। তাহা লইয়াই মা অনেকক্ষণ কীর্তনে যোগ দিয়াছেন।

বিকালে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব শ্রীযুক্ত সুবিমল দত্ত মহাশয় মায়ের কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ নানা কথা বলিলেন। তাঁহার ভাবটি বেশ সুন্দর। মা বলিয়াছেন যে ভাইজীর চেহারা ও স্বভাবের সহিত তাঁহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

আজ আশ্রমে ভাণ্ডারাও বেশ ভাল মত হইয়া গেল। নামযজ্ঞ উপলক্ষ্যে প্রায় পাঁচ শতাধিক লোক আশ্রমে প্রসাদ পাইলেন।

১১ই জুলাই ১৯৬০।

আজই সকালে মায়ের দেরাদুন রওনা হইবার কথা। ভোর বেলা আশ্রমের ছেলে মেয়েদের মধ্যে ১০।১১ জন ট্রেণে রওনা হইয়া গেল। মা বেলা প্রায় ১১টার সময়ে মোটরে রওনা হইলেন। সঙ্গে যোগীভাই এবং আমরা ১০।১১জন আরও দুইখানা মোটরে চলিলাম।

সকাল ৯টার সময়ে দিল্লীর চিফ্ কমিশনার শ্রীযুক্ত ভগবান সহায় মহাশয় সস্ত্রীক আসিয়া অনেকক্ষণ সাধন ভজন সম্বন্ধে কথা বলিলেন। মায়ের নিকট হইতে সাধন সম্বন্ধে অনেক নির্দ্দেশ পাইয়া তাঁহারা বিশেষ সুখী হইলেন। শ্রীযুক্ত সহায় পূর্বেও অনেকবার মায়ের দর্শনের জন্য আসিয়াছেন।

গতকাল শ্রীযুক্ত জয়দয়াল ডালমিয়া মাতৃদর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার বেশ ধর্ম্মভাব দেখিলাম। তাঁহার স্ত্রী বিশেষ প্রার্থনা করায় আজ

দেরাদুনের পথে তাঁহাদের বাড়ীতে মাকে কয়েক মিনিটের জন্য লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহারা মাকে খুবই আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

পথে মীরাটে হঠাৎ মা'র মোটরের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া একটি ছোট্ট ছেলে ও তাহার বোন রাস্তায় পড়িয়া যায়। ছেলেটির কিছুই হইল না। কিন্তু ছোট্ট মেয়েটি গুরুতর আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের নির্দ্দেশমত তাহার মুখে একটু গঙ্গাজল দিয়া তাহাকে আমাদেরই অপর একটি মোটরে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মেয়েটি একজন মুসলমানের কন্যা। কিছু পরেই সংবাদ পাইলাম মেয়েটির আঘাত খুব বেশী নয়। ডাক্তার বলিয়াছে ভয়ের কোনও কারণ নাই।

দুর্ঘটনার ফলে পথে লোকজন জমিয়া গেল। পুলিশ আসিয়া রিপোর্ট না নেওয়া পর্য্যন্ত গাড়ী সেখানেই রাখিতে হইবে। তাই রাস্তার পাশে এক পাঞ্জাবীর বাড়ীতে মাকে নামানো হইল। মা তাহাদের বাগানের বিল্ববৃক্ষের নীচে বসিলেন। কিছুক্ষণ বসার পর মা বাগানের মধ্যে হাঁটিতে লাগিলেন। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা বিস্ময়ের সঙ্গে মাকে দেখিতেছিল। মা তাহাদের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলেন। তাহারা ভগবানের নাম করে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে একটি মেয়ে বলিল তাহাদের বাড়ীর মধ্যে একটি মন্দির আছে এবং সেখানে তাহারা নিত্য ভজন করে। মেয়েটি রামায়ণ পাঠ করে শুনিয়া মা বলিলেন "আমাদের একটু রামায়ণ শোনাবে?" মেয়েটি সানন্দে রাজি হইল। মা আবার আসিয়া বিল্ববৃক্ষের নীচে বসিলেন। মেয়েটি পাঠ করিতে লাগিল। পাঠ প্রায় আধঘণ্টা হওয়ার পর খবর আসিল আমাদের গাড়ী হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিদায় নিবার সময়ে মা মেয়েটিকে তার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। মেয়েটির নাম কৃষ্ণলতা। সে কুমারী শুনিয়া মা সতী প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইহারাও কুমারী। তুই ইহাদের মত আমার সঙ্গে থাকবি?" কৃষ্ণলতা বলিল উপস্থিত সে যাইতে পারিবে না। তবে মায়ের দর্শনের জন্য মা যেখানে থাকিবেন

সেখানে যাইতে চেষ্টা করিবে। সে মায়ের ঠিকানা রাখিল। মা তাহাকে বলিলেন, "দেখ্, এই বিল্ববৃক্ষের নীচটা বাঁধিয়ে রাখিস্ এবং এখানে ব'সে পাঠ করবি আর আমার খেয়াল হলে এখানে চলে আসবো।" মায়ের চলিয়া আসিবার সময়ে কৃষ্ণলতার চোখ ছলছল করিতেছিল। কতোটুকু সময়ের পরিচয়! কিন্তু মনে হয় যেন জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ। মায়ের লীলা কে বুঝিবে?

প্রায় দেড় ঘন্টা সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বাড়ীতে অপেক্ষা করিবার পর মাকে লইয়া আমরা কয়েকজন দ্বিতীয় মোটরে রওনা হইলাম। সংবাদ পাইলাম যে মেয়েটিকে হাঁসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। পুলিশকে বুঝাইয়া একটু পরেই চিন্ময় ও পানু ঐ গাড়ী লইয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে পথেই মিলিত হইল। ড্রাইভারের কোনও দোষ না থাকায় পুলিশ তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং মায়ের নাম শুনিয়া গাড়ীও আর ধরিয়া রাখিল না। মেয়েটির চিকিৎসার জন্য ৫১৲ দিয়া আসা হইল। মায়ের কৃপায় যে মেয়েটি বাঁচিয়া গিয়াছে তাহা খুবই আশ্চর্য।

কিষণপুর আসার পথে মা পরশুরামজীর বাড়ী হইয়া আসিলেন। বাড়ীর সকলেই খুব শোকার্ত। মাকে দেখিতে পাইয়া ছেলে মেয়ে স্ত্রী খুবই কান্নাকাটি করিতে লাগিল। মা তাঁহাদের কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে প্রায় সাতটার পরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এখানে ভয়ানক বৃষ্টি চলিতেছে। মায়ের শরীরে একটু এলোমেলো ভাব। মাথার শব্দটা তো আজ তিন বৎসর হইয়া গেল। কখনও বাড়ে কখনও কমে। কী কারণ কেহই কিছু ধরিতে পারিতেছে না। মায়ের শরীরটা ঠিক দেখিতেছি না বলিয়া মাতৃদর্শনের সময় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে—সকালে ১১৷৷৽টা হইতে ১২টা, বিকালে ৬৷৷৽টা হইতে ৭টা। মাকে একটু বিশ্রামে রাখিবার জন্য এইরূপ করা হইয়াছে।

১৭ই জুলাই ১৯৬০।

আজ বিকালে উপরোক্ত নির্দিষ্ট সময়ে দর্শনার্থীগণ আসিয়াছেন। মা কথায় কথায় বলিলেন—"তোমরা যে রোজই এই সময়ে আসিয়া এই শরীরকে দেখিতে পাইবে তাহার কোনও ঠিক নাই। হয়তো ঘোরাফেরাও করিতে যাইতে পারি। যা হয়ে যায়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৮ই জুলাই ১৯৬০।

আজ বিকালে মা সঙ্গে কোনও জিনিষপত্র না নিয়াই, শুধু শোভনা, কমল ও চিন্ময়কে সঙ্গে করিয়া বলিলেন, "একটু ঘুরতে যাই, যখন খেয়াল হয় ফিরব।" কান্তিভাই মাকে যে গাড়ী দিয়াছেন সেই গাড়ীতে চড়িয়া মা রওনা হইলেন। সকলেরই মন খারাপ—মা কোথায় গেলেন? এই বৃষ্টি! মায়ের শরীরও ভাল নয়! দিদিমা একটু বেশী ঘাবড়াইয়া যাওয়াতে মা দিদিমাকে বলিয়াছিলেন, "মা! তুমি ঘাবড়াইয়া শরীর খারাপ করিও না। একটু ঘুরিয়া আসি। ইহাতে কী হইয়াছে? পূর্বে তো শরীরটা সর্বদা এইভাবে চলাফেরা করিত।" আবার বলিতেছেন—"এক জায়গাতে বসিয়া থাকিতে হইবে এমন কোনও কথা আছে? বিশ্বময় তো আশ্রম।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৯শে জুলাই ১৯৬০।

প্রতি মাসে যে-অখণ্ড রামায়ণ হয়, আজ তাহা আরম্ভ হইল। প্রায় ১॥০টার সময়ে মা আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া নওল কিশোরকে বলিতেছেন

—তোমার রামায়ণের জন্যই এখন আসা হইল, নতুবা হইত না। নওল কিশোর দেরাদুনের উকিল। ইনিই প্রতি মাসে আশ্রমে একবার রামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রায় ৩০।৩২ ঘণ্টায় রামায়ণ সমাপ্ত হয়। শুনিলাম মা গিয়াছিলেন আনন্দচকে মনোহর মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের বারান্দায় (যেখানে ভাইজীকে নিয়া মা বহুপূর্বে থাকিতেন)।

২০শে জুলাই ১৯৬০।

আজ বেলা প্রায় ৩টায় "হল"-ঘরে রামায়ণ সমাপ্ত হইল। মা-ও আসিয়া বসিয়াছেন। আরতি করিয়া উদ্‌যাপন হইল।

২১শে জুলাই ১৯৬০।

আজ বেলা প্রায় ৯৷৷০টায় ভাগবতপাঠ দুই ঘণ্টার জন্য আরম্ভ হইল। ইহাও প্রতি মাসেই হয়। লক্ষ্মীজী এই কার্যের উদ্যোগী। মা আজ কয়দিন ধরিয়াই লবণ খাইতেছেন না। বলেন—"শরীরে লবণ নিতেছে না।" মাথার শব্দটা খুবই আছে। শরীরটা এলোমেলোই চলিতেছে। ইহা নিয়াই যতোটা সম্ভব সকলের আবদার রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। কাহাকেও ব্যথা দিতে তো চান না। তবে বাহিরে সকলের দর্শনের সময় সকালে ১১৷৷০টা হইতে ১২টা পর্যন্ত এবং বিকালে ৬৷৷০টা হইতে ৭৷৷০ টা। ভাবটা তো আল্‌গা আল্‌গা দিন দিন হইয়াই যাইতেছে। লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা এর মধ্যে বিশেষ কিছু নাই। অথবা থাকিলেও আমাদের ধরিবার শক্তি কোথায় ? মা ঝুলন জন্মাষ্টমীতে কোথায় থাকিবেন কিছুই বলিতেছেন না। কাশী দিল্লী দেরাদুন এই সব স্থানের ভক্তরা মাকে ঐ সময় থাকিতে বলিতেছেন ; কিন্তু কিছুই ঠিক নাই।

হরিবাবার চিঠি আসিয়াছে। মাকে ঝুলনে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মায়ের শরীর বিশেষ অসুস্থ থাকাতে মায়ের বাঁধ বা হোশিয়ারপুর যাওয়া হয় নাই। বাবা বহু আগ্রহ করিয়াছিলেন। মায়ের জন্য অনেক ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

যাওয়া না হওয়াতে হরিবাবা বম্বেতে দুঃখিতভাবে কিছু বলিয়াছিলেন ; তাই মায়ের শরীর এবারও বিশেষ ভাল না থাকিলেও যাওয়াই স্থির হইল। এদিকে বুনি, সতী ও চন্দন কাশী রওনা হইয়া গিয়াছে। আগামী ৩০শে এক পার্টিকে মা বৃন্দাবন রওনা করিয়া দিতে বলিলেন। মায়ের ও আমাদের (প্রায় ১০।১২ জন) ১লা অগাষ্ট দুপুর বেলা প্রায় ১১টায় রওনা হওয়ার কথা হইয়াছে। সেই দিনই রাত্রি প্রায় ১টায় মথুরা পৌঁছিব— এইরূপই কথা হইল।

বৃন্দাবন আশ্রমে ঝুলনের ১৩।১৪ দিন পূর্ব হইতেই প্রত্যহ রাস হইতেছে। অবধূতজীর আগ্রহ ও উৎসাহেই এই সব চলিতেছে। চতুর্দশীর দিন ১১টি ঝুলন প্রস্তুত করা হইল। প্রত্যেকটিতে একসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ বসিয়া ঝুলিলেন। নাচ গান খুব হইল। "হল্" ঘরের বারান্দায় লোকে লোকারণ্য। পূর্ণিমা তিথিতে মহারাস হইল বাহিরে "হল"-এর সম্মুখে। বিরাট ব্যাপার। মায়ের শরীর কিছুতেই ঠিক হইতেছে না, এলোমেলো ভাব চলিতেছেই। সকলেই সেজন্য চিন্তিত। এই শরীর নিয়াই হরিবাবার আশ্রমেও দুই একবার প্রত্যহই যান আর এখানেও অল্প সময়ের জন্য যাইয়া বসেন। তাহাতেও সকলের কতো আনন্দ। এই শরীর নিয়াও উৎসবের পূজাদির যেখানে যতোটুকু দরকার নিখুঁৎ ভাবে করাইয়া লইতেছেন। মায়ের

উপস্থিতিতে সবই যেমন নিখুঁৎ ভাবে হইয়া থাকে এবারেও তাহাই হইল।

মায়ের শরীর ঠিক চলিতেছে না। ভীড়ও দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কাশী হইতে কন্যাপীঠের মেয়েরা ইতিপূর্বেই মাকে ঝুলন জন্মাষ্টমীতে কাশী যাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। ঝুলনে ত থাকা হইল না। জন্মাষ্টমীতে উপরোক্ত কারণে কাশী যাওয়াই স্থির হইল। তা' ছাড়া, কাশীতে জন্মাষ্টমীর পরে প্রতি বৎসরের মত এ বৎসরও ভাগবত জয়ন্তীতে ভাগবত পাঠ হইবে। এবার বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ গুপ্ত ভাগবত জয়ন্তী করিবেন অনেকদিন পূর্ব হইতেই কথা চলিতেছিল। মায়ের উপস্থিতিতেই করিবার ইচ্ছা। কাশীর গোপালজীও কলিকাতায় কাহাকেও কি কি স্বপ্ন দেখাইয়াছেন। তিনি জন্মাষ্টমীর দিন গোপালের বিশেষভাবে পূজা ও গলায় এক ছড়া হার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১০ই আগষ্ট ১৯৬০।

আজ দিল্লী এক্‌স্‌প্রেসে মা কাশী রওনা হইলেন। মথুরার ভার্গবজীর মোটরে হাথ্‌রাস আসিয়া বেলা প্রায় ১১টার ট্রেন ধরা হইল। রাত্রি প্রায় ১১টায় মোগলসরাই পৌঁছিলাম। মা আসিয়াছেন। কাশীতে আনন্দের হাট বসিল। মেয়েরা মহা উৎসাহে সাজাইবার কাজে লাগিয়া গেল।

১২ই আগষ্ট ১৯৬০।

আজ সন্ধ্যায় কবিরাজ মহাশয় ও রাত্রি প্রায় ৮টায় কালীদাদা আসিয়াছেন। ছাতে বসিয়া মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। অনিলও সস্ত্রীক

রাত্রি ১০টায় আসিয়া পৌছিল। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর কালীদা বিদায় নিলেন। অন্যান্য সকলেও চলিয়া গেল। মা খোলা ছাতেই শুইলেন।

১৩ই আগষ্ট ১৯৬০।

আজও সন্ধ্যায় কবিরাজ মহাশয় আসিয়াছেন। সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর মায়ের ছোট্ট ঘরখানিতে মায়ের কাছে বসিয়া কথাবার্তা হইতে লাগিল। আজ অনিল ও তপন কালীদার কাছে গিয়াছিল। অনিলকে কালীদা খুবই স্নেহ করেন, বহুদিনের পরিচয়। মাকে কালীদা বলিয়া গিয়াছিলেন: "মা! তুমি অনিলকে বলিও আমার কাছে গিয়া যেন কাল ঘণ্টা দুই থাকে। তুমি না বলিলে তোমাকে ছাড়িয়া অনিল যাইবে না।" তাই মা বলিয়া দিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, 'কি কি কথা হইল?' অনিল বলিল, 'তপনের প্রশ্নে কালীদা নাসিকাগ্রে ধ্যানের বিষয়ে বলিয়াছেন'। এই কথায় মা আপনা হইতে নাসিকাগ্রে যেরূপ দৃষ্টি হইয়া যাইত সেই কথা একটু বলিলেন। কবিরাজ মহাশয়ও তাহা খুবই সমর্থন করিলেন। অনিল আরও বলিতে লাগল—"কালীদা বলিয়াছেন মা বড় সাংঘাতিক—একেবারে বাইন্ধা ফ্যালাইছে।" নিজের কথাই বলিয়াছেন। এই কথা নিয়া কবিরাজ মহাশয় ও উপস্থিত সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কালীদার স্বাভাবিক সরলতার কথাও হইল। আবার অনিল বলিল, "কালীদা বলিয়াছেন মা যেন মূর্তিমতী কবিতা।" এই কথা বার বার বলায় মা একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসার ভাবে বলিলেন— "কবিতার কী হইল?" কবিরাজ মহাশয় ও অনিল বলিল, "সমস্ত আর্টের মধ্যে কবিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ।" এইরূপ নানা কথাবার্তার পর কবিরাজ মহাশয় বিদায় নিলেন।

১৪ই আগষ্ট ১৯৬০।

শ্রদ্ধেয় গোপালদা (ডাক্তার বাবু) এবার এখানে নাই, কলিকাতায় আছেন। তাঁহার শরীর বিশেষ ভাল নাই। মা এখানে আসিয়াছেন। ডাক্তার বাবুরও এখানে আসিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল। চিঠি লিখিয়াছেন। মা-ও তাঁহাকে আসিবার জন্য আমাকে চিঠি দিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে শোনা গেল তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি চিঠি লিখিয়াছেন একান্ত-বাস তিনি করিতে চান, ছেলেদের নিয়া বাসায় আসিয়া থাকিতে চান না। মায়ের কাছেও এই ভাবেই এক চিঠি দিয়াছেন। একান্ত-বাসের ব্যবস্থা না হইলে তিনি কাশী আসিবেন না খবর পাওয়া গেল। মেয়ের কাছেও এই ভাবের কথা শুনিয়া মা বলিলেন—"বাবা যখন ছেলেমেয়েদের কাছে এই ভাবের কথা লিখিয়াছে, তবে ত এই শরীরের বাবাকে আসিতে বলা ঠিক নয়। তাই রাত্রিতে ফোন করাইয়া দিলেন "বাবা যেন এখন কাশীতে না আসেন।" মায়ের তো এক কথার মধ্যে অনেক কথা থাকে। কে জানে এর মধ্যে আরও কথা আছে কি না।

১৫ই আগষ্ট ১৯৬০।

আজ নন্দোৎসব। সকালেই ফোন আসিল ডাক্তার বাবু খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। খানিক পরেই এখান হইতে ফোন্ করিতে যাইয়া শোনা গেল—গোপাল দাদার মহান্ আত্মা মাতৃচরণে মিলাইয়া গিয়াছে। বেলা প্রায় ১০॥টায় এই খবরে আমরা সকলেই মর্মান্তিক আঘাত পাইলাম। শ্রীমায়ের পরম ভক্ত, আমাদের বিশেষ উপকারী বন্ধু। বিশেষতঃ রোগের

সময়ে এমন প্রাণ দিয়া কেহ করিবে না। গরীবের সাক্ষাৎ পিতা-মাতা চলিয়া গেলেন। আমাদের মনের অবস্থা বুঝাইতে পারিব না। মা-ও কেবল তাঁহার কথাই বলিতেছিলেন। এই খবর শুনিয়া সকলেই আন্তরিক ব্যথিত হইল। কত ভাবে তাঁহার মহান্ চরিত্রের কথাই অনবরত আলোচনা হইতে লাগিল। এমন নিঃস্বার্থ সেবা-পরায়ণ লোক বড় দেখা যায় না। গরীব বড়লোক সকলের কতো ভাবে সেবা করিয়া গিয়াছেন। মা বলিতেছিলেন, "এতদিনের মধ্যে বাবার একটু রাগও কেহ দেখে নাই।" বড় মিষ্ট-ভাষী ছিলেন। আজ তিনি নাই—একথা যেন আমরাও ভাবিতে পারিতেছি না। মায়ের প্রতি কী অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি বিশ্বাস। আর আমার ও বুনির প্রতি কী স্নেহ! জগতের বাপ-ভাইয়ের নিকটও এই রূপটা প্রায় দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও আশ্রমে আসিয়া এই কথা শুনিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। পরে বলিলেন, "ইহা যেন ধারণার অতীত। স্থানটা খালি খালি লাগিতেছে।" সত্যই তাঁহার অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। মায়ের একনিষ্ঠ সন্তান মায়ের চরণেই স্থান পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। তবুও তাঁহার জন্য মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি। না জানাইয়া পারি না, তাই জানাইতেছি। বেশ জানি তাঁহার জন্য আমাদের প্রার্থনার অপেক্ষা করে না।

ডাক্তার বাবুর শব এখানে নিয়া আসার জন্য ফোন্ করা হইল কয়েকটি কারণে—প্রথমতঃ তাঁর স্ত্রীর কাশীতেই দেহান্ত হয় এবং তাঁরও ইচ্ছা ছিল তাঁর অন্তিম ক্রিয়া যেন মণিকর্ণিকাতে সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ মায়ের চরণে তাঁর শরীর নিয়া আসিবার ইচ্ছা আমাদের এই জন্য হইতেছিল যে মা ছাড়া তিনি আর কোনও দেবতা জানিতেন না। তৃতীয়তঃ স্থানীয় বহু লোক তাঁর শরীর যেন এখানে নিয়া আসা হয় এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল। কারণ এখানেই তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়াছে এবং এখানকার বহু লোকই তাঁহার সেবায় ও ব্যবহারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু বড় ছেলে

ওখানে উপস্থিত না থাকায়—অন্যান্য ছেলেরা রাজি না হওয়ায় সব ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও শরীর আনা হইল না।

১৬ই আগষ্ট ১৯৬০।

গতকাল পরমানন্দ স্বামীজী এখান হইতে আশ্রমের কাজে কলিকাতায় রওনা হইয়া গিয়াছেন। আজ ওখানে পৌছিয়াই গোপাল দাদার বাসায় গিয়াছিলেন। বড় ছেলে দিল্লী হইতে এবং তৃতীয় ছেলে, বউ ও মেয়ে এখান হইতে পৌছিলে আজ দেহের সৎকার করা হইল, ফোনেই সব খবর পাইলাম। মা আশ্রমে সকলকে বলিলেন—"বাবা তোমাদের আশ্রমের সকলকেই অনেক সেবা করিয়া গিয়াছে। তোমাদের আশ্রমেরই একজন গিয়াছে মনে রাখিও। তোমরা তাঁর উর্দ্ধগতির জন্য যতদিন শ্রাদ্ধাদি না হয় প্রত্যহ কিছুক্ষণ একটু কীর্তন করিও।" বেলু বলিল, "আমি দাদার জন্য জপ করিয়াছি।" মা বলিলেন, "বেশ ত, যার যার ইচ্ছা যতটুকু পার জপও করিও।" পরে আরও বলিলেন, "কাজের (শ্রাদ্ধের) দিন সম্পূর্ণ গীতাটা পাঠ করিও।" দাদা বালগোপালকে দুধ দিতেন। তাহাই ভাল বাসিতেন। তাই স্থির হইল শনিবার ২৭শে আগষ্ট ২৫০ জন শিশুদের দুধ-মিষ্টি বিতরণ করা হইবে। দাদার ইচ্ছা ছিল মণিকর্ণিকায় যান, তাই অস্থি আনিতে বলা হইয়াছিল। ১৯শে আগষ্ট শুক্রবার বড় ছেলে ও তৃতীয় ছেলে অস্থি নিয়া আসিল। আশ্রমের সামনেই ধর্মশালায় সাজাইয়া রাখা হইল। দয়াময়ী মা গিয়া আশ্রমের রোয়াকে দাঁড়াইলেন। ছেলেরা অস্থি নিয়া আসিতেই কাঁদিয়া মায়ের চরণে আসিতেই দয়াময়ী মা স্নেহের সহিত ছেলেদের বুকে-পিঠে-মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। বড় ছেলের হাতেই মাটির ছোট্ট ঘটে অস্থি ফুল দিয়া নিয়া আসিয়াছে। ধর্মশালায় সাজানো

টেবিলের উপর অস্থি রাখা হইল। ছেলেরা আসিয়া মায়ের কাছে বসিল। তাহাদের জন্য মা কুশাসন ফল দুধ সব তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন। অস্থি নিবার বাসন ইত্যাদিও সব ঠিক করা ছিল। খানিক পরে ছেলেরা অস্থি নিয়া মণিকর্ণিকায় রওনা হইল। আমি মালা দিয়া সাজাইয়া দিলাম। দাদার সব শেষ হইয়া গেল। সকলের বুক ব্যথায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়।

ইহার মধ্যে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। বহু লোক একত্রিত হইয়াছে। গলি প্রায় বন্ধ। এতো মানুষের ভিতর দিয়া হঠাৎ একটি ছাগল আসিয়া যে-টেবিলে অস্থি ছিল সেই টেবিলের কাছে একটু দাঁড়াইয়াই আবার ভীড়ের মধ্যে দিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি চলিয়া গেল। মা বলিয়া উঠিলেন, "বাবা তো বাল-গোপালদের ছাগলের দুধ বিতরণ করতো।" কে জানে কোন্ রূপে কে আসে? উদাস নাকি দেখিল ছাগলটা টেবিলের নিকট গিয়া মাথা একটু নামাইল। বাস্তবিকই এই দুধের জন্যই ছাগলের কতো সেবা করিতেন। সঙ্কট মোচনে এই প্রতিষ্ঠানটি কত বছর হয় দাদা করিয়াছেন। নিজেও ওখানে গিয়া কিছুদিন ছিলেন। ডাক্তারী কর্ম শেষ করিয়া সস্ত্রীক সেখানে থাকিবেন এইরূপ একটা বাসনাও ছিল। স্ত্রী ত কয়েক বছর হয় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

কাজ শেষ করিয়া ছেলেরা মায়ের কাছে আসিয়া অন্নপূর্ণার দরজায় বসিল। ধীরে ধীরে সব কথা মায়ের নিকট বলিতে লাগিল। সেই সময়ে মায়ের দর্শনে সকলে আসিয়া ওখানেই বসিয়াছিলেন। সকলেই দাদার শেষ সময়ের কথা বিশেষ আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন। যাহা শোনা গেল তাহার মর্মটা এই :—প্রত্যহ ভোরে একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়া দাদা হাঁটিতে যাইতেন। বৃষ্টি থাকায় সেদিন আর যাইবেন না বলিয়া দিলেন। ছেলেকে শুইতে বলিলেন। নিজেও একটু শুইবেন বলিলেন। ছেলে গিয়া শুইতেই একটা শব্দ পাইয়া দাদার ঘরে আসিয়া দেখে দাদা ঘরেই

পড়িয়া গিয়াছেন। উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, পারিতেছেন না। ছেলে তাঁহাকে উঠাইয়া দেখিল মাথার দুই পাশে ও হাতে চোট পাইয়াছেন। বলিলেন পায়খানায় যাইবেন। কিন্তু মাথা তুলিতে পারিতেছেন না। ছেলেরা বলিল, ঘরেই পায়খানা করিতে, তাহাতে তিনি রাজি হইলেন না। কোনও প্রকারে পায়খানায় নিয়া যাওয়া হইল। ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে শোওয়াইয়া দেওয়া হইল। তখনই কেমন কেমন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে এখানে ফোন করিয়াছিল। বলিলেন, আমার "কোমা" হইয়াছে। (বহুমূত্রের ব্যারাম ছিল বলিয়া এই আশঙ্কা সব সময়ে করিতেন।) ডাক্তারদের বলিলেন—"Good-bye—বিদায়; আমাকে আর কিছু করিতে পারিবেন না।" স্ত্রীর উদ্দেশ্যে নাকি বলিলেন—"তুমি আসিয়াছ? আমি এখনই আসিতেছি।" তারপর শুধু "মা, মা" বলিতেছিলেন। কোথায় কষ্ট হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে শুধু বলিলেন—"কিছু বুঝিতেছি না; সব যেন শূন্য বোধ হইতেছে।" এই বলিতে বলিতে একটা দিক যেন অবশের মত লাগিতেছিল। অনেক কষ্টে মায়ের ছবি যেদিকে ছিল সেই দিকে একটু পাশ ফিরিবার মত করিয়া মায়ের ছবির দিক চাহিয়াই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

মা এই সব শুনিয়া বলিলেন—"আজ তো পাঁচ দিন; এ কয়দিন আর এই রূপটা দেখা হয় নাই। আজই সকালে ছাতে শুইয়া দেখিতেছি বাবা লুঙ্গি পরিয়া যেমন আসিত সেইরূপ আসিয়া এই শরীরের কাছে উপস্থিত; এই স্থান নয়, অপর এক স্থান। সেই স্থানটার প্রভাবও খুব ভাল। আসিয়া বলিতেছে—মা আমি আসিয়াছি। এই বলিয়া এ শরীরটা যেখানে তার একটু দূরে ঠিকঠাক হইয়া যেন বসিবার জায়গা ঠিক করিয়া নিল। আরও একটা দেখা গেল, যেমন একটা মোহের ভাব (স্বাভাবিক) দেখা যাইত, এখন সেইটা নাই।"

সকলেরই প্রায় চোখে জল। আজই ছেলেরা কলিকাতায় ফিরিয়া

গেল। মা'র-ও যেন ঐ কথাই চলিতেছে। কয়বার বলিলেন—"বাবা পড়িয়া গিয়াছিল; কতো কষ্ট না জানি পাইয়াছে। এই দুর্বল শরীর নিয়া পড়িয়া গিয়াছে।" মায়ের মুখে যেন মাতৃস্নেহে সমবেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল। বলিলাম—"মাগো! তোমার মত করিয়া এই ভাবে আর কে দেখিবে? তোমাতেই শুধু ইহা সম্ভব।" দাদার নির্বিচারে ছোট বড় সকলকে নিঃস্বার্থ সেবার ভাব, মিষ্ট ব্যবহারের কথা পুনঃ পুনঃ মা-ও বলিতেছেন—আমাদেরও মনে ঐ এক কথা। মা বলিতেছেন—"দিদি! এইরূপ দরদ দিয়া সকলের জন্য করিবার লোক বড়ো কম।" আমরাও মর্মে মর্মে বুঝি ইহা কতো সত্য কথা।

মায়ের শরীর আজ কয় বছর যাবৎ কিছু কিছু খারাপ। গত এলাহাবাদের কুম্ভে যে মাথা ও শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, তারপর হইতে মধ্যে মধ্যে উহা চলিতেছে। পরে এটোয়া হইতে যে আরম্ভ হইল কী ভয়ঙ্কর অবস্থা। তারপর হইতে শরীর বেশ ভাল এ অবস্থা বড়ো হইতেছে না। শরীরটা কেমন যেন এলোমেলো চলিতেছে। মা-ও বলেন একথা। যতোটা সম্ভব সকলকে আনন্দ দিবার জন্য, কেহ দুঃখ না পায় ইহা করিয়াই যাইতেছেন। শরীরের দিকও খেয়াল করেন না, এই অবস্থাতেই চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু দিন দিনই দেখা যাইতেছে শরীর যেন খারাপই হইয়া যাইতেছে। দর্শনের সময় তো দুই বেলা ১ ঘণ্টা সকলের জন্য দেওয়া হইয়াছে, মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য। কিন্তু মায়ের দিনরাত্রি প্রায় একই অবস্থা, শুইবার ভাবই নাই। আহারও প্রায় নাই। বাহির হইতে সকলে বিশেষ বুঝিত না কারণ মা সকলের কাছে বেশ হাসি খুশী ভাবে কথা বলেন এবং সকলে ভাবে মা তো ভালই আছেন। কিন্তু এখন তা'ও নয়। মায়ের মুখচোখের অবস্থা দেখিয়া সকলেই চিন্তিত। হাসিটুকু আছে। কথা সব সময়ে বিশেষ বলেনই না। যদি একটু স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলা হয়, তারপরই তার প্রতিক্রিয়া হয়। অবস্থা দেখিয়া

আমাদের মনের ভাব সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কিছুই করিবার তো শক্তি নাই। নিরুপায় হইয়া মায়ের চরণেই নীরবে প্রার্থনা জানানো ছাড়া অন্য উপায় নাই। মা কিছুদিন যাবৎ বলিতেছেন "শুনিবার, বলিবার, চলিবার ভাবটা যেন কেমন হইয়া যাইতেছে।" শ্বাসের গতিও যেন পরিবর্তন হইয়া যায়। অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিতেছেন। মা বলেন "এজন্য কিন্তু কোনও কষ্টই নাই, কোনও অসুবিধাই নাই।" আমরা বলি—"মা! তোমার অসুবিধা কে করিবে, কিসেই বা হইবে?" মায়ের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভয় পাইতেছে।

মা এখানে থাকিলে শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমে আসেন। সন্ধ্যা বন্দনাদি এখানেই করেন। (তাঁহার সব ব্যবস্থা মা করাইয়া রাখেন। মায়ের সব দিকেই দৃষ্টি!) পরে মায়ের কাছে বসিয়া কথাবার্তা বলিয়া প্রায় ৯॥০টা/১০টার সময়ে বাড়ী যান। তাঁহার একটু শরীর খারাপ বলিয়া মা বলিলেন—"বাবা! বৃষ্টির মধ্যে কাল আর আসিও না।" বাবা বলিলেন—"দেখি মা, না আসিলে ভাল লাগে না।" এমন সরল শিশুর মত এই কথা বলিলেন বড়োই ভাল লাগিল। মায়ের জন্য তিনিও বড় চিন্তিত। মায়ের কাছে মায়ের শরীরের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। অনিল, সতী শত কাজ ফেলিয়াও মধ্যে মধ্যে মায়ের কাছে ছুটিয়া আসে। ইহারাও আসিয়াছে। মায়াদি শম্ভুদা পাটনা হইতে আসিয়াছেন। কনকদা, চামেলী আসিয়াছে। হাসি আসিয়াছে। কিন্তু মায়ের অবস্থা দেখিয়া সকলেই চিন্তিত। কলিকাতায় ফিরিবার সময়ে চোখের জলে অনিল বলিয়া গেল "মাগো সুস্থ হও।" তাহার সদানন্দময় হাস্যবদনও মলিন। মা একটু হাসিয়া বলিলেন— "সব সময়েই সুস্থ।" এবার বিন্ধ্যাচলে যাওয়ারও কোনও ভাব দেখিতেছি না।

২২শে আগষ্ট ১৯৬০।

আজ কালীদা ও তাঁর সঙ্গে লেখিকা রাণী চন্দ আসিয়াছেন। ইনি কালীদার কাছেই কয়েকদিন হয় আসিয়াছেন। আজ রাত্রিতে এইখানে আহারাদি করিলেন। কালীদা মায়ের সঙ্গে বসিয়া অনেকক্ষণ আলাপাদি করেন। তিনি আমাদের বলিতেছেন—"এই তো কয়েকদিন পূর্বেই মায়ের কাছে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এর মধ্যেই যেন মায়ের ভাবের কতো পরিবর্তন। এত দ্রুত পরিবর্তন মায়ের ভাবের ও শরীরের আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মায়ের সঙ্গে বসিয়া কতো কথাবার্ত্তা বলিয়া গিয়াছি। আজ যেন মায়ের সেই ভাবই নাই।" সকলেই চিন্তিত। কিন্তু করিবার তো কোনও কিছুই নাই। মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের তেতলার ঘরে বসিয়া কালীদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিলেন। অনিল ওরাও আছে। তাহারা চলিয়া গেলে মা আর নামিলেন না ; লাইব্রেরীর উপরে মায়ের ঘরটিতেই শুইবেন বলায় তাহাই ব্যবস্থা করা হইল। (এই কয়দিন কন্যাপীঠের তেতলায় ছিলেন।) সেই ঘরের পশ্চিমের বারান্দায় শুইলেন। মাথায় ভয়ানক শব্দ চলিতেছে।

২৩শে আগষ্ট ১৯৬০।

আজ সকালে ৯টা/৯৷৷৹টায় মা নামিয়া আসিলেন। দোতলার ঘরটিতে বসিলেন। পরে ১১টা/১১৷৷৹টায় অন্নপূর্ণা মন্দিরের সামনে গিয়া বসিলেন। দর্শনার্থীরা সেখানেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। মা আধঘণ্টা পরেই উঠিয়া আবার দোতলার ঘরেই শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন এখন খাইতে যাইবেন না, একটু পরে যাইবেন।

কাল রাত্রিতে মা যে ঘরে শুইয়াছিলেন অনেকদিন সেদিকে যান নাই তাই অপরিষ্কার ছিল। আমি একটু পরিষ্কার করাইতে চলিয়া গেলাম। এরই মধ্যে মা ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন। আসিয়া দেখি মা চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। আমি আসিতেই বলিলেন "দিদি যা হইয়া যায় করিয়া বিন্ধ্যাচলই চলিয়া যাই।" হঠাৎ কী হইল? আশ্চর্য্য হইলাম না, কারণ মায়ের তো এইরূপই গতাগতি! তবে শরীর এতো খারাপ সেইজন্য একটু ভাবিত হইলাম। কিন্তু জানি মা যাহা করিবেন বলিয়াছেন তাহা করিবেন-ই। বাধায় কোনও ফলও নাই, বাধা দেওয়া ঠিকও নয়। আবার বলিলেন "তুমি ও দিদিমা এখানেই থাক। আবার তো শরীর ঠিকঠাক থাকিলে এখানেই আসা হইবে। ২৮শে তো ভাগবত জয়ন্তী আরম্ভ।" আমি আর কী বলিব! বলিলাম—"মা! তুমি যাহাতে ভাল থাক তাই কর। কবে যাইবে?" মা আজই পৌনে চারটায় রওনা হইবেন পটলকে বলিয়া দিলাম। পটল গিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। ওখানকার হাওয়াও ভাল, তাহা ছাড়া একান্তও আছে। এই 'যা হইয়া যায়' কথায় দিদিমা ও আমি দু/এক কথা বলিলাম। কিন্তু মা সে বিষয়ে কোনও জবাব দিলেন না। অন্য কথা বলিতে লাগিলেন। কে কে সঙ্গে যাইবে ঠিক করিতে বসিলেন। ঠিক হইল সকলেই থাকিবে। সঙ্গে যাইবে কেবল পুষ্প, জয়া, শোভা, কমল ও তপন এবং সেবক অমর সিং। মা বলিলেন "বেলু তো ওখানে আছে। সে-ই সব ঠিক করিয়া নিবে। আর কাহারও দরকার নাই।" বেলু কোনও কাজে দুই/এক দিনের জন্য বিন্ধ্যাচল গিয়াছে।

মেয়েরা সঙ্গে যাইবে না; তাই চিত্রা, শোভনা, বিল্ব, কৃপাল, শান্তা প্রভৃতি যাহারা সঙ্গে সঙ্গে থাকে, মা তাহাদের বলিলেন—"শীঘ্রই তো ফিরিয়া আসিবার কথা। তাই অল্পদিনের জন্য সকলের যাওয়ার দরকার নাই। সকলে ভাল থাকে যেন।" ইত্যাদি ইত্যাদি মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া মা নির্দিষ্ট সময়েই রওনা হইয়া গেলেন। শরীরের যা' অবস্থা, ধরিয়া ধরিয়া

নিয়া যাওয়া হইল। শরীর টলিতেছে। দিদিমা বেচারা-ও সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় গাড়ীতে উঠাইতে গিয়াছেন। "ভাল হইয়া শীঘ্র আসিও"—বলিয়া মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। চোখে জল। কিন্তু কী করিবেন? "মাগো" বলিয়া মা তাঁর বুকে একটু মুখখানি রাখিলেন। "নমো নারায়ণ নমো নারায়ণ" ইত্যাদি বলিয়া রওনা হইলেন। আমাকে বলিলেন—"শীঘ্র গাড়ী ছাড়িতে বল।" তাই আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী ছাড়িবার ব্যবস্থা করিলাম। মায়ের গাড়ী ও পটলের আনা আর একখানি গাড়ী—এই দুই গাড়ীতে সকলে গেল। পটল রাত্রিতে ফিরিয়া খবর দিল মা ভালমত পৌঁছিয়াছেন। চুনার পার হইয়া যাওয়ার পর মা একটু কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন।

২৪শে আগষ্ট ১৯৬০।

পানু কোনও কাজে ২।১ দিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল, আজই আসিয়া পৌঁছিল। মা রওনা হইয়া গিয়াছেন এবং শরীরের অবস্থা এইরূপ শুনিয়া পানু দুপুরে বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেল। রাত্রিতে ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখে শুনিলাম মায়ের শরীরের অবস্থা ভালই নয়। সারাদিন প্রায় পড়িয়াই ছিলেন। মধ্যে শরীর খুবই খারাপ হইয়াছিল। পানু বিকালে পৌঁছিলে একটু একটু কথা বলিয়াছিলেন। তখনই বেলু একটু কিছু খাওয়াইয়া দিয়াছিল। পানুকে প্রথমে নাকি বলিয়াছিলেন "তুই কোথা হইতে আসলি?" সে বলিল "আমি তো কলিকাতায় গিয়াছিলাম।" শেষে ধীরে ধীরে একটু স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। একথাও বলিয়াছেন —"আজ আর সারাদিন কথাবার্ত্তা নাই। তুই আসার পর এই একটু কথা হইল।"

ইতিমধ্যে আরও এক ঘটনা। পানু দুপুরে রওনা হইবার পরই দাসু গাড়ী নিয়া ও বেলুর চিঠি নিয়া আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম মা শুইয়া ছিলেন। একটু উঠিয়া এই চিঠি লিখাইয়া, গাড়ী পাঠাইয়া আবার শুইয়া পড়িয়াছেন। ঘটনাটি এই :—এই কয়েকদিন শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের এক গুরুভাই সস্ত্রীক মায়ের কাছে আসিয়াছিলেন, এখানেই প্রসাদ পাইয়াছেন। ইনি মধ্যে মধ্যে মায়ের কাছে আসেন। সেদিন বলিয়া গিয়াছিলেন বুধ কি বৃহস্পতিবারে মায়ের জন্য একটু খাবার করিয়া আনিবেন। আজ বুধবার। মা হঠাৎ চলিয়া গিয়াছেন, হয়তো তাহাদের আমি খবর দিই নাই। তাঁহারা যদি কিছু নিয়া আসিয়া মাকে না পান, তবে মনে ব্যথা পাইবেন। তাই মা গাড়ী পাঠাইলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বিন্ধ্যাচলে বেড়াইয়া আসিতে পারেন। আমি কেন খবর দিই নাই, খবর দেওয়া উচিত ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জন্যই নাকি মা হঠাৎ উঠিয়াছিলেন।

এই কথা শুনিয়া সতী বলিয়া উঠিল :—"মায়ের উপমা একমাত্র মা।" শরীরের এই অবস্থাতেও মায়ের এতো খেয়াল। ইহার তুলনা কোথায়? যাক্, মাকে খবর দিয়া দিলাম যে তাহারা খাবার নিয়া আসে নাই। বাস্তবিকই তাহারা যে বুধ কি বৃহস্পতিবারে খাবার নিয়া আসিতে পারেন বলিয়াছিলেন ইহা আমারও মনে ছিল না। দয়াময়ী মায়ের দয়ার তুলনা নাই।

২৫শে আগষ্ট ১৯৬০।

আজ ফোন্-এ মায়ের খবর নিলাম। মা ভাল আছেন।

২৬শে আগষ্ট ১৯৬০।

আজ সকালেই তপন ফোন্ করিয়াছে মা একটু ভাল আছেন। মা-ই নাকি বলিয়াছেন "ফোন্ করিয়া দে মা ভাল আছে, উহারা চিন্তা করিবে।" আগামীকল্য সকালে মায়ের আসিবার কথা।

২৭শে আগষ্ট ১৯৬০।

আজ সকালে মা সকলকে নিয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। বিজয়নগরের রাজমাতা একখানি গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। আর মায়ের মোটর ছিল। শুনিলাম কাল রাত্রিতে আবার মায়ের শরীর একটু খারাপ ছিল।

মা লাইব্রেরীর উপরে মায়ের ঘরটিতে এবং অন্নপূর্ণা মন্দিরের উপর দিকে গঙ্গার ধারে যে-ঘর—এই দুইটি ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকেন। ভাগবত জয়ন্তী আগামীকল্য আরম্ভ হইবে। গুপ্ত সাহেব এবার ভাগবৎ সপ্তাহ করিবেন। শ্রীনাথ শাস্ত্রী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন। তিনিও বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন। হরিবাবা মায়ের জন্য রাম অর্চ্চা করিয়া প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ চিঠি দিয়াছে মা চলিয়া আসার পর হইতেই বাবা নাকি বলিয়াছেন—মায়ের শরীর অসুস্থ, তাঁর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। শরীরও ভাল নয়। সকলকে নাকি বলিয়াছেন—"তোমরা যদি আমাকে একটুও ভালবাস, তবে আজ হইতেই মায়ের জন্য জপ আরম্ভ করো। আর এই প্রার্থনা করো মা যেন সুস্থ হন।" আজ ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের আত্মার তৃপ্তির জন্য ২৫০ জন শিশু ও অন্যান্য গরীব মিলাইয়া প্রায় ৩০০ জনকে দুধ ও মিঠাই বিতরণ করা হইল। তিনি শিশুদের দুধ দিতে

ভালবাসিতেন। তাই ছাগলের দুধ শিশুদিগকে বিতরণের জন্য সঙ্কট-মোচনে শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান করিয়া দিয়াছেন। আমাদের আজ আবার তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে।

২৮শে আগষ্ট ১৯৬০।

আজ ভাগবত জয়ন্তী যথারীতি আরম্ভ হইল। ইহা শ্রদ্ধেয় ৺কুমারবাবুই আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। গুপ্ত সাহেব সপরিবারে আসিয়াছেন। মায়ের শরীর অসুস্থ। তাই শ্রীনাথজী বলিলেন—"মা আপনার বার বার আসিতে হইবে না; একবার আরম্ভের সময়ে নিয়া যাইব।" তাই হইল। মাকে আরম্ভের সময়ে নিয়া গেলেন। যথারীতি আরতির পর মায়ের অনুমতি নিয়া শাস্ত্রীজী পাঠ করিতে বসিলেন। মা উপরে চলিয়া আসিলেন।

মা আর নীচে নামিতেছেন না। উপরে এই দুই ঘরেই আছেন। শরীর ঠিক যাইতেছে না। সকলেই চিন্তিত। মা স্বাভাবিক মধুর হাসিয়া বলেন—"যা হ'য়ে যায়। কোনও অসুবিধা তো নেই।" এই কথায় সকলের আরও চিন্তা হয়। স্বামী শঙ্করানন্দজী আসিয়া মায়ের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া চোখের জল ফেলিতেছিলেন। বলিলেন—"মা! পূর্বে তোমার ক্রিয়া আপনা আপনি হইয়া যাইত, তখনই তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যাইতে। এখন কি হয় না?" মা—"খেয়াল হয় না বাবা!" কী করা? কাহারও তো কিছু বলিবার বা করিবার শক্তি নাই। সকলেই ম্রিয়মান। বাহিরে তো কিছু অসুখ নাই। বলেন—"বলিবার, শুনিবার, চলিবার খেয়ালটা যেন কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু কোনও অসুবিধা নাই।"

শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় কালীদা একদিন একত্র হইয়া আসিলেন।

কালীদা মায়ের কাছে সুস্থ হইবার জন্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা জানাইলেন। বলিলেন—"মা! তুমি ভাল হইবে কিনা বলো।" মা তো কথা দেন না। বলিলেন—"বাবা! এ শরীর তো কথা দেয় না।" খুব পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন—"তোমরা এই শরীরটাকে স্নেহ করো তাই এতো বলিতেছ। দেখা যাক্; শুনিলাম ত!" কবিরাজ মহাশয় কালীদাকে বলিলেন—"আর পীড়াপীড়ি করিবেন না। এই যথেষ্ট বলিয়াছেন। আর বলিবেন না।" কালীদা বলিলেন "মা! তোমার শরীর ভাল না থাকিলে মনটা বড়ো খারাপ লাগে।"

কালীদা পরে আমাদের বলিলেন "এতো দ্রুত মায়ের শরীরের এতো পরিবর্ত্তন আর দেখি নাই।" বিশ্রামে রাখার চেষ্টা হইতেছে। আর ত কিছু করিবার নাই।

কথায় কথায় এই আশ্রমে যে প্রকাণ্ড আকন্দ গাছ উঠিয়াছে, সেই কথা উঠিলে মা বলিলেন—"গঙ্গাদিদি যে বাড়ী কিনিয়াছে সেই বাড়ীটায় একটা বেশ বড় আকন্দ গাছ ছিল ও যখন বাড়ীটা বিক্রয় হইয়া গেল, খেয়াল হইল এতো বড়ো আকন্দ গাছ বড়ো একটা দেখা যায় না! ও মা! পরেই দেখি এই আশ্রমে একটা আকন্দ গাছ উঠিতেছে। এই আকন্দ গাছ ক্রমেই বিরাট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতো বড়ো আকন্দ গাছ আর দেখি নাই। নীচের বুড়া শিবকে প্রায় ঢাকিয়া আছে। ঐ দিকেই হেলিয়া গিয়াছে।" মা বলিলেন—"এতো বড়ো না হইলে, ঐ দিকে না হেলিলে, শিবের দিকে যাইবে কি করিয়া? আর এতো বড়ো না হইলে, উপরের অন্নপূর্ণার বারান্দা হইতে ফুল তুলিয়া নিবে কি করিয়া?" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কবিরাজ মহাশয় ও কালীদা একত্র হইয়া বলার পর মায়ের শরীর একটু যেন ভাল বোধ হইতেছে। লাইব্রেরীর উপরের ঘরেই বেশী সময় মা থাকেন। রাত্রিতে সেই ঘরের পশ্চিম দিকের ছোট্ট বারান্দাতে শয়ন

করেন। সকলের সব সময়ে সেই ঘরে যাইবার নিয়ম নাই। বিশেষতঃ মেয়েরা সেই ঘরে প্রায় যাইতেই পায় না।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

উল্লেখযোগ্য আর বিশেষ ঘটনা নাই। মা তো বিশেষ কথা বলেন না। যখন যখন কথা হয়, নানা উপদেশমূলক কথা। একদিন আশ্রমের মেয়েদের বলিতেছেন—"দেখ! এই পথে আসিয়াছ, নিন্দায় বিচলিত হইতে নাই। কতো বিঘ্ন আসিবে, আসিতেছে। তাহাতেও ধীর ভাবে তাঁকেই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করা।" নিজের জীবনে যে কতো অযথা নিন্দা আসিয়াছে, তাহাও বলিতেছেন, কিন্তু পরে সেই নিন্দুকরাই আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, নিজেদের অন্যায় বুঝিতে পারিয়াছে তাহাও বলিলেন। মা বলিলেন—"সত্য একদিন প্রকাশ হইবেই। তোমরা ধৈর্য্য ধরিয়া আবেদন নিবেদন তাঁকেই জানাইতে চেষ্টা করিও।"

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

আজ বৈকালে ৪টার সময়ে আমাদের সকলকে (প্রায় ২৪ জন) নিয়া মা বিন্ধ্যাচলে রওনা হইলেন। মাকে একান্তে বিশ্রামে রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। বিন্ধ্যাচলের জলবায়ুও ভাল।

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

মায়ের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না। খাওয়া প্রায় কিছুই না, শুধু তরল জিনিষ।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় কাশী হইতে আসিয়াছেন। কয়েকদিন মায়ের কাছে থাকিবার ইচ্ছা। তাঁহার জন্য মা এখানে সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সেদিন তাঁহার সঙ্গে কথায় কথায় মা প্রথম বার যে আমাদের নিয়া দক্ষিণযাত্রায় গিয়াছিলেন সেই কথা উঠিল। মা যে মন্দিরে যান নাই সেই কথায় মা একটু হাসিয়া (আমাকে দেখাইয়া) বলিলেন—"উহারা সকলেই মন্দিরে যাইত, এই শরীরটার যেন কেমন হইয়া যাইত। আসল কথা কী বাবা! ঐ যে মন্দিরে সকলের ঐ ভাবটা পুঞ্জীভূত, এই সব ভাবে-ই।" মা এইটুকু বলিতেই কবিরাজ মহাশয় কথাটা নিজে তুলিয়া নিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঐ সব ভাবেই তোমার শরীরটা ঐরূপ হইয়া যাইত।" মা বলিলেন—"বাবা! এই কথাটা আজই বাহির হইয়া গেল। উহারা শরীরকে বাহিরে পড়িয়া বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এক এক জন বাহিরে শরীরের কাছে থাকিয়া, সকলে মন্দিরে যাইয়া দর্শন করিয়া আসিত।"

একদিন কথায় কথায় কালীদা কাশীতে বলিয়াছিলেন—"সেদিন উপরের ঘরে (অন্নপূর্ণা মন্দিরের দিকে) মায়ের নিকট আমি ও অনিল বসিয়া আছি—একটা বড়ো পোকা ভিতরে আসিয়া মায়ের চারিদিকে

প্রদক্ষিণ করিয়া সামনে বসিয়া প্রণামের মত করিয়া একটু বসিয়াই চলিয়া গেল। আমি ও অনিল দুই জনেই দেখিয়াছি।"

কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আমি তাহা কিছু লিখিতে পারিলাম না। মায়ের শরীরে যে যোগক্রিয়া ইত্যাদি হইয়া গিয়াছিল সেই সব পুরাণো কথা ও বিশেষ কথা অনেক হইতেছে।

আজ কয়েকদিন যাবৎই মা বলিতেছেন—"দিদি! নীচের পুকুরটার ধারে কি রকম বড়ো একটা গোলমাল দেখিতেছি।" আমি বলিলাম—কি জানি মা, আবার কী হইবে!

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

কাশীর কমিশনার, মিরজাপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি অনেক বড়ো বড়ো অফিসার মাতৃদর্শনে আসিয়াছেন। আগামীকল্য ইঁহারা এখানে প্রসাদ পাইবেন কথা হইয়াছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

পাহাড়ের উপর ব্যবস্থা করা সহজ নয়। ২০ জন খাইবার কথা ছিল, আমরা ২৫ জনের ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু তাহারা প্রায় ৫০ জনের উপর হইয়া গেল। মায়ের নাম নিয়া আমরা বসাইয়া দিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় সবই হইয়া গেল। অবশ্য এই ঘটনা নূতন নয়। মা এই কথা শুনিয়া খুবই যেন আশ্চর্য্য হইয়া আমাদের বলিতে লাগিলেন—"তোরা কী করলি? তোদের হাতের গুণ আছে। তোদের কী দুঃসাহস;

এতোগুলি বসাইয়া দিলি কোন্ সাহসে ?" ইত্যাদি ইত্যাদি। মায়ের এই কথা শুনিয়া আমরা হাসিয়া বলিলাম—"বাস্তবিকই আমাদের গুণ আছে। মায়ের চরণের প্রতাপেই এতো সাহস। তাই মায়ের নাম নিয়া বসাইয়া দিলাম। বিশ্বাস আছে কম হইবেই না। কতো বারই তো ইহা দেখিয়াছি!"

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

আগামীকল্য ১৭ই সেপ্টেম্বর মায়ের কলিকাতা রওনা হইবার কথা হইয়াছে। মায়াদি ও শম্ভুদার বিশেষ আগ্রহে এবং বিশ্রামও হইবে এই জন্য একদিন পাটনায় থাকিয়া যাইবার কথা হইয়াছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিবার কথা।

আজ সন্ধ্যার পরে সকলকে নিয়া মা বারান্দায় বসিয়াছেন। একটি সাহেবও মায়ের সঙ্গে "প্রাইভেট" করিতেছেন। সেই সময়ে কয়েকজন লোক মায়ের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি তাহাদের মায়ের কাছে নিয়া গেলাম। তাহারা বলিল—"মা! আমরা তোমার দর্শনে আসিয়াছিলাম। সঙ্গে এক ডাক্তার সাহেবও আছে। সকলের মনে হইল অন্ধকারে পাহাড়ে গাড়ী উঠাইব না। পুকুরের ধারে গাড়ী রাখিতে গিয়া একটা ঢালু জায়গায় পড়ায় গাড়ীর দুই চাকা পুকুরের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে, আর দুই চাকা উপরে থাকায় আমরা কোনও রকমে বাঁচিয়া আসিয়াছি। তোমার দর্শনে আসিয়াছিলাম তাই বাঁচিয়া গেলাম। ডাক্তার সাহেব এখনো নীচেই আছে।" মা বলিলেন—"বিন্ধ্যবাসিনীর স্থান, মা-ই রক্ষা করিয়াছেন। আজ কয়দিন যাবৎ দিদিকে বলা হইতেছিল পুকুরের ধারে একটা বিপদ দেখা যাইতেছে এই রকম কি কি বলা হইতেছিল। তবে সব কথা তো বলা হয় নাই। পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল একটা গাড়ী

যেন পুকুরে পড়িতেছে।" ডাক্তার পান্নালালজীর মেয়ে লীলা ও তাহার স্বামী রামেশ্বর সহায় দুইদিন হইল মায়ের কাছে আসিয়াছেন। তাঁহারাও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই এই কথায় আশ্চর্য্য হইল এবং বলিতে লাগিল মায়ের কৃপাতেই আজ ইহারা বাঁচিয়া গিয়াছে।

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

আজ বেলা প্রায় ১২॥০টার সময়ে আমরা মায়ের সঙ্গে পাটনা রওনা হইলাম। সন্ধ্যায় পাটনায় মাকে শম্ভুদার বাড়ীতে নিয়া গেল। পূর্ব হইতেই সব ব্যবস্থা ছিল। শম্ভুদা ও মায়াদির আনন্দের সীমা নাই। বক্সী ভাই নিজের গাড়ীতে মাকে ষ্টেশন হইতে নিয়া গেলেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

আজ সকালে আমরা কলিকাতা আসিয়া পৌছিলাম। আশ্রমেই যাওয়া হইল। মায়ের শরীর খারাপ বলিয়া কোথাও যাওয়া বন্ধ হইল। দর্শনের সময়টাও খুব অল্প রাখা হইল। বেশী সময় বিশ্রামেরই ব্যবস্থা করা হইল। সকলের নিকট আসিয়া বসিলেও মা কথা বড় বলেন না; সকলেই চুপ চাপ। একজন বলিল—মা মৌন শিক্ষা দিতেছেন। উঠিয়া যাইবার সময়ে মা হাত দুখানি জোড় করিয়া "আচ্ছা তবে আসি" বলিয়া শয়ন-কক্ষে চলিয়া যাইতেন। ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী রমা চৌধুরী তাঁহাদের সংস্কৃত নাটক মাকে দেখাইবার জন্য বিন্ধ্যাচলেই চিঠি দিয়াছিলেন কিন্তু মায়ের শরীর

এই রকম বলিয়া কবিরাজ মহাশয় ও আমরা মিলিয়া লিখিয়া দিয়াছিলাম যে তাহাদের ওখানে যাওয়া সম্ভব হইবে না। যতীনবাবু ষ্টেশনে এবং মায়ের সঙ্গে আশ্রমেও আসিয়াছিলেন। ঠিক হইল ২২শে সেপ্টেম্বর তাঁহারা সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা মাকে অভিনয় দেখাইবেন।

কলিকাতার (আগড়পাড়া) আশ্রমে তিনটি নূতন মন্দির হইয়াছে। একটিতে শ্রীশ্রীভোলানাথজীর মূর্ত্তি ও তিনটি শিব প্রতিষ্ঠা হইবে। দ্বিতীয়টিতে শ্রীশ্রীমায়ের ছবি থাকিবে ও সেই ঘরেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। তৃতীয়টিতে রামলক্ষ্মণ রাধাগোবিন্দ ইত্যাদি অনেক মূর্ত্তি থাকিবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। ২২শে সেপ্টেম্বর পূজার পূর্বেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার কথা।

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

আজ খুব ধূমধামের সহিত মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। সন্ধ্যায় আনন্দ-রচিত সংস্কৃত অভিনয় মন্দিরের সামনেই হইল। মা-ও তাঁহাদের অনুরোধে কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

আগামীকল্য নামযজ্ঞ। সারাদিন নাম চলিবে। আজ অধিবাস করিয়া মেয়েরা প্রায় রাত্রি ৯টায় নাম ধরিল। মা মেয়েদের নাম ধরাইয়া পরে উপরের ঘরে আসিলেন। ভোরে ছেলেরা আসিয়া নাম ধরিল।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

আজ সারাদিন নাম চলিল। রাত্রি ৯টায় ২৪ ঘন্টা সমাপ্ত হইলে নাম বন্ধ করা হইল। মন্দিরের সম্মুখে সুন্দর প্যাণ্ডেল হইয়াছে। তাহাতেই নাম যজ্ঞ হইল। মা-ও মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া বসিলেন। ভোগাদি-ও নিয়মিত হইল।

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

আজ শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীর ষষ্ঠীবোধন অধিবাস। গতকল্যই প্রতিমা আসিয়াছেন। আজ হঠাৎ দেখা গেল মায়ের শরীরের পরিবর্ত্তন। মা পূর্বের মত বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মন্দির পরিষ্কার ও পূজার সব ব্যবস্থা করাইলেন। অনেক রাত্রিতে উপরে আসিলেন। যে রকম মায়ের শরীরের অবস্থা ছিল, আমরা তো ইহা আশা-ই করি নাই। মা উপরে আসিয়া বলিলেন—"দিদি কি জানি কেমন করিয়া যেন আজ শরীরের পরিবর্তন হইয়া গেল। তাই তোদের পূজার সব কাজ করাও হইল।"

বিন্ধ্যাচল হইতে পাটনা এবং পাটনা হইতে কলিকাতা আসিবার সময়ে ট্রেণে সব জানালা খুলিয়া রাখিতে হইয়াছে কারণ তাহা না হইলে মায়ের শ্বাসের গতি কি রকম হইয়া যাইতেছিল। সমস্ত শরীরে যেন কি রকম একটা ভাব। বাহিরের বাতাসের সঙ্গেই যেন শ্বাসের গতির বিশেষ যোগ। কয়লায় সব ভরিয়া যাইতেছিল তবুও মায়ের শরীরের অবস্থা দেখিয়া সব জানালা খোলা রাখিতে হইয়াছিল। ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে ভয়ানক ভীড়। মাকে দেখিয়া অনেকে বলাবলি করিতেছিল যে মায়ের এই রকম চেহারা তাহারা কখনো দেখে নাই। কোনো রকমে মাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া

মোটরে উঠানো হইল। তাহারপর এই পাঁচ-ছয় দিনও শরীরের অবস্থা পূর্বের মতই চলিতেছিল। আজ হঠাৎ এইরূপ দেখিয়া সকলেরই আনন্দ। যদিও আমরা জানি যে মায়ের ইচ্ছাতে সবই সম্ভব, তবুও আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, কারণ এবার দীর্ঘদিন ধরিয়াই মায়ের শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ চলিতেছিল।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

আজ অষ্টমী পূজা। মন্দিরের বারান্দা ভরিয়া অনেকে কুমারী পূজা করিতে বসিয়াছেন। আজও খুব ধূমধামের সহিত পূজা হইয়া গেল। মাখন ভাই প্রতিদিন পূজার অঞ্জলির পর সকলের হাতে প্রসাদ দিবার জন্য ১০০৲ টাকার সন্দেশ আনেন। তাঁহার ইচ্ছা মা হাতে করিয়া সকলকে দেন। কিন্তু মা দিতে আরম্ভ করিতেই এমন অবস্থা যে লোক চাপা পড়িবার উপক্রম দেখিয়া নিজে হাতে প্রসাদ বিতরণ বন্ধ করিয়া মাখনভাইদেরই প্রসাদ বিতরণ করিতে বলিলেন এবং উপরে চলিয়া গেলেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

আজ নবমী পূজা। আজও বেশ সুন্দর ভাবে পূজা হইয়া গেল। কুসুম ব্রহ্মচারী পূজা করিতেছে। আশুদা (লক্ষ্ণৌ-এর অধ্যাপক) তন্ত্রধারক। ত্রিগুণাদাদা, কমলাকান্ত, অবনীদা, বাটুদা, হরিহর, সত্য, সকলেই চণ্ডীপাঠ ও অন্যান্য কাজে রত। আজ মা ভোগে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—তোমরা সব এই কাজের জন্য কোথা হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছ। সবই দুর্গা মায়ের ইচ্ছা। এই শরীরটার উপর তোমাদের কতো স্নেহ। কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ সংসারী হইয়াও এই কাজে কতো সুন্দরভাবে আগ্রহ সহকারে

আসিয়াছ। এই কথা বলিতে বলিতে মায়ের চোখ ছল ছল। সকলেই যুক্তকরে বলিতে লাগিল—মা এ সবই তো তোমার কৃপা। তুমিই তো মা এই পথে আমাদিগকে টানিয়া আনিয়াছ। আমাদের কতোটুকু শক্তি ?

আজ রেখা ও কানুভাই "যুগাবতার" অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত সুন্দর অভিনয় হইল। সকলেই আনন্দলাভ করিল।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

আজ বিজয়া দশমী। মাখনভাইরা অনেক চেষ্টা করিয়া মায়ের হাত দিয়া মিষ্টি বিলি এবং মাকে সকলের প্রণামের ব্যবস্থা করিলেন। সকলেরই ইহাতে আনন্দ।

যাহা হউক খুবই ধূমধামের সহিত পূজা হইয়া গেল। প্রায় ৩।৪ হাজার লোক প্রত্যহ প্রসাদ পাইতেছিল। একদিন বোধহয় প্রায় ৫ হাজারও হইয়াছিল। অবারিত দ্বার। কাহাকেও নিষেধ করা হয় নাই। ৮।৯জন ঠাকুর রান্না করিতেছিল। তাহা ছাড়া, হেমীদি, মামীমা, গিরিবালা ও মেয়েরা ভোগের রান্না করিত। এবার আর ছোট বড়ো ভেদ নাই। বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকেরাও সব উঠানে পাতা নিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। এমনই অবস্থা যে আর কিছু করিবারও উপায় ছিল না। অসম্ভব ভীড়। এই এক মহা আনন্দ চলিয়াছে। সকলেরই আনন্দ মায়ের উপস্থিতিতে।

২রা অক্টোবর ১৯৬০।

আজ মা কাশী আসিয়া পৌছিলেন। কথা হইয়াছে মা একদিন এখানে থাকিয়া দেরাদূন রওনা হইবেন। কালীদা ও কবিরাজ মহাশয় মাকে একবার

কাশীতে আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাই মা কাশী আসিয়াছেন—একথা মা কাশীতে পৌঁছাইয়াই সকলকে বলিলেন। ষ্টেশন হইতে আসিবার পথেই কবিরাজ মহাশয়কে দর্শন দিয়া আসিলেন। তাঁহার কাছে গিয়া মা বলিলেন—"বাবা কেমন দেখিতেছ?" তিনি বলিলেন "একটু ভালই তো দেখিতেছি।"

তখন আমি তাঁহাকে সব বলিলাম যে আপনিও তো মায়ের কলিকাতা যাওয়ার প্রস্তাবে ভয় পাইয়াছিলেন। পথে এবং কলিকাতায় গিয়াও কয়েকদিন মায়ের শরীরের ভয়-জনক পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু ষষ্ঠীর দিন হইতেই একটু পরিবর্তন। মা-ও হাসিয়া বলিলেন—"বাবা সেই পরিবর্তনটাই এখনো চলিতেছে।" তিনিও হাসিয়া বলিলেন "সবই মায়ের খেলা। মায়ের ইচ্ছায় কী না হইতে পারে?" মাকে একটু ভাল দেখিয়া তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

বেলা প্রায় ২টায় কালীদা আসিলেন এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর কবিরাজ মহাশয় আসিলেন। কথা হইয়াছে মা আগামীকল্যই দেরাদুন রওনা হইবেন। কলিকাতা ও কাশী দুই স্থানের ভক্তগণই অনেক প্রার্থনা জানাইয়াছিল লক্ষ্মীপূজাতে মাকে রাখিবার জন্য। মা কিন্তু রাজি হইলেন না। লক্ষ্মীপূজার দিন দেরাদুন পৌঁছিবার কথা হইল।

৪ঠা অক্টোবর ১৯৬০।

আজ মা দেরাদুন পৌঁছিলেন। নূতন একটি ঘর হইয়াছে। সেই ঘরেই মা লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তাহাই করা হইল। সন্ধ্যার সময়ে পূজার পরে মৌনের পূর্ব্বেই প্রসাদ পাইবার জন্য মন্দিরের আঙ্গিনায়

জায়গা করা হইল। মা বলিলেন "সকলকে ডাকিয়া বসাও।" আমি তাহাই করিলাম। যেই কেহ কেহ আসনের কাছে গিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি তো দেখিলাম মহা মুস্কিলের ব্যাপার, কারণ এতো লোকের বসিবার জায়গা আর নাই। মাকে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম "মা! কি উপায়? বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। তুমি আস বাহিরে। মা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "বৃষ্টি আসিয়াছে ত।" আমি সকলকে বলিলাম "মা আছেন তো! আপনারা মায়ের নাম নিয়া বসিয়া পড়ুন। কিছু হইবে না।" বেশ জোরের সহিত এই কথা বলায় কেহ কেহ মায়ের মুখের দিকে চাহিল। তখন বেশ বৃষ্টি। মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "হিম্মৎ করিয়া বসিতে পার ত বসো।" তখনই সকলে বসিয়া পড়িল। মা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। পরিবেশন হইতেছে। এর মধ্যে মা বলিলেন "দিদি! এখানে আমারও বসিতে খেয়াল হইতেছে। খাবারটা নিয়া আয়।" মায়ের খাবার জায়গা মাতৃমন্দিরে করা হইয়াছিল। তখনই উঠাইয়া নিয়া আসিয়া মাকে সকলের সঙ্গে আঙ্গিনায় খাওয়াইতে আরম্ভ করা হইল। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি! ধীরে ধীরে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। মা ওখানে আহারে বসায় সকলের মহা আনন্দ। আনন্দের সহিত সকলের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গেল।

মা রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া বলিতেছেন "কী আশ্চর্য্য বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। দিদির মনের জোরেই এই কাণ্ডটা হইল।" এই ভাবে লক্ষ্মীপূজা হইয়া গেল। মা নূতন ঘরে মেয়েদের শুইবার ব্যবস্থা করিলেন।

মায়ের বিশ্রামের যতোটা সম্ভব ব্যবস্থা করা হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের দর্শনের সময় বেলা ১১টা হইতে ১২টা; আবার সন্ধ্যায় ৬টা হইতে ৭টা রাখা হইয়াছে। কথা হইয়াছে আগামী ১৬ই মা এখান হইতে লক্ষ্ণৌ রওনা হইবেন—রামেশ্বর সহায়ের বাড়ীতে। ১৭ই তথায় পৌঁছাইবেন। ১৯ তারিখে সেখানে শ্যামাপূজা হইবে। ২০শে মা নৈমিষারণ্য রওনা হইবেন।

১২ই অক্টোবর ১৯৬০।

খবর পাওয়া গেল লক্ষ্ণৌর ওদিকে ভয়ানক জল হইয়াছে। স্বামীজী সংযম সপ্তাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য নৈমিষারণ্যে আছেন। তিনি লিখিয়াছেন "আমরা আন্দামানে আছি।" চারিদিকে জল। যে-স্থানে প্যাণ্ডেল হইবার কথা, সেখানেও এক-কোমর জল। রাস্তাঘাট ডাক প্রায় বন্ধ। এখানেও ট্রেন প্রায় দশ/বারো ঘণ্টা দেরীতে পৌঁছাইতেছে। অনেকেই বিশেষ চিন্তিত। নৈমিষারণ্যে এতো বড়ো ব্যাপার! কী করিয়া কি হইবে? চারিদিকে জল। লক্ষ্ণৌ যাওয়া হইবে কিনা তাহাই সন্দেহ করিতেছি। সকলের মনে বড়োই ভয়। সত্য কথা বলিতে কি, আমার কিন্তু চিন্তা হইতেছে না। এতো সব কথাবার্ত্তা হইতেছে। আমি হাসিয়া বলিলাম "কিছুই কিন্তু হইবে না; মায়ের কৃপায় সব ঠিক হইয়া যাইবে। তবে আমাদের কর্ম্মক্ষয় করাইয়া নিবেন।" মা একটু গম্ভীরভাব দেখাইয়া বলিতেছেন "এ তোদের দেখি দুঃসাহস্। হাসির কথা নয়। এতো জল চারিদিকে!" আমি বলিলাম "আমার কি দুঃসাহস!" মায়ের চরণ দেখাইয়া বলিলাম "খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। ঐ চরণের প্রতাপে সব ঠিক হইয়া যাইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" মা বলিলেন "কী জানি!"

১৩ই অক্টোবর ১৯৬০।

আবার খবর আসিল জল ক্রমশঃ বাড়িতেছে। মা আবার চিন্তিত ভাব দেখাইতেছেন। কেহ কেহ নূতন লোক বলিতেছে মায়ের খুব চিন্তা হইয়াছে। আমি হাসিয়া বলিলাম "দাদা আপনারা তো জানেন না!

মায়ের কিছুমাত্র চিন্তা নাই। মা ঐ রকম কতো ভাব দেখান আপনাদের ভাবে ভাবে। ওসব আমি অনেক দেখিয়াছি।"

হঠাৎ এক সময়ে মা একটু হাসিয়া বলিলেন "এতো জল? ঠাকুর গ্লাসের জলের মত চুমুক দিয়া খাইয়া ফেলিলেই তো হয়!"

রামেশ্বর সহায় আসিয়া প্রস্তাব করিলেন "মা, নৈমিষারণ্য গ্রাম জঙ্গল। ওখানে জল কিছু কমিলেও এতো বড়ো কাজ করা বড়োই কষ্টকর হইবে। লীলা (রামেশ্বরের স্ত্রী, ডাক্তার পান্নালালজীর কন্যা) ফোন করিয়াছে আমাদের লক্ষ্ণৌ-এর বাড়ীতে জল নাই, সংযম সপ্তাহ এখানেই হোক, মায়ের আদেশ নেও। এই কয়দিনে জল আরও কিছু কমিয়া গেলে ভাগবৎ সপ্তাহ নৈমিষারণ্যে হইতে পারিবে।" মা বলিলেন "এই শরীরের কোনও কথা নাই। পরমানন্দ সব ব্যবস্থা করিতে গিয়াছে। লীলা ওখানেই আছে। সব দেখিয়া পরমানন্দ যাহা স্থির করিবে তাহাই হইবে।" কথা হইল রামেশ্বরভাই লক্ষ্ণৌ যাইতেছে। তিনি গিয়া যাহা হয় খবর দিবেন।

১৪ই অক্টোবর ১৯৬০।

আজ লক্ষ্ণৌ হইতে খবর আসিল কালীপূজা লক্ষ্ণৌতেই হইতে পারিবে। যেখানে কালীপূজার প্যাণ্ডেল ইত্যাদি হইয়াছে সেদিকে জল একেবারেই নাই। জল দ্রুত কমিতেছে ইত্যাদি। আমি হাসিয়া বলিলাম "আর কী? ইহা তো হইবেই জানি।" মা একটু হাসিয়া বলিলেন "ঠাকুর তো গ্লাসের জলের মত চুমুক দিয়াও জল খাইয়া ফেলিতে পারে।" সকলেই এই কথায় হাসিতে লাগিল। মা আবার বলিতেছেন "দেখ, কতো

কাল হইতে ঐ স্থান জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে। মানুষ পশু পক্ষী ইত্যাদি কতো ভাবে অপবিত্র করিয়াছে, একটু গোবর জল ছিটাইয়া দেও।"

এখান হইতে শিবানন্দ স্বামীজীকে (শম্ভু) লক্ষ্ণৌ ও নৈমিষারণ্যে পাঠানো হইয়াছে, পরমানন্দ স্বামীজীর নিকট খবর নিয়া আসিবার জন্য। সে এখনও ফিরিয়া আসে নাই। ভাগবতে ১০৮জন পণ্ডিত দরকার পাঠ করার জন্যই। আরও বেশী কয়েকজন পণ্ডিত থাকা দরকার। কথা হইয়াছে কাশী—দরকার হইলে অন্যান্য স্থান হইতে পণ্ডিত নেওয়া হইবে। ভাল পাঠ করিতে পারে এই রকম পণ্ডিত বাছিয়া বাছিয়া নেওয়া হইবে। বিরাট আয়োজন হইতেছে। নারদের নিমন্ত্রণের মত যাহার সহিত দেখা হইতেছে বলা হইতেছে—এমন তীর্থস্থান, এইরূপ অনুষ্ঠানে (সংযম সপ্তাহ ও ১০৮ ভাগবত পাঠ) যাওয়ার জন্য। মা-ই জানেন কীভাবে কী হইবে! বহু লোক সমাগম হইবে। সাধুরাও অনেকে যাইবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন।

১৬ই অক্টোবর ১৯৬০।

মায়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্ণৌ রওনা হইলাম। ইতিমধ্যে খবর আসিয়াছে জল আশ্চর্য্য রকম কমিয়া যাইতেছে। তাই সংযম সপ্তাহ নৈমিষারণ্যেই হইবে।

১৭ই অক্টোবর ১৯৬০।

আমরা আজ সকালে লক্ষ্ণৌ আসিয়া পৌঁছিলাম। মায়ের ও ভক্তদের সেবার জন্য রামেশ্বর ভাই ও লীলা সুন্দরভাবে প্রাণ দিয়া ব্যবস্থা করিয়াছে।

মা এখানে আসিবেন, কালীপূজা হইবে এখানে এবং পরদিন মা নৈমিষারণ্যে রওনা হইবেন এই খবর পাইয়া অনেকে নানা স্থান হইতে লক্ষ্ণৌ আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন। রামেশ্বর ভাই ও লীলার সুব্যবস্থার জন্য সকলেই আনন্দের সহিত মাতৃসঙ্গ করিতে পারিতেছে।

ইতিমধ্যে একটি কথা ২।১ দিন হইল মা বলিতেছিলেন "ভাখ দিদি! দেখছিলাম (সূক্ষ্মে) মহাত্মা গান্ধীবাবা এ শরীরের কাছে আসিয়া—খুব যেন পরিচিত—দুধ খাইবে, দুধের অভাব—এ শরীর এক গ্লাস দুধ হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আবার সেইখানেই মিলাইয়া গেল।"

১৯শে অক্টোবর ১৯৬০।

মায়ের উপস্থিতিতে আজ লক্ষ্ণৌতে সুন্দরভাবে শ্যামাপূজা হইয়া গেল। রাত্রি প্রায় ২টায় পূজা শেষ হইল। বাটুদা পূজা করিলেন। পূজার পরে ফল ইত্যাদি বিতরণ এবং প্রসাদ পাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে রাত্রি ৩টা/৩।৹টা বাজিয়া গেল।

২০শে অক্টোবর ১৯৬০।

মায়ের শরীর খুব ঠিক না থাকায় ট্রেণে ও বাসে সকালে পার্টি পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মা রওনা হইলেন বেলা প্রায় বারোটায়। সঙ্গে দুই তিনখানি

মোটরে অবশিষ্ট লোক রওনা হইল। রওনা হইবার কিছু পূর্ব হইতেই লীলা খুব কাঁদিতেছে। মায়ের কাছে আসিয়াও সে কাঁদিতেছে আর বলিতেছে "মা! হয়তো কেহ কেহ মনে করিবে আমার একমাত্র পুত্র চলিয়া গিয়াছে সেই কথা মনে করিয়া আমার কান্না পাইতেছে। কিন্তু মা! তুমি তো জানো সেই জন্য আমি কাঁদিতেছি না। তুমিই আমার সেই কষ্টে শান্তি দিয়াছ। আমি কাঁদিতেছি আমার মন কেমন করিতেছে বলিয়া।"

প্রায় তিন ঘন্টায় আমরা নৈমিষারণ্যে পৌঁছিলাম। সীতাপুরে ও অন্য দু/এক স্থানে মায়ের দর্শনের জন্য বহুলোক অপেক্ষা করিতেছিল। সীতাপুরে ভীষণ ভীড় হইয়া গেল। পুলিশের লোক উপস্থিত ছিল। নৈমিষারণ্যে আসিয়া দেখি এতো অসুবিধার মধ্যেও মায়ের কৃপায়, অনেকের সহযোগিতায় এবং পরমানন্দ স্বামীজীর উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আশাতীত সুব্যবস্থা হইয়াছে। নারদানন্দ স্বামীজীর আশ্রমেই সব আয়োজন হইয়াছে। তিনি সন্ধ্যার সময়ে মায়ের কাছে আসিলেন। নানা স্থান হইতে ভক্তগণ অনবরত আসিতেছে। মা পৌঁছিবার পূর্বেই কেহ কেহ পৌঁছিয়া গিয়াছেন দেখিলাম। কুঠিয়া ধর্ম্মশালা কয়েকটি আছে। তা ছাড়া প্রায় ১০০ তাঁবু পড়িয়াছে। মা এবং আমরা কয়েকজন একটি ধর্ম্মশালায় আছি। চারখানি ঘর ও দুই পাশে বারান্দা। সাধু অনেক আসিয়াছেন।

২১শে অক্টোবর ১৯৬০।

আজ হইতে সংযম সপ্তাহ আরম্ভ। প্রকাণ্ড দুইটি প্যাণ্ডেল করা হইয়াছে। একটিতে সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হইল। দ্বিতীয়টিতে ২৭ তারিখ হইতে ভাগবত সপ্তাহ আরম্ভ হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। নিয়মিতভাবে সৎসঙ্গ মৌনাদি সব আরম্ভ হইল। বিশেষ বিশেষ সাধুদের মধ্যে বম্বের সন্ন্যাস

আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর মহেশ্বরানন্দজী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, বিষ্ণু আশ্রমজী, মহামণ্ডলেশ্বর চেতন গিরিজী, অবধূত কৃষ্ণানন্দজী, বম্বের কৃষ্ণানন্দজী, বৃন্দাবনের চক্রপাণিজী, শ্রীযুক্ত যোগেশ ব্রহ্মচারীজী। ইঁহাদের সঙ্গে আরও অনেক সাধু ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন। নৈমিষারণ্যে যেন আনন্দের মেলা বসিয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীগণ দলে দলে আসিতেছে যাইতেছে। মাতৃভক্ত বহু লোক আসিয়াছেন। অনেকেই বলিতেছেন এই স্থানটিকে জাগাইবার জন্যই মা আসিয়াছেন। এই জঙ্গলে বিরাট আয়োজন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য।

২৭শে অক্টোবর ১৯৬০।

আজ খুব ভাল মতই সংযম সপ্তাহ শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্যাণ্ডেলে ভাগবত সপ্তাহ আরম্ভ হইল। বাটুদা আচার্য্য, শ্রীনাথজী ও যোগেনদা নিরীক্ষণকারী (কেহ যেন ঘুমাইয়া না পড়ে বা পাঠে শৈথিল্য না করে তাহা দেখা), আর ১০৮ পণ্ডিত পাঠে বসিবার কথা। সেখানে আরও কিছু বেশী পাঠক হইয়া গেল। সকলকেই বসাইয়া দেওয়া হইল।

আচার্য্য বসিয়াছেন উচ্চাসনে সাজানো চৌকিতে। রূপার সিংহাসনে সোনার লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্ত্তি। মূর্ত্তি-পূজার পর পাঠ আরম্ভ হইল। কুসুম ও অন্যান্য জাপকগণ জপে বসিলেন। ভরতভাই যজমান। পাঠকগণ অধিকাংশই আনিয়াছেন কাশী হইতে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণও অনেক আসিয়াছেন। যথারীতি সকলকে বরণ করিয়া পাঠে বসানো হইল। পাঠকদের সকলের জন্যই বিন্ধ্যাচল হইতে গালিচার আসন, কলিকাতা হইতে গায়ের চাদর ও বম্বে হইতে পরিধানের রঙ্গীন বস্ত্র আনা হইয়াছে। বৃন্দাবন হইতে গোমুখী ও তুলসীর মালা, কাশী হইতে পূজার বাসন সব ব্রাহ্মণদের দিবার জন্য আনা

হইয়াছে। পাঠের চৌকি ঢাকনির দ্বারা ঢাকিয়া প্রত্যেককে চৌকি দেওয়া হইয়াছে। সকলে বসিয়াছেন। সাধুদের নিয়া মা মণ্ডপে যাইতেই সকলে জয়ধ্বনি করিলেন। বড়োই সুন্দর দেখাইতেছিল।

কানপুরের জয়পুরিয়া পরিবার হইতে সীতারাম ভাইয়ের বাবা, মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন আসিয়াছেন। মোদীনগরের মোদীভাইও সপরিবারে আসিয়াছেন। আরও বহু লোক আসিয়াছেন। অনেকেই বলিতেছেন— "১০৮ ভাগবত তো খুব কমই হয়; যদিও বা হয় এমন সুন্দরভাবে ব্যবস্থা আমরা আর কখনো দেখি নাই।" মায়ের ব্যবস্থাতেই সব হইতেছে। অপূর্ব শোভা। এই ক্ষুদ্র লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। প্রত্যক্ষদর্শীরা ইহা অনুভব করিতেছেন। অনেকেই বলিতেছেন এমন স্থানে মায়ের, উপস্থিতিতে এইরূপ অনুষ্ঠান আর কখনও এইরূপটা দর্শন হইবে কিনা মা ই জানেন। এই জন্যই নানা স্থান হইতে এত লোক আসিতেছে।

লোকে লোকারণ্য। সকলেই খুব আগ্রহের সহিত সাধুদের কথা শুনিতেছেন। অনেকে বলিতেছেন "আমরা যেন সংসারের সব কথা ভুলিয়া গিয়াছি। কী এক আনন্দে যেন দিন কাটিতেছে।" মায়ের আদেশে কমল সাধুদের বক্তৃতা সব রেকর্ড করাইতেছে। বিষ্ণু আশ্রমজী ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন। নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য বিশদভাবে বলিলেন শ্রীনারদানন্দ স্বামীজী।

লক্ষ্ণৌ হইতে চীফ্ সেক্রেটারী গোবিন্দ নারায়ণজী সপরিবারে আসিয়াছেন। সঙ্গে আরও দুই/এক জন বড়ো বড়ো অফিসার আছেন। মায়ের ছোট্ট ঘরটিতে তাঁহারা বসিয়াছেন। কিছুক্ষণ থাকিয়া, প্রসাদ পাইয়া তাঁহারা চলিয়া যাইবেন। সঙ্গীয় একজন মাকে প্রশ্ন করিলেন— "অনেকত সাধুদের কথাবার্তা শোনা হইল, সৎসঙ্গ করা হইল, গ্রন্থ-ও কতো পাঠ করা হইল। কিন্তু বাস্তবিক কি ভগবান আছেন? তাঁহাকে কি দেখা যায়?" মা—"বাঃ! নিশ্চয় দেখা যায়। তিনি

আছেন। যেমন তোমার সঙ্গে কথা বলা হইতেছে, প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে এইভাবে তাঁহাকে দেখা যায়।" ঘোষ বলিলেন—"তবে তিনি কেন কৃপা করেন না?" মা—"তিনি তো কৃপা করিতেছেন-ই। কৃপাবর্ষণ হইতেছে-ই। তোমরা পাত্রটিকে উপুড় করিয়া রাখিলে কৃপাবারি কি করিয়া পাত্রে ধরিবে? সব বহিয়া যায়। চিৎভাবে রাখিলেই ধরা যায়, ভরিয়া যায়।" গোবিন্দ নারায়ণজী বলিলেন "চিৎ হইবে কি করিয়া?" মা—"কেবল তাঁহার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকা। আর, মনে মনে তাঁহারই কাছে প্রার্থনা করা, তাঁহারই নাম করা তাঁহারই ধ্যান করা—এই উপায়।" তারপর কথায় কথায় আরও বলিতেছিলেন—"দেখো না, বৃক্ষের বীজ ফলের ভিতরেই থাকে। এতো বড়ো বটবৃক্ষ; বীজ কতো ছোট! কিন্তু যখন ভিতরে যাইয়া বীজের খবর পাইলে, তখন বোঝা যায় 'আচ্ছা ইহা হইতেই এতো বড়ো বৃক্ষ শাখা প্রশাখার প্রকাশ!' খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত কী করিয়া জানা যাইবে? তাই ভিতরে যাইতে হয়, খবর জানিবার চেষ্টা করিতে হয়, তবেই না সব জানা যায়।" মা এমনভাবে বলিলেন যে গোবিন্দ নারায়ণ ও ঘোষ মহাশয় পরে আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন—"এমন সুন্দরভাবে বলা আর শুনি নাই।" বাস্তবিকই শুনিতে শুনিতে আমারও মনটা যেন কেমন হইয়া যাইতেছিল। বলিবার মধ্যে এমনই একটা যেন অপূর্ব ভাব ও শক্তি ছিল। সব সময়ে এমনটা যেন হয় না। মায়ের কথা যেন নিত্য নূতন। মনে হয় আর যেন কখনও এমনটা শোনা যায় নাই।

নারদানন্দস্বামী সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হইবার পরই কোনও স্থানে কথা দিয়াছিলেন বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার পূর্বদিন মাকে তাঁহার আশ্রমে নিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম মাতাজীকে অভিনন্দন করিবার জন্য বিশেষভাবে আয়োজন করিয়াছেন। মা এখানে আসিয়াছেন তাহাতে খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং প্রতি বৎসর যাহাতে আসেন সেজন্য

প্রার্থনা জানাইলেন। অধ্যাত্ম বিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারী ছেলেদের দ্বারা মায়ের অভিনন্দনের জন্য বেদ ও স্তোত্রাদি পাঠ করাইলেন। তারপর মাকে নিয়া সমস্ত আশ্রম দেখাইলেন। আমাদের পক্ষ হইতেও তপনভাই নারদানন্দ স্বামিজী এতটা সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

২রা নভেম্বর ১৯৬০।

নৈমিষারণ্যে আনন্দের হাট বসিয়াছে। সাধুদের ভাষণ নিয়মিতভাবেই চলিতেছে। শ্রোতাগণ মুগ্ধ। মায়ের কৃপায় এইরূপ সমাবেশে যোগদান করিতে পারিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেছেন। মুনি ঋষিদের এই পবিত্র স্থানে কতো পুরান কথা, কতো ভাগবত প্রসঙ্গ হইয়াছে। আজ এই পরিস্থিতিতে সেই সব কথা সকলের মনে পড়িল। সাধুদের ভাষণের পর পৌনে নয়টা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত মৌন। মৌনান্তে মাতৃকথা শুনিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব। মাকে দু/একটি প্রশ্ন করিলে মা-ও কিছু বলেন। তাহাতে সকলের কতো আনন্দ! বিভু, হীরু, রেবা, সন্ধ্যা, জয়াবেন ইহাদেরও গান হয়। কোথা দিয়া যেন দিনরাত চলিয়া যাইতেছে। সকলেই আনন্দে ভরপূর। আর দ্বিতীয় মণ্ডপে প্রায় ১টা অবধি ভাগবত পাঠ চলে। বিষ্ণু আশ্রমজী দুই বেলাই ভাগবত-ব্যাখ্যা করেন। চারিদিকেই ভাগবত প্রসঙ্গ। ইহা নিয়াই গৃহস্থ, সাধু সন্ন্যাসী সকলে ডুবিয়া আছে।

অপূর্ব আনন্দস্রোতের মাঝে পনেরো দিন কাটিয়া গেল। যাঁহারা সাতদিন থাকিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই যেন পনেরো দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। মায়ের শরীর ভাল নয়। কিন্তু এই নিয়াই সব চালাইয়া যাইতেছেন।

আজ রাত্রিতে মা বলিলেন—"এ শরীর একা বাহিরে যাইবে, তোমরা কেহ সঙ্গে যাইও না।" তাহাই হইল। মা রাত্রি প্রায় ১১টার সময়ে বাহির হইয়া কাহারও কাহারও তাঁবুতে গেলেন। প্রায় একশত তাঁবু পড়িয়াছে। রাত্রি প্রায় ২টায় আসিয়া মা শুইয়া পড়িলেন।

৩রা নভেম্বর ১৯৬০।

আজও বৈকাল পর্য্যন্ত পূর্ণিমা আছে। আজই ভাগবত পাঠের সমাপ্তি। বিষ্ণু আশ্রমজীর ভাগবত ব্যাখ্যা সকাল এগারোটায় সমাপ্ত হইল। বৈকালে ব্যাখ্যা হইল। ভাগবত পাঠের মণ্ডপে মা, সাধুগণ ও আরও অনেকেই গেলেন। আচার্য্যকে ভেট চড়ানো হইল। ৫০১৲ টাকা, তা ছাড়া একখানি গিনি দক্ষিণা। বিষ্ণু আশ্রমজীকে বৈকালে ব্যাখ্যা সমাপ্তির পর ৫০১৲ টাকা ভেট চড়ানো হইল। আরও বহু লোক টাকা, কাপড়, রূপার বাসন ইত্যাদি নানারূপ ভেট চড়াইল। ভাগবত দানের জন্য একখানি কাঠের চৌকী রূপা দিয়া মুড়িয়া তার উপর তিন তোলা সোনার পাত দিয়া কারুকার্য্য করিয়া মা পটলকে দিয়া কাশী হইতে আনাইয়াছিলেন। তাহার উপর ভাগবত রাখিয়া দান করা হইল। অনেকেই এই জিনিস এইরূপভাবে দান করিতে দেখেন নাই। তাই দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক। তিন তোলা সুবর্ণ দ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি নির্মিত হইয়াছে, রূপার সিংহাসনে বসাইয়া তাহার পূজা হইয়াছে, তাহাও আচার্য্যকে দান করা হইল। সমস্ত পাঠকদের মা একটি করিয়া তুলসীর মালা গোমুখীতে ভরিয়া দান করাইয়াছেন। আজ প্রত্যেক পাঠককে ছোট সুবর্ণপাতের উপর ভাগবত রাখিয়া দান করাইলেন। পাঠকদের ৫১৲ টাকা করিয়া

দক্ষিণা, নিরীক্ষকদের ১০১৲ টাকা ও জাপকদের ২১৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইল। তাহা ছাড়া বরণের জন্য সিল্কের ধুতি চাদর গালিচার আসন ও পূজার বাসন তো পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। কানপুরের মংতুরাম জয়পুরিয়াজীও প্রত্যেক পাঠককে ১ জোড়া করিয়া ধুতি দান করিলেন। মোদীনগরের মালিক গুজর্‌মল্‌ মোদীও প্রত্যেক পাঠককে ১৲ টাকা দক্ষিণা ও একখানি করিয়া গামছা দান করিলেন। আরও কে কী দান করিয়াছেন জানা নাই। এতো সুন্দর সুশৃঙ্খলায় কাজ হইয়াছে যে দেখিবার মত জিনিস। কেহ আর কখনো দেখে নাই। এখানকার পাণ্ডাগণ, জনসাধারণ এমন কি রাজামহারাজারাও এবং জয়পুরিয়া ও মোদীরা সকলেই বলিতেছেন এমন আর দেখি নাই। ১০৮ ভাগবত তো দেখা যায়। কিন্তু এইরূপ সুশৃঙ্খলা শাস্ত্রীয় বিধিমত নিখুঁৎভাবে সবটা প্রায় হয় না। মায়েরই নির্দেশ মত এক্ষেত্রে সব হইয়াছে সুতরাং সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

পুলিশের লোকেরা অনেক সাহায্য করিয়াছিল। Forest office-এর লোকেরাও কাজের অনেক সহায়তা করিয়াছিল। তাহারা দুইদল সকলে অফিসারদের সঙ্গে মাকে প্রণাম করিতে আসিলে তাহাদিগকে ফল ফুল বিষ্ণুর সহস্র নামের বই দেওয়া হইল। যাহারা মালা জপ করিবে স্বীকার করিল তাহাদিগকে গোমুখীসহ মালাও দান করা হইল। সকলেরই মহা আনন্দ।

৪ঠা নভেম্বর ১৯৬০।

আজ হোম ও যজ্ঞান্তে চক্রতীর্থে যাইয়া সকলের স্নানাদি হইল। কোনও রূপ প্রোসেশন করা মা নিষেধ করিলেন। কিন্তু মাকে তথায় নিয়া যাওয়া

হইল এবং সাধুরাও কেহ কেহ গেলেন, তা'ছাড়া বহু ভক্ত এবং স্থানীয় পাণ্ডাগণ একত্রিত হওয়াতে এমনিতেই শোভাযাত্রা হইয়া গেল। মা চক্রতীর্থের জল স্পর্শ করিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজী ও চক্রপাণিজীও সঙ্গে আছেন। মায়ের হাতের জলের ছিটা পাইয়া সকলেই কৃতকৃতার্থ।

আজ ভাণ্ডারা। ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইল।

৬ই নভেম্বর ১৯৬০।

আজ পাণ্ডাদের ভোজন করানো হইল—প্রায় ৩০০ শত জন। প্রত্যেককে ১৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইল। পাণ্ডাগণ খুব খুশী। প্রায় সব সাধুরা চলিয়া গিয়াছেন। আজ চেতন গিরি মহারাজ (যিনি কৈলাস মঠের মহামণ্ডলেশ্বর ছিলেন) চলিয়া যাইবেন। আজ এখানে তাঁহারা তিন/চারজন ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। ইনি বম্বের প্রেমপুরীজীর শিষ্য। সেইখানেই থাকেন শুনিলাম। ইনি স্বেচ্ছায় মহামণ্ডলেশ্বরের পদ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

৭ই নভেম্বর ১৯৬০।

আজ প্রয়াগ নারায়ণ ভাই (ইনি বহুদিনের পরিচিত মাতৃভক্ত, সীতাপুরে ইঁহার কাপড়ের দোকান আছে) মাকে তাঁহার গোমতী তীরের কুটিয়াতে নিয়া আসিলেন। এই স্থানটি অতি মনোরম। সাধুদের থাকিবার জন্য কয়েকটি কুটিয়া আছে। একটি ছত্রও আছে। শুনিলাম এখানে সাধুদের ভিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিন দিন থাকিতেও দেওয়া হয়।

নিকটেই একটি টিলা। তথায় বিরাট হনুমান মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মহীরাবণ বধের সময়ের। এই টিলার নাম হনুমান্ টিলা। ব্যাসগদীও বেশী দূরে নয়। সে স্থানটিও খুবই সুন্দর। সাত মাইল দূরে মিশরীক, এই স্থানেই নাকি দধিচি মুনির অস্থি দান, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, বাল্মীকি মুনির আশ্রম, সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি হইয়াছিল এইরূপ প্রবাদ।

প্রয়াগ নারায়ণের একটি কুটিয়াতে মা রহিলেন। আমরাও স্থান নিলাম অবশিষ্ট কুটিয়াতে। কিছু তাঁবুও সাজানো হইল। এখনো আমাদের সঙ্গে প্রায় ৫০ জন। ইতিপূর্বেই মা বড়ো বড়ো মেয়েদের দেরাদুন পাঠাইয়াছিলেন। কাশীর কন্যাপীঠের মেয়েরা ও হরিদ্বারের বিদ্যাপীঠের ছেলেরা সকলেই নারদানন্দ স্বামীজীর ওখান হইতেই চলিয়া গিয়াছে। এখনও বাকী অনেকেই ধীরে ধীরে যাইতেছেন। মা এই স্থানটি দেখিয়াই বলিতেছিলেন "কতোদিন যাবৎ কুটিয়ায় থাকার খেয়াল হইতেছিল আর ঠিক ঠিক এই স্থানটিই দেখা হইয়াছিল। যেমনটি খেয়ালে আসিয়াছিল ঠিক ঠিক তেমনিই। যেন প্রয়াগ নারায়ণ এই শরীরকে আনিবার জন্যই তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে" এই বলিয়া মা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রয়াগ নারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী এই সব কথা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা। কীভাবে মায়ের ও মায়ের ভক্তদের সেবা করিবে সেইজন্য তাহারা সর্বদা যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছে। কেবলই বলিতেছে—"আজ যে আমাদের কতো আনন্দ, কিভাবে প্রকাশ করিব!"

এইরকম স্থানেও যথাসম্ভব সুব্যবস্থা হইয়া গেল। একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলটি বাঁধানো, ও একটি শিবমন্দির আছে। সেখানেই সৎসঙ্গের স্থান করা হইল। মহানন্দে সকলে গোমতী তীরে মাতৃসঙ্গে আছেন। আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারীরা অনেকেই সঙ্গে আছে। তা'ছাড়া আছেন—মোহনলাল ভাই, কমলা, আনন্দ, যোগীভাই, মিসেস্ বাসুদেব ও তাঁহার আত্মীয়রা, পান্নালালজী ও তাঁহার আত্মীয়রা, উষা, বেলু, গিরীনদা সস্ত্রীক, কুন্দন, মধুকর সস্ত্রীক।

৮ই নভেম্বর ১৯৬০।

আজ যোগীভাই চলিয়া গেলেন। গত কল্য সকালবেলা হইতে চক্রতীর্থে মা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমে পাণ্ডারা ভোর ৬টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিবে; ১২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা। শোভন, হীরু এবং দিল্লীর কানুও আছে। ভোরে ব্রহ্মচারীরা গিয়া আরম্ভ করিয়া পাণ্ডাদের নাম করিতে দিয়া আসিল। বেলা ১২টা হইতে ব্রহ্মচারীরা আবার আরম্ভ করিল। তখনও কয়েকজন পাণ্ডা এবং অন্যান্য বহুলোক ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন করিল।

ঐ দিন মাকে পাশের এক বাঙ্গালী সাধুর আশ্রমে নিয়া গেল। তথা হইতে চক্রতীর্থে কীর্ত্তনের স্থানে চলিয়া গেলেন। শুনিলাম কীর্ত্তনে অত্যন্ত ভীড় হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ বিতরণের পরে সন্ধ্যাকালে মা ফিরিয়া আসিলেন।

১০ই নভেম্বর ১৯৬০।

আজ শাশ্বতানন্দ স্বামীজী, কান্তিভাই, উষা ও বেলু চলিয়া গেল। ধীরে ধীরে লোক কমিয়া যাইতেছে। তবে এখানে মা আছেন জানিয়া অনেক দর্শনার্থী নানা স্থান হইতে আসিতেছেন। প্রয়াগ নারায়ণ রোজ প্রাতে সীতাপুর যায়, রোজই ফিরিয়া আসে। তাঁহার পরিবার এখানেই তাঁবুতে বাস করিতেছে। মা রাত্রিতে বলিতেছিলেন—"প্রয়াগ—কিনা ত্রিবেণী—এই শরীরকে এখানে আনিয়াছে। নিজে রোজ সীতাপুর যাওয়া আসা; লক্ষ্মী (প্রয়াগের স্ত্রী) তো এখানেই ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পড়িয়া আছে। কতো কষ্ট এই শরীরের জন্য করিতেছে!" এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিয়া উঠিল,

মা ! এই কি কষ্ট ? মা ! আমাদের যে কতো আনন্দ তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। মাকে এখানে আনিবার ইচ্ছা তো বহুদিন হইতেই ছিল, কিন্তু আনিতে পারিব বলিয়া আশা করি নাই। আজ আমাদের কতো ভাগ্য।"

মায়ের পুরাণো ভক্ত শ্রীপাল সিং-ও সর্বদাই সপরিবারে সীতাপুর হইতে যাওয়া আসা করেন এবং এই অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সাহায্যও করিয়াছেন। প্রয়াগ নারায়ণও উৎসবের সময় হইতেই ২৫।৩০ জন সাধুর জন্য সব ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহারা বড়োই সাধু-ভক্ত সজ্জন। মায়ের কৃপায় জঙ্গলে মঙ্গল হইতেছে।

যথারীতি আশ্রমের পাঠ কীর্ত্তনাদি বৃক্ষমূলে চলিতেছে। বেলা প্রায় ১১টায় সৎসঙ্গ সমাপ্ত হইলে মায়ের কুঠিয়ার ছোট বারান্দায় পান্নালালজী ও অন্যান্য সকলে আসিয়া বসেন। মায়ের সঙ্গে বেলা ১২টা অবধি কথাবার্ত্তা হয়। কেহ একজন মাকে একখানি নৈমিষারণ্য-মাহাত্ম্য দিলে মা পান্নালালজীকে তাহা দিয়া বলিলেন "তুমি রোজ যখন ১১টার সময়ে আসিবে, কিছু সময় ইহা পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইবে"। তাহাই হইতেছে। মা কতদিন এখানে থাকিবেন কিছুই স্থিরতা নাই।

উমানন্দ নাম্নী এক গুজরাটী সন্ন্যাসিনী বিন্ধ্যাচলে মায়ের নিকট আসিয়া মায়ের আশ্রমে থাকিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। মা তাঁহাকে প্রথমে দেরাদুন আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। পরে মা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দেরাদুন হইতে নৈমিষারণ্যে আনিয়াছিলেন। উৎসবের পরে তাঁহাকে কাশী পাঠানো হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম তিনি বি, এ, পাশ ও ব্যাকরণতীর্থ।

নারদানন্দ স্বামীজী ভাগবত আরম্ভ হইলেই অন্যত্র কাজে চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া তিনি মায়ের সঙ্গে এখানে দেখা করিতে আসিলেন এবং মা এখানে আসিয়াছেন বলিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি মাকে প্রতি বৎসর এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

নারদানন্দ স্বামীজীর আশ্রম হইতে পূর্বদিন রাত্রিতে আশ্রমের প্রধান প্রধান পরিচালকগণ সকলে মায়ের নিকট আসিয়া অনেক কথা বলিলেন— মা দর্শন দিয়াছেন, মায়ের দর্শনে তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন ইত্যাদি আত্মানন্দজী (শুনিলাম ইনি পাটনায় ব্যারিষ্টার ছিলেন) মায়ের নিকট দাঁড়াইয়া যুক্ত করে মায়ের উদ্দেশ্যে দেবীস্তোত্র পাঠ করিলেন। সন্ন্যাসী বানপ্রস্থী অনেকেই আসিয়াছিলেন। শুনিলাম নারদানন্দ স্বামীজী প্রায় পঁচিশ বৎসর এদিকে আসিয়াছেন। আশ্রমের কার্য্যে ইঁহারা সকলে তাঁহার সহায়তা করিতেছেন। সকলেই মায়ের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ। মা এখানে কৃপা করিয়া আসিয়াছেন এই কথা বলিতে লাগিলেন।

প্রয়াগ নারায়ণের কুঠিয়াতে সকলেই আনন্দে আছে। মা সকলকেই বলিতেছেন এই স্থানটি তপস্যার স্থান। পান্নালালজী ও তাঁহার জামাতা কৃষ্ণনাথ আম্বেগাঁওকার এবং আরও অনেকেই বেশ জপ-ধ্যান করিতেছেন। ইঁহারা বৃদ্ধ, কিন্তু রোজ সন্ধ্যায় হনুমান টিলায় যাইয়া একঘণ্টা জপ করেন. মা তাহা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "বাঃ বাঃ। বেশ! এই তো চাই। এখন আর কী করিবার আছে? ইহাতেই সময় দেওয়া। অথচ ইতিপূর্বে পান্নালালজী দোতলাতে উঠিতেও কষ্টবোধ করিতেন। মা হাসিয়া বলিলেন "পিতাজী এখন এতো উঁচুতে কি করিয়া উঠ? ইহা কয় মঞ্জিল (কয় তলা)?" ডাক্তার পান্নালালজী বার বার বলিলেন এখানে আসিয়া তাঁহার শরীর ও মন খুবই ভাল লাগিতেছে। অনেকেই স্থানীয় প্রভাব অনুভব করিতেছেন।

সংযম সপ্তাহে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পাঠ হইবে বলিয়া বইখানার খোঁজ করা হইল, কিন্তু পাওয়া গেল না। তখন মা বলিলেন "এই স্থান! এখানে সব পুরাণাদি গ্রন্থ থাকিলে ভাল হয়।" অবধূতজীকে বলিলেন "তুমি ইহার ব্যবস্থা করো।" অবধূতজী আর কী করিবেন? কথা হইল গ্রন্থাদি রাখিবার একটি স্থান করা হইবে। পরমানন্দ স্বামীজী তাহার জন্য চেষ্টা

করিতে লাগিলেন। এখন হনুমানটিলা দেখিয়া সেখানেই এই কার্য্যের জন্য সকলের পছন্দ হইল। এখনও কিছু বলা হয় নাই। চেষ্টা করা হইবে।

ধীরে ধীরে অনেকেই চলিয়া যাইতেছেন। আশ্রমের অনেককে মা পাঠাইয়া দিতেছেন। বেশ একান্তেই মা আছেন। কতোদিন থাকিবেন ঠিক নাই। সৎসঙ্গ কীর্ত্তনাদি নিয়মিত চলিতেছে। মায়ের নিকট বসিয়া সৎপ্রসঙ্গাদি হয়। পান্নালালজী কখনো কখনো নারদীয় ভক্তিসূত্র পড়েন। মায়ের সঙ্গে সকলেরই আনন্দ।

১৫ই নভেম্বর ১৯৬০।

আজ সীতাপুর হইতে অনেকে আসিয়াছেন। মাকে নিয়া মায়ের বারান্দায় ও আঙ্গিনায় সকলে বসিয়াছেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতেছে। কথায় কথায় মা বলিতেছেন—"যেখানে শ্রম নাই সেই স্থানই আশ্রম। সকলেই যতোটা পারা যায় সৎভাবে থাকিবার চেষ্টা করা। পতি পরম পতিরই এই রূপ সেই ভাবে সেবা করা, স্ত্রী লক্ষ্মী তাহাকে সেইভাবে দেখা, সন্তান বালগোপাল, কুমারী সেবা করিতেছ এইভাবে তাহাদের সেবা যত্ন করা। তৎজ্ঞানে যাহা হয় তাই তাঁহার কাছে পৌঁছে। তিনি কৃপা করিয়া তাঁর দিকেই নিয়া যান।" এইভাবে নানা কথা বলিতেছেন।

আবার কথায় কথায় মা এক গল্প বলিলেন—এক রাজা একবার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য পণ্ডিত সমাজ ডাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্ন ঃ—ভগবান কোথায় থাকেন? কী খান? কখন হাসেন? আর কী করেন? রাজা ঘোষণা করিলেন যে এই প্রশ্নের উত্তর যে দিতে পারিবে তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। অনেকেই অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু

রাজার মনঃপূত হইল না। মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এতো বড়ো বড়ো পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন কিন্তু কেহই রাজার প্রশ্নের জবাব দিতে না পারায় সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। রাজ্যে একজন কৃষক ছিল। এতো লোক ফিরিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—কী ব্যাপার? ইহারা কোথায় যায়? সব বৃত্তান্ত শুনিয়া সে বলিল—বাঃ এই সব প্রশ্নের জবাব তো আমি অনায়াসে দিতে পারিব। এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ ভাবিল—বেশ তো ইহাকে নিয়া যাওয়া যাক। জবাব তো দিতে পারিবে না; একটু হাসাহাসি তো হইবে। তাই তাহাকে রাজ দরবারে নিয়া গিয়া বলিল "মহারাজ! এই ব্যক্তি বলিতেছে আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারিবে।" রাজা বলিলেন—"বেশ! তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারিবে?" সে বলিল "হাঁ মহারাজ! আপনি প্রশ্ন করুন।" সকলে উৎসুক হইয়া দেখিতেছে এই কৃষক কী জবাব দিবে। মহারাজ প্রথম প্রশ্ন করিলেন—"ভগবান্ কোথায় থাকেন?" কৃষক তখনই জবাব দিল "ভগবান্ কোথায় নাই?" এই উত্তরে খুশী হইয়া রাজা ভাবিলেন—এরূপ উত্তর তো কোনও পণ্ডিতই দেয় নাই! রাজার দ্বিতীয় প্রশ্ন—"ভগবান্ কী খান?" কৃষক—"ভগবান্ অহংকারকে খান।" রাজা খুব খুশী। তৃতীয় প্রশ্ন—"ভগবান কখন হাসেন?" কৃষক—"জীব যখন গর্ভে থাকে তখন যুক্ত করে প্রার্থনা করে—'হে ভগবান! আমাকে এই গর্ভযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করো। গর্ভ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই আমি তোমার নাম নিয়া থাকিব।' কিন্তু যখন তাহার জন্ম হয়, তখন সে ভগবান্‌কে ভুলিয়া যায়, তাঁহার নাম আর করে না। ভগবান্ ইহাতে হাসেন যে এতো প্রার্থনা করিল জন্মিয়াই নাম করিবে, আর জন্ম হওয়া মাত্রই যে সব ভুলিয়া কাঁদিতে লাগিল 'ওনা ওনা ওনা ওনা'; এসব আমার মায়া।" রাজা তিন উত্তর শুনিয়াই মহা খুশী। তখন বলিলেন "আচ্ছা, এইবার আমার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দাও—ভগবান্ কী করেন?" কৃষক এই প্রশ্ন শুনিয়া একটু চুপ করিয়া

থাকিতেই রাজা বলিলেন—"কী ? এই প্রশ্নের জবাব দাও।" তখন কৃষক বলিল "মহারাজ! এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে একটু বসিবার বিশেষ স্থান চাই, সেই স্থানে বসিলে জবাব দিব। রাজা তাহার তিনটি উত্তরে মহা খুশী হইয়াছেন, তাই বলিলেন—"বেশ, বলো তোমার কিরূপ স্থান চাই, তাহাই করা যাইবে।" তখন কৃষক একটু এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—"মহারাজ এই প্রশ্নের জবাব বড়ো কঠিন। আমি যেখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি সেইখানে আপনাকে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, আর আপনার ঐ সিংহাসনে আমাকে বসিতে দিতে হইবে।" রাজা তখন কৃষকের প্রথম তিনটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য খুবই প্রসন্ন এবং চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরের জন্য উৎসুক। তিনি বলিলেন—"বেশ তাহাই হইবে।" রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া কৃষক যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কৃষককে সিংহাসনে বসিতে দিলেন। কৃষক সিংহাসনে বেশ আরাম করিয়া বসিয়া আছে, আর কোনও জবাব দেয় না। তখন রাজা বলিলেন—"কী ? আমার প্রশ্নের জবাব দিতেছো না যে! জবাব দাও।" তখন কৃষক হাসিয়া বলিল—"মহারাজ! ভগবান এই করেন—আমীরকে গরীব করেন, গরীবকে আমীর করেন। যেমন এখন হইল। আসুন মহারাজ, এখন আসিয়া সিংহাসনে বসুন।" এই কথা বলিয়া কৃষক সিংহাসন হইতে নামিয়া গেল। রাজা ও রাজসভার সকলে কৃষকের উত্তরে খুব আনন্দিত হইল। রাজার প্রতিশ্রুত পুরস্কার সব কৃষককে দেওয়া হইল।

মা এই গল্প বলাতে উপস্থিত সকলেই খুব খুশী। মা-ও হাসিতে লাগিলেন। আজ রবিবার। অনেকেই আসিয়াছেন নানা স্থান হইতে। মা কৃপা করিয়া সকলকে নিয়া বসিয়া আছেন। সাধারণতঃ বেলা ১২টায় এই সৎসঙ্গ শেষ হয়। আজ ১৷৹টা বাজিয়া গেল। মা উঠিয়া গেলেন। সকলেই উঠিয়া পড়িল। মা কুঠিয়ায় গিয়া সামান্য কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আবার উঠিয়া পড়িলেন। অনেকেই ৩টার গাড়ীতে

ফিরিয়া যাইবে। তাহারা মাতৃদর্শনের জন্য বিশেষ ব্যস্ত। লক্ষ্ণৌ হইতে লীলা সহায় এবং আরও অনেকে আসিয়াছেন। এখানেও দিদিমার নিকট হইতে অনেকে দীক্ষা নিতেছেন। মা তো কাহাকেও স্বাভাবিকভাবে দীক্ষা দেন না কিম্বা দিদিমার নিকট বা অমুকের নিকট দীক্ষা নেও ইহাও বলেন না। বলেন যাহার নিকট হইতে তোমাদের প্রাণ চায় তাহার নিকট হইতেই নিবে। এ শরীরের কোনও কথা নাই।

কাল রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া মা বলিতেছিলেন—"কয়দিন হইল এখানে আসা হইয়াছে?" আমরা বলিলাম "২০শে অক্টোবর আসা হইয়াছে।" মা বলিলেন—"আজ ১৩ই ; ২২।২৩ দিন হইয়া গেল।" এ বিষয়ে আর কিছু বলিলেন না। এখনও এখান হইতে যাওয়ার কোনও কথা হয় নাই। কবে যাইবেন কিছুই ঠিক নাই।

আজ সন্ধ্যায় এক দণ্ডীস্বামী আসিয়াছেন। আরও অনেকে বসিয়াছেন। দণ্ডীস্বামীজী কথায় কথায় বলিতেছেন—"সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য যে দেখায় এই মায়া।" একটি ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"সব-ই তো ব্রহ্ম, তবে ব্রহ্মের মধ্যে এই ভুল ভ্রান্তি আসিল কি করিয়া? মায়া ঢুকিল কি করিয়া? ব্রহ্ম তো নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত।" মা একটু হাসিয়া দণ্ডীস্বামীজীকে বলিলেন—"বাবা! এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেও।" তিনি শাস্ত্রীয় হিসাবে বুঝাইতে লাগিলেন—"ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সন্দেহ নাই। তবে এই ভ্রান্তির আবরণে ভুলভ্রান্তি হইতেছে, এই আবরণ কাটিয়া গেলেই যেই সেই ব্রহ্ম। জীবের অহংকারেই এইরূপ হয়। এই মায়া।" প্রশ্নকর্ত্তা এইসব মানিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন ব্রহ্ম শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ; তাহার মধ্যে ভ্রান্তি আসিল কি করিয়া? মায়া ও ব্রহ্ম তবে দুই হইল। এইরূপ কথা চলিতেছে। মা বলিলেন—"ব্রহ্ম ও মায়া দুই নয়। দুই-ই এক। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি তোমরা বলো না? বলিতেছ ব্রহ্মের মধ্যে ভ্রান্তি ঢুকিল কি করিয়া? ঢোকা কি? তিনিই তাঁকে নিয়া খেলা করিতেছেন। বহু হইব এই ভাবনায় সৃষ্টি।

এসবই তাঁর খেলা—লীলা। নিজেকে নিয়াই নিজে খেলা করিতেছেন।" প্রশ্নকর্ত্তা বলিতেছেন—"আমিই তো ব্রহ্ম।" তখন মা বলিলেন—"ইহা মুখে বলিতেছ। ইহা ঠিকই যে তুমিই ব্রহ্ম। কিন্তু তোমার সে জ্ঞান কই? সে জ্ঞান থাকিলে আর প্রশ্ন উত্তর কোথায়? কোনও প্রশ্নই থাকিত না।" কিছুক্ষণ এইসব কথা হইল। পরে মা কুঠিয়ার ভিতরে চলিয়া গেলেন।

১৪ই নভেম্বর ১৯৬০।

আজও যথারীতি সৎসঙ্গাদির পর শ্রীযুক্ত পান্নালালজীর বিশেষ আগ্রহে স্থির হইল যে মাকে নিয়া আগামীকল্য মিশরিক্ যাওয়া হইবে। সেখান হইতেও কেহ কেহ মাকে নিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

১৫ই নভেম্বর ১৯৬০।

আজ বেলা প্রায় ৯টায় দু/তিনখানি মোটরে অনেকেই মাকে নিয়া মিশরিক রওনা হইলেন। এখান হইতে সাত মাইল দূরে। ওখানে যাইয়া দেখিলাম মায়ের অভ্যর্থনার জন্য গেট তৈয়ার হইয়াছে। কিছু সাজানো হইতেছে। বহু লোক একত্রিত হইয়াছে। ওখানকার তহশীলদার মাকে নিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি অগ্রগামী হইয়া মাকে সর্ব্বপ্রথমে

দধিচি মুনির আশ্রমে নিয়া গেলেন। চারিদিকে বাঁধানো বেশ বড়ো একটি কুণ্ড দেখিলাম। শুনিলাম এই স্থানেই দধিচি মুনি অস্থি দান করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে যখন ইন্দ্রদেব বৃত্রসুরের অত্যাচারে অস্থির হইয়া দধিচি মুনির অস্থি প্রার্থনা করিতে যান, তখন দধিচি মুনি দেবতাদের উপকারের জন্য আনন্দে অস্থিদান করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু বলিলেন—"আমি তো অস্থি দিতে এখনই প্রস্তুত, কিন্তু আমার একটি সংকল্প ছিল—আমি সমস্ত তীর্থে স্নান করিব, সব দেবতার দর্শন করিব ; এই কাজটি হইয়া গেলেই আমি তোমাদের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত। দেবতাগণ দেখিলেন এতোদিন অপেক্ষা করিলে অসুরের হাতে আমাদের কী হইবে ঠিক নাই ; তাই তাঁহারা বলিলেন—"আচ্ছা এখানেই সমস্ত তীর্থ একত্রিত হউক।" তাহাই হইল। তখনই সমস্ত তীর্থ ওখানেই একত্রিত হইল। তাহাতে স্নান করিয়া মুনি দেবতাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। সমস্ত তীর্থ একত্রিত বা মিশ্রিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম মিশরিক্।

কুণ্ডের ধারে মায়ের বসিবার জন্য বিশেষভাবে স্থান করা হইয়াছে। মা প্রথমে মন্দিরে চলিয়া গেলেন। মন্দির দর্শন করিয়া আসিয়া কুণ্ডের ধারে একটু বসিলেন। বহু দর্শনার্থী একত্রিত হইয়াছে। নিজেরাই প্রসাদ আনিয়া মায়ের স্পর্শ করাইয়া সকলকে বিতরণ করিলেন। আনন্দে সকলে মায়ের জয়ধ্বনি করিলেন। মায়ের দর্শনে অনেকেই নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করিলেন। ওখান হইতে মাকে সীতাকুণ্ডে নিয়া যাওয়া হইল। শোনা গেল এইখানেই সীতাদেবী পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীরাম যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কুণ্ডের সিঁড়িতে আসিয়া মা জল স্পর্শ করিয়া মাথায় মুখে দিলেন। সকলের আগ্রহে মা একটু জল ছিটাইয়া দিলেন। দধিচি কুণ্ডে যেমন হইয়াছিল, এই কুণ্ডেও সেইরকম মায়ের হাতে জল দেওয়া হইল, মা সেই জল ছিটাইয়া দিলেন।

তারপরে মোটরে যাত্রা করা হইল ; পথে একস্থানে সাজাইয়া অনেকে

মায়ের প্রতীক্ষায় একত্রিত হইয়াছিল। ভীড় অত্যন্ত বেশী। মায়ের শরীর খুব ঠিক নয়। অনেক ঘোরাঘুরি হইতেছে। সেইজন্য ডাক্তার পান্নালালজী ও স্বামী পরমানন্দজী মাকে মোটর হইতে নামাইতে রাজি হইলেন না। মোটরের নিকটে আসিয়া বাহির হইতে সকলে মাতৃদর্শন করিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ মায়ের জয়ধ্বনি দিতে লাগিল।

মিশরিক্ হইতে নৈমিষারণ্যে ফিরিয়া পথে প্রথমে ব্যাস গদিতে যাওয়া হইল। আমিই কথাটা উঠাইয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম স্থানটি অতি সুন্দর। আমি বলিয়াছিলাম আমি ব্যাস গদি দেখি নাই। মা তখনই ব্যাস গদিতে যাইতে বলিলেন; তথায় যাওয়া হইল। বেশ সুন্দর স্থান। ব্যাস গদি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। একপাশে পরাশর মুনির একপাশে শুকদেবের মূর্ত্তি। সেখান হইতে পান্নালালজীর আগ্রহে হনুমান টিলায় যাওয়া হইল। এইখানেই পুরাণ গ্রন্থাদি রাখিবার জন্য জায়গা নিবার কথা হইয়াছে। সুন্দর প্রাচীন স্থান। কয়েকটি খুব পুরাতন বৃক্ষ আছে। সকলের এই স্থানটি পছন্দ হইল। ব্যাস গদি ও অন্যান্য স্থানেও পুরাতন বৃক্ষ দেখা যাইতেছে। তাহাতেই যেন একটা গম্ভীর সৌন্দর্য্যের প্রকাশ। ললিতা দেবীর মন্দিরেও যাওয়া হইল। এই স্থানটিও বেশ প্রাচীন। তারপর প্রয়াগ নারায়ণছত্রে ফিরিয়া আসা হইল।

ব্যাস গদিতে গাছের তলায় ঘুরিতে ঘুরিতে নারায়ণ স্বামীজী ও কুসুম ব্রহ্মচারী বুনো রামনাথের কাহিনী শুনাইলেন। মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী নবদ্বীপে একজন ন্যায়শাস্ত্রের বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। নাম রামনাথ। ঐ নামের অপর একজন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারও নাম রামনাথ। দ্বিতীয় রামনাথ হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্য প্রথমোক্ত রামনাথের নাম রাখা হইয়াছিল "বুনো রামনাথ।" একদিন কোনও গঙ্গাস্নানের যোগে পণ্ডিত বুনো রামনাথের স্ত্রী গঙ্গাস্নানে যান। সেই সময়ে মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রাণীও গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। মহারাণী যখন স্নান করিবার জন্য ঘাটে

নামিতেছিলেন সেই সময়ে অপর সব উপস্থিত মেয়েরা বলিলেন "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, মা ঠাকুরাণী স্নান করিতেছেন। তিনি স্নান করিয়া উঠিলে তবে আপনি ঘাটে নামিবেন।" মহারাণী মনে করিলেন "আমি এই দেশের মহারাণী! আমাকে এই সব মেয়েরা জলে নামিতে নিষেধ করিতেছে, মা ঠাকুরাণী স্নান করিতেছেন বলিয়া? এই মা ঠাকুরাণী কে?" যখন তিনি স্নান করিয়া উঠিলেন তখন মহারাণী দেখিলেন ইনি একজন সাধারণ বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, তাঁহার পরিধানে মলিন লালপেড়ে শাড়ী এবং সৌভাগ্যবতীর চিহ্ন-স্বরূপ হাতে দু'গাছা লাল সূতা বাঁধা। হাতে দুগাছা শাঁখা পর্য্যন্ত নাই। ইহা দেখিয়া মহারাণী মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন—"ইহারা এতো গরীব! যাহার হাতে দুগাছা শাঁখা পর্য্যন্ত নাই, শাঁখার অভাবে সধবার চিহ্ন দুগাছা লাল সূতা বাঁধা। এই লাল সূতা আর কয়দিন? ইহা পচিয়া গেলেই ছিঁড়িয়া খসিয়া পড়িবে।" এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত বুনো রামনাথের স্ত্রী বলিলেন—"যেদিন আমার হাতের লাল সূতা খসিয়া যাইবে সেদিন নবদ্বীপ অন্ধকার হইয়া যাইবে। এই সূতার প্রভাবেই দেশ বিদেশ হইতে সব ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আসে নবদ্বীপে। যে-দেশে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত না থাকে, সে-দেশ তো অন্ধকার।"

মহারাণী উপস্থিত মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন ঐ বৃদ্ধা নবদ্বীপের বিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান পণ্ডিত বুনো রামনাথের সহধর্ম্মিণী। বুনো রামনাথের সমকক্ষ কোনও পণ্ডিত সেই সময়ে বাংলা দেশে ছিল না।

মহারাণী রাজভবনে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত মহারাজের নিকট বর্ণনা করিলেন। মহারাজ কৌতুহল বশতঃ একদিন খোঁজ করিতে করিতে শহরের প্রান্তভাগে অবস্থিত বুনো রামনাথ পণ্ডিতের বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাথে কোনও রাজকর্ম্মচারী বা সিপাহি দ্বারবান্ পর্যন্ত লইয়া যান নাই। মহারাজা দেখেন একটি তেঁতুল গাছের নীচে বসিয়া পণ্ডিত তাঁহার বহু ছাত্রকে তন্ময় হইয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেছেন।

বহুক্ষণ পর্যন্ত আগন্তুকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিই পড়িল না। যখন পাঠ সমাপ্ত করিয়া পণ্ডিত দেখিলেন একজন ভদ্রলোক সম্মুখে দণ্ডায়মান, তখন তিনি অতিথিকে বসিতে বলিলেন। পণ্ডিত বুনো রামনাথকে প্রণাম করিয়া মহারাজা প্রশ্ন করিলেন, তাঁহার কোনও অভাব আছে কিনা। এখন, ন্যায়শাস্ত্রে "অভাব" বলিতে বুঝায় কোনও সমস্যার অপূর্ত্তিকে। তাই অধ্যাপক উত্তর দিলেন ন্যায়শাস্ত্রে এমন কোনও অভাব নাই যাহার উত্তর তাঁহার অজ্ঞাত। অতএব তাঁহার কোনও অভাব নাই। তখন মহারাজা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—"আপনার গ্রাসাচ্ছদনের কোনও অভাব বা অনটন আছে কিনা?" উত্তরে পণ্ডিত বলিলেন—"শিষ্যগণ ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুল আনয়ন করে তাহা দ্বারা অন্নপাক হয়; আর এই তেঁতুল গাছের পাতা দিয়া ব্রাহ্মণী অম্বল রন্ধন করেন। ইহা দ্বারাই ছাত্রদের এবং আমাদের উভয়ের পরিতোষ সহকারে আহার হইয়া থাকে। অতএব আমার কোনও অভাব নাই।" মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভূসম্পত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু পণ্ডিত কোনও মতে তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পূর্ব্বকালে এই রকমই ছিল ব্রাহ্মণের স্বভাব। তাঁহারা সর্ব্বদা শাস্ত্র চিন্তা ও ভগবৎ চিন্তা লইয়াই থাকিতেন। ইহাই মানুষের অনুকরণীয়। ত্যাগের আদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা বড়ো আদর্শ।

১৬ই নভেম্বর ১৯৬০।

আজ সন্ধ্যাকালে নারায়ণ স্বামীজীর মুখে একটি ঘটনা শোনা গেল। গত দুর্গা পূজার সময়ে মা যখন আগড়পাড়া যান সেই সময়ে মহাষ্টমী তিথিতে সোলনের রাজাসাহেব শ্রীদুর্গা সিংজীর এক আত্মীয়া অজয়গড়ের রাণীসাহেবা মাকে বেনারসী শাড়ী, মুক্তার মালা, আয়না, চিরুণী, গন্ধতৈলাদি প্রসাধন দ্রব্যদ্বারা পূজা করেন। সেই সময়ে ভীড়ের মধ্যে একটি ১২।১৩ বয়সের

অতিশয় কালো রঙের মেয়ে আসিয়া মায়ের নিকট ঐ মুক্তার মালা ছড়াটি চায়। অনেক সময়ে দেখা যায় কেহ কেহ মাকে কোনও দ্রব্য দিয়া তাহা প্রসাদী স্বরূপ আবার নিয়া যায়। তাই মা জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই সময়ে উহা ঐ মেয়েটিকে দিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া ঐ ভীড়ের মধ্যে মেয়েটিকে আর দেখাই গেল না। তখনই মায়ের খেয়াল হইল এখন উহাকে খুঁজিয়া না পাওয়া গেলেও দশমীর দিন বিজয়ার পর মিষ্টি বিতরণের সময় ঐ মেয়েটি আসিবেই। উদাসকে মুক্তার মালাছড়া দিয়া বলিয়া রাখিলেন চাহিলে সে যেন দেয়। দশমীর দিন বিসর্জ্জনের পর মা যখন সন্ধ্যার পর মন্দিরের সম্মুখে বসিলেন তখন একে একে সকলে আসিয়া মাকে প্রণাম করিতে লাগিল। মা সকলকে নিজের হাতে মিষ্টি দিতেছিলেন। সেই সময়ে সত্যি সত্যিই ঐ কালো মেয়েটি আসিয়া মাকে প্রণাম করিল এবং মা তাহার হাতে মিষ্টি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই না সেদিন মুক্তার মালা চাহিয়াছিলি?" মেয়েটি বলিল "হাঁ, সেইদিন আমিই আপনার কাছে মালা চাহিয়াছিলাম।"

মেয়েটিকে নিজের কাছে বসাইয়া মা উদাসকে মালা নিয়া আসিবার জন্য খবর পাঠাইলেন। মেয়েটি উঠিয়া মায়ের কাছে বসাতে সকলেরই তাহার উপর দৃষ্টি পড়িল। উদাস মুক্তার মালা আনিয়া মায়ের হাতে দিলে, মা মেয়েটিকে উহা দিলেন। মেয়েটি খুব খুশী হইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কিছু পরে আবার আসিয়া মেয়েটি নিজের গলার কাপড় সরাইয়া মাকে বলিল—"দেখুন, আপনার মালা পরিয়াছি।"

মায়ের পিছনে নারায়ণ স্বামী দাঁড়াইয়া ছিলেন। মা তাঁহাকে বলিলেন—"এর চেয়ে বুঝি আর কালো মেয়ে হয় না।" নারায়ণ স্বামী বলিলেন—"মেয়ে তো নয়; যেন শ্যামা ঠাকরুণ আর কি!"

মা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর নাম কি?" সে বলিল—"রেণুকা"। মা বলিলেন—"তোর বাবার নাম কি?" মেয়েটি বলিল—"দুর্গাদাস কি দেবদাস ঠিক মনে নেই।"

মা—তুই থাকিস্ কোথায় ?

মেয়ে—রায়েদের বাড়ীর পিছনে।

নারায়ণ স্বামী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা ! এই মেয়েটি কে ?" মা বলিলেন—"যখন এই শরীর অষ্টগ্রামে ছিল তখন এমনি একটি চণ্ডালের মেয়ে এই শরীরটার কাছে আসতো। গোবর টোবর কুড়িয়ে নিয়ে যেতো। সেই বোধ হয়। নারায়ণ স্বামী বলিলেন—"মা ! সে তো হবে আজ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা ! আর এই মেয়েটির বয়স তো হবে এখন অনুমান বারো কি তেরো। এই মেয়েটি সেই মেয়ে কি ক'রে হবে ?" মা—"সে-ই বোধহয় আবার জন্মেছে। তখন ছিল অস্পৃশ্য ঘরে। এখন স্পৃশ্য ঘরে এসে জন্ম নিয়েছে।"

ঐ মেয়েটি ইহাও বলিল যে সেই অষ্টমীর পর তাহার জ্বর হইয়াছিল বলিয়া এই কয়দিন দুর্গাপূজা দেখিতে আশ্রমে আসিতে পারে নাই। আজ তাহার মাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে। মায়ের খেয়াল হইয়াছিল যে মেয়েটি বিজয়ার দিন মিষ্টি নিতে আসিবেই। কাজেই তাহাকে যে-কোনও প্রকারে হউক আজ আসিতেই হইল। মায়ের খেয়াল পূর্ণ না হইয়া কি পারে ?

১৭ই নভেম্বর ১৯৬০।

আগামী কল্য অমাবস্যায় গোমতী স্নান। তাই আজ বৈকাল হইতে বহু লোক দেখিতেছি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা বারান্দায় বসিলে একজন প্রশ্ন করিল—"মা ! সবই যখন ভগবান করাইতেছেন তখন আর আমাদের সাধন ভজনের আবশ্যকতা কি ? মা বলিলেন—"বাবা ! সেই জ্ঞান যদি ঠিক থাকিত, তবে আর কিছুই আবশ্যক নাই। কিন্তু এই যে প্রশ্ন করা হইতেছে, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে শুনিয়া শুনিয়া প্রশ্ন করিতেছ মাত্র, আসলে সেই জ্ঞান

নাই। তাই সাধনভজনের দরকার সেই জ্ঞানের জন্য। নিজকে নিজে পাওয়ার জন্য, জানার জন্য।" প্রশ্ন—"কিসে সেই জ্ঞান হয়?" মা—"তাঁকে স্মরণ, তাঁর জপ, তাঁর ধ্যান নিয়া বেশী সময় থাকা।" প্রশ্ন—"কিন্তু সেদিকের কাজ বেশী করিলে এই দিকের মজা পাওয়া যাইবে না; তাই ওসব করি না।"

মা—"বাবা! এদিকের মজা আর কতটুকু? ঐদিকের মজার একটু আস্বাদ পাইলেই আর এদিকের মজা পাইবার ইচ্ছা হইবে না।" কথায় কথায় মা বলিলেন—"সাধুসঙ্গ, সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদিতে ঐদিকে রুচি হয়। কিছু ছাড়িতে হইবে না। শুধু তাঁকে ধরিবার চেষ্টা করো। যাহা ছাড়িবার ছাড়িয়া যাইবে।" কেহ বলিতেছে—"মা! ঐদিক ধরিলে এই চাকুরী, কাজকর্ম্ম সব তো নষ্ট হইবে। ইহাতেই তো আমরা আনন্দ পাই।"

মা—"বেশ ত! এদিকের সব করা, কিন্তু তৎ-বুদ্ধিতে করা। যে-কাজই করা, মনে করিও তাঁহার সেবার জন্য, তিনিই আমাকে দিয়া এসব করাইয়া নিতেছেন। পরম পতিরই রূপ আমার স্বামী; পত্নী গৃহলক্ষ্মী; তাঁহার যত্ন সেবা বালগোপাল কুমারীরূপে সন্তানের সেবা করা। তৎ-বুদ্ধিতে সব করিলে তাঁহাকেই পাওয়া যায়।" এইভাবে অনেক কথা হইল।

সন্ধ্যা ৭॥০টায় প্রায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তৎপরে নিত্য মৌনান্তে অনেকেই চলিয়া গেলেন। কেহ কেহ আরও কিছুক্ষণ বসিয়া মায়ের সঙ্গে কথা বলিয়া রাত্রি দশটায় বিদায় গ্রহণ করিলেন। এইভাবেই এখানকার দিন কাটিয়া যাইতেছে।

১৮ই নভেম্বর ১৯৬০।

নৈমিষারণ্যে আজ অমাবস্যার পুণ্য স্নান। বহু লোক দলে দলে স্নান করিতে আসিয়া মাতৃদর্শনও করিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ মায়ের নিকট

দাঁড়াইয়া দেবীর স্তোত্র পাঠ করিতেছে। অনেকেই মাকে ভগবতীরূপে ভাবিতেছে। জানি না এই অপরিচিত স্থানে ইহারা মায়ের প্রতি কি করিয়া এমন সুন্দর শ্রদ্ধার ভাব নিতে পারিয়াছে।

সন্ধ্যা প্রায় ৭॥০টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ব্রহ্মচারী শোভন কীর্ত্তন করিতেছে। কীর্ত্তন ও মৌন শেষ হইলে সকলে ঘরে আসিয়া বসিতেই মা বলিলেন—"কীর্ত্তন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেন বহুদূর হইতে একটা ছন্দ আভাস, স্পন্দন। খেয়াল হইল কি?" তখনই পরিষ্কার ভাবে আসিল—"পরমেশ শরণাগতোঽহং শরণাগতোঽহং।" এই পদটি মা বারে বারে সুর করিয়া বলিলেন। এই কথা বলিয়াই একটু হাসিতে হাসিতে মা পান্নালালজীকে বলিলেন (আমরা কয়েকজন মাত্র ঘরে ছিলাম)—"দেখ পিতাজী! এই কথায় আর একটা কথা আসিয়া গেল। আজ প্রায় সাতদিন পূর্ব্বে দেখা হইয়াছিল (জাগ্রত অবস্থায়) এই যে আম ও নিম গাছ একত্র হইয়া আছে, ইহার নীচে এই শরীরের বাহ্য প্রস্রাবের জায়গা ত! ঐখানে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি নিজেই প্রস্রাব করিয়া নিজেই তাহা প্রথমে মাথায়, পরে চোখে, পরে মুখে লাগাইল। তাহার পরে ঐখানেই অন্তর্ধান।" এই কথায় উপস্থিত সকলেরই অনেক রকম প্রশ্ন হইল। মা আর বিশেষ কিছু বলিলেন না। শুধু বলিলেন—"যেমন গঙ্গাজল স্পর্শ করা হয়।" পরে স্বামী পরমানন্দ আসিলে এই কথা বলিয়া মা বলিলেন—"শরীর এখানে শুইয়া আছে, এই ঘরের এই দিকের দেওয়াল যেন নাই। পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। কি রকম যেমন বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান এই রকম ব্রাহ্মী স্থিতি আর কি?—ইহার যেন প্রকাশটা।" কেহ এই কথা শুনিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিল এক রকম খারাপ আত্মা বুঝি। কিন্তু মা বলিলেন—"না, না! তাহা তো বলা হয় নাই।" তখন সকলের ভুল ভাঙ্গিল।

এখানে মায়ের কুঠিয়াটি একটি আম ও নিম গাছের নীচে। মায়ের জন্মস্থানটিও নাকি আম ও নিম গাছের নীচেই ছিল। এই কথা

নিয়া মা ও আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করিলাম। আর এখানে আম গাছের মধ্যেই নিম গাছ উঠিয়াছে; সব সময়ে এটা বড় দেখা যায় না। আরও একটা জঙ্গলী গাছের ডালও এই আম গাছ হইতে বাহির হইয়াছে। মা হাসিয়া বলিলেন—"এ রকম বড় দেখা যায় না। তিন্তিরী বৃক্ষ।" এখানে পাশেই আর একটা গাছ দেখাইয়া মা বলিলেন—"দিদি দেখ, এই গাছটাও কী সুন্দর। একটা কোন মরা গাছের ছাল হইতে আবার একটা বেশ ভাল গাছ বাহির হইয়াছে। ইহা আমলকী গাছ।" ইহা দেখিয়া মা আনন্দ করিতেছেন।

১৯শে নভেম্বর ১৯৬০।

আজও বিকালে মা কুটিয়ার ছোট বারান্দায় বসিয়াছেন। অনেকেই আসিয়াছিল। পান্নালালজী সকালের দিকে একটু নারদ ভক্তিসূত্র পাঠ করেন।

একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে। এখান হইতে কাশীর পণ্ডিতরা অনেকেই ৩রা নভেম্বর চলিয়া যান। ৪ঠা তারিখের নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞ, স্নান ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদির জন্য অপেক্ষা না করিয়া, পাঠ সমাপ্ত করিয়াই তাঁহারা কাশী চলিয়া গেলেন। পরদিন কন্যাপীঠের মেয়েরা হরীশবাবু (রেলওয়ে এঞ্জিনীয়ার)-এর সঙ্গে এখান হইতে রওনা হইয়া গেল। বালামৌ গিয়াই নাকি খবর আসিল গতকাল সেখানে ট্রেনে একজন পণ্ডিতজীর হাত কাটিয়া গিয়াছে। (অনুসন্ধান করিয়া) জানা গেল কাশীর ইউনিভার্সিটির পণ্ডিত বশিষ্ঠ দত্ত মিশ্রজীর হাত কাটা গিয়াছে। ইনি অনেকদিন যাবৎ কন্যাপীঠের মেয়ে চন্দনকে সংস্কৃত পড়াইয়াছেন। পারিশ্রমিকও কিছুই নিতেন না।

ক্ষমার অনুরোধে হরীশবাবু খবর নিয়া জানিলেন বশিষ্ঠ দত্তজী জল আনিতে গিয়াছিলেন, পিছন হইতে একটি মালগাড়ী আসিয়া পড়াতে ধাক্কা লাগিয়া তিনি পড়িয়া যান। লাইনের উপর ডান হাতখানি পড়িয়াছিল, তাহা বগলের নীচ হইতে সম্পূর্ণ কাটিয়া যায়। তিনি কিছুক্ষণ অজ্ঞান হইয়া থাকেন। পরে জ্ঞান হইলে উঠিয়া নাকি রক্তাক্ত কলেবরে বাম হস্তে তাঁর বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ হস্তখানিকে উঠাইয়া নিয়া প্রায় এক ফারলং দূরে ষ্টেশনে যাইয়া খবর দেন। সেখানে ডাক্তার না থাকায় যৎসামান্য প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়া মিশ্রজীকে শাণ্ডিলাতে পাঠানো হইয়াছে। এই খবর পাইয়া হরীশবাবু পরে শাণ্ডিলাতে গিয়া জানিলেন মিশ্রজী হাসপাতালে আছেন। হাসপাতালে যাইয়া দেখেন সেখানে বড়োই অব্যবস্থা এবং জায়গাটি অপরিষ্কার। মিশ্রজী কম্বল গায়ে বসিয়া আছেন—এতো শান্ত মূর্ত্তি যে বুঝিতেই পারা যায় না যে ইঁহারই হাত কাটিয়াছে। পণ্ডিতজী কাশী যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। স্থানীয় ডাক্তার বলিলেন পণ্ডিতজীর হার্ট ও নাড়ীর গতি খুবই ভাল এবং তিনি অনায়াসে কাশী যাইতে পারেন। হরীশবাবুর ইচ্ছা ছিল পণ্ডিতজীকে সঙ্গেই রাখিয়া চিকিৎসা করান। পণ্ডিতজীর আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে কাশী রওনা করিয়া দিলেন। ফয়জাবাদ ষ্টেশনে পণ্ডিতজীর শরীর খুব খারাপ হওয়ায় ডাক্তার ডাকানো হইল এবং ডাক্তারের মতানুসারে পণ্ডিতজীকে নামাইয়া ফয়জাবাদ হাসপাতালে রাখা হইল। পরদিন তাঁহার ছেলে আসিয়া নাকি তাঁহাকে নিয়া গিয়াছে।

আজ কাশী হইতে পানু ও চন্দনের চিঠি আসিয়াছে। পানু লিখিয়াছে, "পণ্ডিতজী এখন অনেকটা ভাল। তাঁহাকে দেখিতে হাসপাতালে গিয়াছিলাম। হাতখানা বগলের কাছ হইতে সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছে। ২।৩ ইঞ্চির জন্য ইঞ্জিনটা বুকের উপর দিয়া যায় নাই। প্রথম চার-পাঁচ দিন খুবই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে রাখিয়া সকলেই তাঁহার বিশেষ যত্ন করিতেছেন। আরও

দশ-বারো দিনের মধ্যেই বোধহয় ঘা সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইবে। তবে বয়স প্রায় পঞ্চাশের উপর, একটু ডায়াবিটিস্-ও আছে—তাই যাহা একটু ভয়। পণ্ডিতজীর অসীম ধৈর্য্য ও শান্ত ভাব। হাসিমুখে কেবল বলিতেছেন—'মাতাজীকী কৃপাসে প্রাণ বচ্ গয়া। মেরা মৃত্যুবাণ তো থা হী।' ক্ষমাদি মাঝে মাঝে ফল ইত্যাদি হাসপাতালে পাঠাইতেছেন। আমিও ফল নিয়া গিয়াছিলাম।"

চন্দনও লিখিয়াছে—"আমরা পণ্ডিতজীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া খুবই কষ্ট হইল। একটা হাত নাই, শুইয়া আছেন, খুব রোগা হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুখে সেই হাসিখানি লাগিয়াই আছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কবে আমরা কাশী ফিরিয়াছি। আরও বলিলেন 'দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই ঘরে ফিরিয়া যাইব, ঘাবড়াইতেছ কেন?' তারপর পানুদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিলেন। পানুদা মায়ের কথা বলিলেন। এই রকম হইয়াছে বলিয়া সকলেই দুঃখিত এবং খুবই ব্যস্ত—এসব শুনিয়া পণ্ডিতজী বলিলেন, 'ব্যস্ত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই, সব ঠিকই আছে এবং চলছে।' অনেকেই নাকি তাঁহাকে বলিয়াছে ভাগবত পাঠ করিতে গিয়া এই পরিণাম। তিনি সকলকেই নাকি বলিয়াছেন এই ভাগবত পারায়ণ-ই তাঁহার জীবন বাঁচাইয়াছে। সবই ভাগ্য। একথা বার বার আমাদের কাছেও বলিলেন এবং শ্লোক বলিয়া ইহাও বুঝাইলেন যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর-ই এসব কাজ, নচেৎ এমন হইবে কেন? শাণ্ডিলাতে যখন হইতে আশ্রমবাসীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তখন হইতে আর কোনও কষ্টই নাই; তাহার পূর্ব্বে কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। ফয়জাবাদেও ভাল ব্যবস্থা ছিল না। পণ্ডিতজীর নাতি বলিল, 'এখানে কোনও কষ্ট নাই, ডাক্তারেরা খুব যত্ন সহকারে দেখিতেছেন। সকলেই পরিচিত। সব বিষয়ে সুবিধা।' ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক বলিয়া ফ্রি সিট-ও পাইয়াছেন। স্ত্রী-ই সেবা করিতেছেন। জর হয় না। শুইতে খুব কষ্ট। ডানদিকে তো শুইতেই পারেন না। কথাবার্ত্তা বেশী বলা নিষেধ।

খুব দুর্ব্বল। ফয়জাবাদে যে তাঁহাকে নামানো হইয়াছিল তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। যখন বুঝিতে পারিলেন তখন কাশী নিয়া যাইতে বলিলেন। শাণ্ডিলা হইতে কাশীর পথে ভয়ানক যন্ত্রণা হয় ও ক্ষত হইতে রক্ত পড়িতে থাকে।"

সকলে এই সব ঘটনা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল যে এই অবস্থায় জ্ঞান ফিরিলে পণ্ডিতজী কিভাবে কাটা হাতখানি নিজেই উঠাইয়া নিয়া এক ফার্লং যাইয়া ষ্টেশনে খবর দিলেন। অদ্ভুত কথা!

২০শে নভেম্বর ১৯৬০।

আজ লক্ষ্ণৌ হইতে পালভাই ও হরীশভাই মাতৃদর্শনে আসিয়াছেন। মা তাহাদের নিকট পণ্ডিতজীর সব কথা শুনিতে চাহিলেন। পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া, হরীশভাই বলিলেন যে শাণ্ডিলা হাসপাতালে গিয়া পণ্ডিতজীর শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বুঝিতেই পারেন নাই যে ইঁহারই হাত কাটিয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেছিলেন "পণ্ডিতজীকে দেখিয়াই প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইল। যুক্তকরে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেমন আছেন?' তিনি বলিলেন 'ভালই আছি।' মুখে কোনও রকম অশান্তির চিহ্নমাত্র নাই। কাশী যাইতে বিশেষ ইচ্ছা জানাইলেন। ইঁহার অদ্ভুত অবস্থার কথা শুনিয়া মা খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মা কেবলই বলিতেছেন— "সংসারী লোক! দেখ, কী সুন্দর অবস্থা! এই ভাগবতপাঠ যে ঠিক ঠিক ভাবে হইয়াছে এই তাহার প্রমাণ। প্রাণ নষ্ট হয় নাই। আর এমন সুন্দর মনের জোর। মনের জোরেই হার্ট নাড়ীর গতি সব ঠিক ঠিক ছিল। জ্বরও ছিল না।" হরীশ বাবুও অনেক প্রশংসা করিলেন।

এক সময়ে মা বলিলেন "দিদি! প্রাণগোপাল বাবু ও তাঁর স্ত্রীকে দেখলাম। যখন দেখা যায় তখনই একটি কুটিয়াতে দেখা যায়। সাধনের ভাবটা আর কি! এবার-ও তাই। তার কুটিয়ার বারান্দায় এই শরীরটা।" প্রাণগোপাল বাবু ঋষিতুল্য মানুষ ছিলেন। মায়ের নিকট প্রাণগোপাল বাবু প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—"ভীষ্মকে যেমন শরশয্যায় শ্রীগোবিন্দ দেখা দিয়েছিলেন, মাগো! সেই রকম শেষ সময়ে যেন তোমাকে দেখা পাই।" তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে মা তাঁহাকে দেখিতে দেওঘর গিয়াছিলেন।

২১শে নভেম্বর ১৯৬০।

আজ বিকালে মা ঘরে শুইয়া আছেন। আমি যাইতেই বলিলেন "দেখ দিদি! আজ বিকালে দেখিতেছি এই গোমতীতে একটি শিশুদেহ ভাসিয়া যাইতেছে, একটু দূরে গিয়াই ঐ দেহটি একটি কালো কুচ্‌কুচে বয়স্ক শরীরে পরিণত হইল। একটু পরেই আবার সেই শরীর একটি শূকরের রূপে পরিণত হইল, পরে আবার তখনই একটি মহিষের রূপে পরিণত হইয়া এই শরীরের দিকে ছুটিয়া আসিয়া শরীর ছুঁইতেই অন্যরূপ হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। আবার সকালে দেখিতেছি ঢাকার কেদার মাষ্টার ছিল না? তাহার ভাই অনাদি বাহির হইয়া গিয়াছিল তো? দেখিতেছি সাধুরূপে সে আসিয়াছে। আসিয়া পরিচয় দিতেছে 'আমি অনাদি।' জিজ্ঞাসা করা হইল—'তোমার বয়স কত?' বলিল '৮০ আর আড়াই,' বলিতেছে এখন সে বিবাহ করিতে চায়। তখন তুই বল্‌লি—'এই বয়সে বিবাহ?' সে বলিল 'দেখ মা! আমি যখন ঘরে ছিলাম তখন কিছু কর্জ্জ ছিল। এই মেয়েকে বিবাহ করিলে কিছু টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা দিয়া কর্জ্জ শোধ হইয়া যাইবে। এই জন্য বিবাহ করিতে চাই।' তখন

জিজ্ঞাসা করা হইল 'মেয়ের বয়স কত?' বলিল 'পঞ্চাশ আর পাঁচ'। আর ইহাও বলিল যে দুই জনেই প্রস্তুত। তখন বলা হইল—"বেশ; ভালবাসা যখন হইয়া গিয়াছে, তখন কর। কিন্তু এই কথা জানাইয়া দেও যে টাকার জন্যই বিবাহ। এই কাজ হইয়া গেলে আমরা দুই জনেই ত্যাগের ভাবে থাকিব। সে রাজি হইয়া চলিয়া গেল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'শিশুর দেহেরই বা কি অর্থ, আর ইহারই বা কি অর্থ?' মা বলিলেন "দেখ দিদি, এই স্থান ত! এই রকমই সাধুরা যে নানা দেহ ধারণ করিতে পারে তারই ঐ নমুনা। আর দ্বিতীয়টি হইল—ঐ অনাদির কর্জ্জ আর কোনও মেয়ের প্রতি ঐরূপ ভাব থাকা ত আশ্চর্য্য নয়। ঐটাই দেখা আর কি!"

আজ দুপুরে মা প্রকাশ করিলেন যে আগামী পরশু সীতাপুর রওনা হইবেন। প্রয়াগ নারায়ণের স্ত্রীকে বলিলেন "অখণ্ড রামায়ণ পাঠের কথা হইয়াছিল। তুমি কাল সীতাপুর গিয়া তোমার বাড়ীতে পাঠ আরম্ভ কর। এই শরীর আগামী পরশু সমাপ্তির সময়ে হয়তো পৌঁছাইয়া যাইবে। তোমার বাড়ীতে এখানে ত থাকাই হইল। শ্রীপাল সিং ওদের বাড়ীতে পরশু রাত্রে থাকিয়া পরদিন লক্ষ্ণৌ রওনা হইবার চেষ্টা কর।"

মায়ের যাওয়ার কথায় এখানকার সকলেই বিষাদিত হইয়া পড়িল।

২২শে নভেম্বর ১৯৬০।

আজও সকালে ও বিকালে অনেকেই মাতৃ দর্শনে আসিয়াছেন। সকলেই এখানে সংযম ও ভাগবত সপ্তাহের কথায় বলিতেছেন এমন সুন্দর ভাবে এইরূপ কাজ আর দেখি নাই। পান্নালালজীরাও এই কথারই সমর্থন করিলেন।

এখানে হনুমান টিলার উপর মা যে পুরাণ মন্দিরের কথা বলিয়াছিলেন তাহা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

প্রয়াগ নারায়ণের রোজ আসা-যাওয়াতে তাহার যদিও কোনও কষ্টের অনুভব নাই, কিন্তু মা বলিতেছেন "তুমি রোজ আসিও না, ঠাণ্ডার মধ্যে কষ্ট হয়!" সে কিছুতেই রাজি হয় না! অবশেষে প্রয়াগ নারায়ণ বলিল—"আচ্ছা, মা! আপনার আদেশ পালন করিব। এখানে আসিতে যদিও আমার খুবই আনন্দ, তবুও আপনি বলিতেছেন এই জন্য আমি কাল আর আসিব না।" সে ২০শে তারিখে আসিল না। সেই দিনই দুপুরবেলা মা সকলকে বলিলেন ২৩শে বুধবার রওনা হইবার কথা। ২১শে রাত্রিতে প্রয়াগ নারায়ণ আসিলেন এবং মা ২৩শে যাওয়া স্থির করিয়াছেন জানিয়া বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিলেন "আমি মায়ের আদেশ পালন করিয়া কাল আসিলাম না, ভাবিলাম মায়ের কথায় আমি রোজ না আসিলে যদি মা এখানে কিছু বেশীদিন থাকেন। কিন্তু এ কি হইল?" তিনি অনেক প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু মায়ের যাওয়া স্থির জানিয়া একটি প্রার্থনা জানাইলেন মা যেন এখানে বছরে অন্তত একবার আসেন ইত্যাদি।

মা একান্তে তাঁহাকে বলিলেন—"একটি কথা আছে।" আমাকেও বসিতে বলিলেন। তখন মা যাহা বলিলেন তাহা এই :—ভাগবত সপ্তাহে এবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পাঠ (এক একবার এক এক পুরাণ পাঠ) হইবে ও তাই পুরাণখানার খোঁজ করা হইল কিন্তু কোথাও পুরাণখানা পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে মোদীর স্ত্রী আসিয়া বলিল, "কি সেবা করিব?" মা বলিলেন "এই শরীরের সেবা তো? আচ্ছা—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এখানে পাওয়া যাইতেছে না। তাহা আনিবার ব্যবস্থা করো।" এদিকে পুরাণ এই রকম স্থানেও পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া মা অবধূতজীকে বলিলেন "তুমি এখানে পুরাণ রাখিবার ব্যবস্থা করো।" তখনই মোদী আসিয়া পড়িল। সে এবং আরও কেহ কেহ শুনিল মা একথা বলিয়াছেন। এদিকে ঘণ্টাখানেক

পরেই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ আসিয়া গেল। মা বলিতেছিলেন "দেখ, পূর্বে পাওয়া গেলে কিন্তু আর এইসব কথা হয় না। পুরাণরূপী ভগবানেরই হয়তো এই লীলা।" এই কথা শুনিয়া মোদী জিজ্ঞাসা করিল 'কোন্ স্থানে করা ?' মা বলিলেন, "ওসব কথা তোমরা জান। পুরাণ রাখিবার কথা হইয়াছে—তোমরা নারদানন্দজীর আশ্রমে রাখ কিম্বা প্রয়াগ নারায়ণের কুটিয়াতে রাখ, কিম্বা পাণ্ডাদের বাড়ীতে রাখ কিম্বা যেখানে তোমাদের ইচ্ছা রাখ।" কিন্তু ইহাতে উপস্থিত সকলের মত হইল না। বলিল যে অন্যস্থানে রাখিলে ভবিষ্যতে গোলমাল হইতে পারে। সকলেরই মত হইল একটা স্থান করা দরকার। স্থান কোথায় করা মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন, "এখানে সবচেয়ে উচ্চস্থান যেখানে সেইখানে রাখিতে চেষ্টা কর। এবার বন্যায় তোমাদের ইহাও জানাইয়া দিয়াছে যে সবচেয়ে উচ্চস্থান কোন্‌টা। আর জল সেখানে যাইবে না।" মা তখনও নৈমিষারণ্যের কোথাও বাহির হন নাই। পরে প্রয়াগ নারায়ণের কুটিয়ায় আসিয়া দেখিলেন হনুমান টিলা এবং শুনিলেন এখানে ইহাই সবচেয়ে উচ্চস্থান। তাই ওখানে জায়গা নিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এদিকে মা অবধূতজীকে বলিয়াছিলেন 'এখানে পুরাণ রাখিবার চেষ্টা করো।' অবধূতজী তো কিছু করেন নাই। তাই মা পূর্ণিমা তিথিতে ভাগবত-সপ্তাহ শেষ হইলে সেই রাত্রেই সৎসঙ্গের পরে প্যাণ্ডেলের একধারে অবধূতজী ও ভরতভাইকে ডাকিয়া নিয়া অবধূতজীকে বলিলেন 'তুমি এই পুরাণখানি ভরতের হাতে দাও।' অবধূতজী তাই দিলেন। ভরতকে মা একান্তে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—'আজ তো ভাগবত শেষ হইল। আগামীকল্য হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণখানি (যাহা অবধূতজীর হাত দিয়া দেওয়াইয়াছিলেন) রোজ এক লাইন হইলেও পড়িয়া প্রণাম করিয়া রাখিও।' ভরত তাহাই করিতে লাগিল। পুরাণ রাখিবার কথা মায়ের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, তাই পূর্ণ হইল।

এদিকে এক ঘটনা হইয়াছে। নৈমিষারণ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ না পাইয়া দেরাদূনে যোগেশদাকে লেখা হইয়াছিল আশ্রম হইতে যেন ঐ পুরাণখানি লইয়া আসেন। কিছুদিন পূর্ব্বে অনেকগুলি পুরাণ আনাইয়া দেরাদূন আশ্রমে রাখা হইয়াছিল। যোগেশদা বই খুলিয়া ভাল করিয়া না দেখিয়াই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নিয়া আসিয়া উপস্থিত। সেই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই ভরতভাই পাঠ আরম্ভ করিল। মা এইসব কথা প্রয়াগ নারায়ণকে শুনাইয়া বলিলেন "অবধূতজী বলিয়াছেন প্রয়াগ নারায়ণজীর কাছে রাখিয়া গেলে তিনি সব করিবেন। তাই তোমার কাছে সব বলা হইল।"

প্রয়াগ নারায়ণের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় স্থির হইল মা কাল এখান হইতে খাওয়া দাওয়ার পর রওনা হইবেন; সকালবেলা ৯টার সময়ে স্থানীয় একজন পণ্ডিত পাঠ আরম্ভ করিবেন এবং প্রত্যহ তিনিই পাঠ করিবেন। আপাততঃ মায়ের কুটিয়াতেই একটি দেওয়াল-আলমারিতে ভাগবত থাকিবে; পরে অন্য স্থান হইলে সেখানে নিয়া যাওয়া হইবে। প্রয়াগ নারায়ণ তাই খুবই আনন্দের সহিত এই সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন। ইনি বড়োই ভক্তপ্রাণ, সাধুসেবা-পরায়ণ। মা চলিয়া যাইবেন শুনিয়া পতি-পত্নী চোখের জল ফেলিতে লাগিল। ইহার বৃদ্ধা মাতা-ও কয়েকদিন এখানে ছিলেন। যাইবার সময়ে তিনিও মায়ের জন্য চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। মা-ও তাঁহার স্বভাব-সুলভ মিষ্ট ভাষায় বলিলেন "মা! এই তো তোমার মেয়ে। মেয়েটাকে জঙ্গলে রাখিয়া কোথায় যাইতেছ?" মায়ের এই কথায় বৃদ্ধার কান্না আরও বাড়িয়া গেল। আমি বলিলাম—"মায়ের তো এই, কাহাকেও না কাঁদাইয়া যাইবেন না।"

২৩শে নভেম্বর ১৯৬০।

আজ আমাদের সীতাপুর রওনা হওয়া স্থির হইয়াছে। বেলা প্রায় ১১টায়

শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়া মাতৃদর্শনে আসিয়া উপস্থিত। পূর্ব্বে আমাদের খবর ছিল না। যাক্ আমাদের সকলের বেশ আনন্দ হইল। সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হইল। মায়ের কুটিয়ায় বসিয়া মায়ের সঙ্গে ব্রহ্মচারীজী কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। আমরা খবর পাই নাই এই কথায় তাঁহার শিষ্যরা কেহ কেহ মাকে বলিল—'মা! আপনি তো অন্তর্যামী, আপনাকে খবর দেওয়ার দরকার কী?' তাহাদের এই কথায় ব্রহ্মচারীজীও যোগ দেওয়ায় মা হাসিয়া বলিলেন 'বাবা! তুমিও এই কথা বলো?' তিনি বলিলেন 'হাঁ, ঠিকই তো! তুমি তো সবই জান!' তখন মা বলিলেন 'বাবা! লৌকিক জগতে অলৌকিকত্বের দাবী করিতে নাই।' ব্রহ্মচারীজী—'এও তো লৌকিক!' মা—'বাবা! অন্তর্যামিত্ব লৌকিক? কি রকম বাবা?' এমন ভাবে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরে ব্রহ্মচারীজী বলিলেন, 'সবই তো এক'। তখন মা হাসিয়া বলিলেন, 'বাবা এখন জবাব দিতে না পারিয়া এই কথা বলিতেছে!'

একটু পরে বারান্দায় গিয়া সকলে বসিলেন। ব্রহ্মচারীজীর শিষ্যশিষ্যাগণও বসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন 'আচ্ছা, কোনও কোনও গুরু শিষ্যদের প্রহার পর্য্যন্ত করে; কোন্‌টা ঠিক—প্রহার করিয়া শাসন করা, অথবা মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া দেওয়া?' এই কথায় ব্রহ্মচারীজী বলিলেন 'যে শিষ্য বিশেষ শ্রদ্ধালু, তাহাকে প্রহার করা যায়।' এইভাবে কিছুক্ষণ কথা চলিল। ব্রহ্মচারীজী বলিতেছেন সাম, দান, ভেদ, দণ্ড। এই প্রসঙ্গে মা ব্রহ্মচারীজীকে প্রশ্ন করিলেন—'বাবা! এই কথা কি শিষ্যদের পক্ষেও?' তিনি বলিলেন 'হাঁ'। আবার মা প্রশ্ন করিলেন, তিনিও ঐরূপই জবাব দিলেন? মা আর কিছু বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারীজী নিজ হইতেই বলিলেন 'সাম দান এইসব রাজনীতির কথা।' তখন মা হাসিয়া বলিলেন,—'বাবা! এইজন্যই দুইবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। শিষ্যরা সব বসিয়া আছে সেইজন্য আর কিছু বলা হয় নাই।'

তারপর অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল। শুনিলাম ব্রহ্মচারীজী ভাত খান না, দুধ, ফল, মিষ্টি এই সবই আহার করেন। কিন্তু মায়ের কাছে এক সঙ্গে একটি কুটিয়াতে খাওয়ার জায়গা করিয়া দেওয়া হইল, একটু ভাতও নিলেন। তাঁহার জায়গা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনিই বলিলেন মাকে ওখানেই খাবার জায়গা করিয়া দিতে। মা ও ব্রহ্মচারীজী কুটিয়াতে আহারে বসিলেন। এদিকে শিষ্য ও শিষ্যাদের অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বাঁধানো জায়গাতে আসন করিয়া দেওয়া হইল। সকলে কিছুক্ষণ মহা আনন্দে কাটাইয়া বৈকালে তাঁহারা লক্ষ্ণৌ রওনা হইলেন। যাইবার সময়ে তাঁহারা মায়ের ও ব্রহ্মচারীজীর ফটো তুলিয়া নিলেন। মা শিষ্যদের বলিলেন—'বাবাকে এই শরীর বহুকাল দেখিতেছে। প্রথম যখন দেখা হয় বাবার অল্প বয়স। তাই খোলাভাবে কথাবার্ত্তা বলা হইয়া যায়।'

যাইবার সময়ে মা ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সঙ্গে মোটর অবধি গেলেন। তাঁহারা সকলে বলিলেন 'খুবই আনন্দ। মায়ের কাছে খানিক সময় কাটাইয়া যাওয়া হইল। এতো আনন্দ হইল কী বলিব!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রায় ৪টায় আমরাও রওনা হইলাম। সীতাপুরে আসিয়া প্রথমে প্রয়াগ নারায়ণের বাড়ীতে যাওয়া হইল। তাঁহারা গতকাল অখণ্ড রামায়ণ আরম্ভ করিয়াছেন, আজ মা পৌঁছিলে উদ্‌যাপন হইবার কথা। ভয়ঙ্কর ভীড়। কোনও প্রকারে মাকে নিয়া একটু ভিতরে চৌকীর উপরে বসানো হইল। তাহারা মায়ের আরতি করিল। কিন্তু এতো ভীড় যে মায়ের আর বসিবার উপায় নাই। অবস্থা দেখিয়া মা বলিলেন 'এখন যাই, পরে এক সময়ে দেখা যাইবে।' তাহারাও অবস্থা দেখিয়া বাধা দিতে পারিল না।

মাকে শ্রীপাল সিংহের বাড়ীতে নিয়া যাওয়া হইল। বহু বৎসর পূর্ব্বে তথায় মায়ের জন্য ঘর তৈয়ার হইয়াছিল। মা তাহাতে পূর্ব্বে থাকিয়া গিয়াছেন। এবার বন্যা আসাতে ঘরে জল উঠিয়াছিল। ভয়ানক ভিজা ও ঠাণ্ডা। বাহিরে সামিয়ানা লাগানো হইয়াছিল। মাকে সামিয়ানার নীচে

কিছুক্ষণ বসানো হইল। পরে কুটিয়ায় নিয়া যাওয়া হইল। জলে ডুবিয়াছিল বলিয়া সে-ঘর ভিজা ও ঠাণ্ডা ভয়ানক, কিন্তু করুণাময়ী মা ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাতেই রহিলেন। যথাসম্ভব ঢাকিয়া দেওয়া হইল।

২৪শে নভেম্বর ১৯৬০।

এখানকার চোখের হাসপাতালে মাকে নিয়া গেল। সেই হাসপাতালের ডাক্তার দুইবার নৈমিষারণ্যে গিয়া মাতৃদর্শন করিয়াছিলেন এবং মাকে তাঁহাদের সীতাপুরের হাসপাতালে একবার যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এখন বিশেষ আগ্রহ করিয়া তাঁহারা মাকে হাসপাতালে নিয়া গেলেন। ডাক্তার বলিলেন, 'মা! প্রথমে যখন এই হাসপাতাল খুবই ছোট ছিল তখন একবার আপনাকে নিয়া আসিয়াছিলাম। আপনার আশীর্ব্বাদে এখন তাহা কতো বড়ো হইয়াছে ইহাই আপনাকে দেখাইবার ইচ্ছা।' বিশেষভাবে অভ্যর্থনাদি করিয়া হাসপাতালে মাকে একটি খোলা জায়গাতে বসাইল। দেখিলাম পণ্ডিতগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিলাম আজ একটি প্রস্তর ফলক লাগানো হইবে। সেই প্রস্তরে কী লেখা থাকিবে তাহা পান্নালালজীকে এবং আমাদিগকে দেখাইল। তাহার মর্ম্মার্থ এই—"আজ এই তারিখে প্রস্তর ফলক লাগাইবার কার্য্যে আমরা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আশীর্ব্বাদ পাইলাম।"

অন্ধরা আসন, কাপড়, ফিতা ইত্যাদি তৈয়ার করিতেছে—মাকে তাহা সব দেখাইল। মাকে দুখানি আসন দিল। প্রস্তর ফলকখানি লাগাইবার সময়ে আমার হাত দিয়া প্রথমে ফুল দেওয়াইল। পরে সকলে দিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল মায়ের হাত দিয়া স্থাপনা হয়; কিন্তু মা এসব কিছু

করেন না শুনিয়া তাহারাই করিল। হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া বেলা প্রায় ১টায় মা আমাদের নিয়া লক্ষ্ণৌ রওনা হইলেন।

পূর্ব্ব কথামতো প্রভাতবাবুর বিশেষ প্রার্থনায় মা প্রথমে প্রভাতবাবুর বাড়ীতে উঠিলেন। তিনি মায়ের জন্য তিন তলায় ঘর করিয়াছিলেন। সেই ঘরে মাকে নিবেন এই বাসনা। মা আসিতেই শঙ্খ বাজাইয়া মাকে অভ্যর্থনা করা হইল। মঙ্গলঘট ও কলাগাছ দরজায় দরজায় বসানো হইয়াছে। তাঁহারা কতোই না আগ্রহে মাকে ঘরে নিয়া গেলেন। সুন্দর কোঠাখানি। খাট বিছানা ফুল দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মের একখানি ছবি ও পূজার জিনিসপত্র সব সাজানো দেখিলাম। এই ঘরখানিতে রোজ পূজা করিবেন বলিলেন।

২৫শে নভেম্বর ১৯৬০।

আজ দুপুরে এখানেই মায়ের ভোগের পর সকলে প্রসাদ পাইলেন। বৈকালে হরিশ বাবুর বাড়ী যাওয়া হইল। তাঁহারা অনেক দিন হইতে মাকে একবার বাড়ীতে নিতে চাহিয়াছিলেন। প্যাণ্ডেল করিয়া তাঁহারা বেশ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেখানে কীর্ত্তনাদি হইল। লীলা ও রামেশ্বর ভাই বিশেষ অনুরোধ করিয়া মাকে সাত দিন লক্ষ্ণৌতে রাখিলেন। সন্ন্যাসিনী সর্ব্বানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়ায় নৈমিষারণ্য হইতেই তাহাকে লীলার কাছে পাঠানো হইয়াছিল। লীলা ডাক্তারের পরামর্শে তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করাইয়াছে। লীলা খুবই তাহার সেবা করিয়াছে—বিশেষতঃ সর্ব্বানন্দ মায়ের নিকট হইতে আসিয়াছে বলিয়া।

মা লক্ষ্ণৌ আসিয়াই হাসপাতালে সর্ব্বানন্দকে দেখিতে গেলেন।

শুনিলেন সে নিজের হাত দিয়া খাইতে পারে না, লীলা তাহাকে খাওয়াইয়া দেয়। তাহার হার্টের দোষ ও মনের কম-জোর। মা খেয়াল করিয়া তাহার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিলেন যাহার ফলে সে নিজের হাতে খাইল (খাবার নিয়া যাওয়া হইয়াছিল)। শোনা গেল সে হাত পর্য্যন্ত নাড়িতে পারে না। কিন্তু মা এমন কথা বলিতে লাগিলেন, যে সে বেশ উঠিয়া বসিল। মায়ের সঙ্গে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইল। মা বলিলেন—'ডাক্তার যখন বলিবে'। ডাক্তারও দুইজন কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। রোগীর সঙ্গে মায়ের এই ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারা খুব খুশী। মা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন 'আপনি যাহা করিতেছেন ইহা খুবই ঠিক।' শুনিলাম তাঁহারাও মনে করিতেছিলেন রোগীর মনের জোরের অভাব। পরদিন মা হাসপাতালে নানা রকম খাবার জিনিস পাঠাইয়া দিলেন। বিম্বো ও চিন্ময়ানন্দকে দিয়া খাবার পাঠাইয়া মা তাহাদিগকে বলিলেন—'তোমরা বলিবে মা বলিয়াছেন নীচে নামিয়া হাত দিয়া খাইবে।' শুনিলাম সে তাহাই করিতে পারিয়াছে। আগের দিনও সে নড়িতেই পারিতেছিল না। মা নানা রকম কথা বলিয়া তাহাকে এই অবস্থায় আনিয়াছেন। অনেকেই অবাক হইতে লাগিল। দুই/চার দিন পরে ডাক্তার তাহাকে ছাড়িয়া দিল। মা, তাহাকে দেরাদুন পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে মেয়েরা অনেকেই আছে। মা তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন ইহার একটু সেবাদি করিতে। কাহারও জন্য মায়ের যত্নের ত্রুটি নাই।

২রা ডিসেম্বর ১৯৬০।

আজ আমরা মায়ের সঙ্গে সকালে দেরাদূন এক্‌স্‌প্রেসে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ৩টায় কাশী পৌঁছিলাম। কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীর সামনে

গাড়ী দাঁড় করাইয়া, মা তাঁহাকে দর্শন দিয়া আশ্রমে চলিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের শরীর ভাল নয়। পায়ে খুব বাতের ব্যথা। মা বলিলেন—'আজ আর সন্ধ্যায় আশ্রমে যাইও না ; শরীর তো ভাল নয়'। তিনি সে কথায় বলিলেন 'না না যাবো ; না গেলে মনটা ভাল লাগে না।' তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া মা আর কিছু বলিলেন না। কালীদারও শরীর খারাপ ; জ্বর চলিতেছে। তিনিও মাতৃদর্শনে আসিতে পারিতেছেন না বলিয়া দুঃখিত। মায়ের জন্য মালা ইত্যাদি পাঠাইয়া দিতেছেন। রোজই প্রায় ধীরঞ্জনকে পাঠাইয়া দেন, মায়ের খবর নিবার জন্য। মায়ের ৬।১২ তারিখে রাজগীর রওনা হইবার কথা ছিল। কিন্তু কালীদা প্রার্থনা জানাইলেন আরও একদিন থাকিবার জন্য। তাই ৭।১২ যাত্রার দিন স্থির হইল।

৭ই ডিসেম্বর ১৯৬০।

আজ বেলা প্রায় ১২টায় মায়ের সঙ্গে রাজগীর রওনা হইলাম। পাটনা হইতে আমার ছোটবোন উষা বউ গোপাকে নিয়া মায়ের সঙ্গে রাজগীর রওনা হইল। বক্তিয়ারপুরে সব ব্যবস্থা ছিল। সেখান হইতে মাকে এবং অন্য সকলকে মোটরে রাজগীর আনা হইল।

রাজগীরের আশ্রমটি ছোট্ট। আমাদের সঙ্গে লোক ও জিনিসপত্র কম নয়। প্রথমে দেখিলেই মনে হয় কী করিয়া ইহার মধ্যে জায়গা হইবে। কিন্তু মা দাঁড়াইয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মায়ের সুব্যবস্থায় অতি সুন্দরভাবে সব মানুষ ও জিনিসের স্থান হইয়া গেল। এখানে উপেন

মহারাজ থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বেই প্রকাশানন্দ, কেশবানন্দ ও আরও দুই/এক জনকে মা এখানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। জগদীশ পাণ্ডার ছেলে কেশুও এখন এদিকে ভাল পোষ্টে আছে। সে বক্তিয়ারপুর হইতে মাকে আনিবার জন্য মোটর নিয়া তথায় উপস্থিত ছিল।

১২ই ডিসেম্বর ১৯৬০।

পান্নালালজীও মায়ের নিকট আসিয়াছেন। মায়ের সঙ্গেই কিছুদিন থাকিবেন। অনিল ও সতী ২/৪ দিনের জন্য আসিয়াছে। তাহারা একটু সুযোগ পাইলেই মায়ের দর্শনের জন্য ছুটিয়া আসে। উভয়েরই বড় সুন্দর ভক্তি ভাবটি।

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৬০।

আজ সকালে উঠিয়াই মা বলিলেন "কাঁদা কাঁদা ভাবটা দেখিতেছি। দেখ কোথা হইতে কী আবার খবর আসে।" কিছু পরেই টেলিগ্রাম আসিল উপেন মহারাজের বড় ভাই মারা গিয়াছে। তখন আমাদের কথা হইল—এই মা দেখিয়াছিলেন।

মায়ের শরীর ভাল যাইতেছে না। মাথার শব্দটা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। হজমেরও গোলমাল চলিতেছে। একটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সেই দিন কথায় কথায় টিহরী রাজাদের যে বদ্রীনাথজীর জন্য

তৈল তৈয়ার করিয়া দিবার প্রথা আছে, সেই সব কথা মা কাহারও কাহারও কাছে বলিতেছিলেন। মায়ের জন্য যে এখন তাহারা সেই তৈল হইতে এ কয় বছর যাবৎ কিছু কিছু তৈল পাঠাইতেছেন তাহাও বলিয়া কথায় কথায় মা বলিয়া ফেলিলেন—"সেই হইতেই মাথার শব্দটা। ইহা না হইলে মাথায় যে সামান্য একটু তৈল দেওয়া তাহাও হইত না।" বলিয়া একটু হাসিলেন। আমরা এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কি জানি কি জন্য মায়ের কী হয়। যাক্ এখানে বিশ্রাম হইতেছে। কতোদিন এখানে থাকা হইবে ঠিক নাই। আগামীকল্য শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় আসিতেছেন।

২০শে ডিসেম্বর ১৯৬০।

আজ কবিরাজ মহাশয়ের আগ্রহে মা কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া গৃধ্রকূট বেড়াইয়া আসিলেন। কবিরাজজী বলিতেছিলেন যে মায়ের কাছে আসিলেই তাঁহার এদিক ওদিক একটু দেখাশুনা হয়। মা-ই তাঁহাকে মাঝে মাঝে টানিয়া আনেন।

গৃধ্রকূট এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে। মোটরে গিয়া পরে মাকে ডুলি করিয়া নিয়া গেল। মায়ের সঙ্গে প্রায় ৩০।৩৫ জন ছিল। এই স্থানটি বুদ্ধদেবের জীবনের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। মা সেখানে গিয়া একটু সময় বসিলেন। কবিরাজ মহাশয় সেখানে সকলের অনুরোধে প্রজ্ঞা পারমিতা সম্বন্ধে কিছু সময় বলিলেন। স্থানটি খুবই একান্ত। পরে ফিরিবার সময় মা কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া রথচক্রের দ্বার দেখিয়া সকলকে লইয়া কুম্ভে স্নান করিয়া ফিরিলেন।

২৩শে ডিসেম্বর ১৯৬০।

এখানে প্রায় ষোল দিন থাকিয়া মা আগামীকাল কলিকাতা রওনা হইতেছেন। কলিকাতার ভক্তরা মাকে বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাইয়াছে মা যাহাতে কয়েকটি দিন সেখানে থাকেন। কলিকাতা হইতে অনিল গাঙ্গুলি আসিয়াছিল। সে আজ বিকালে কলিকাতা ফিরিয়া গেল। তাহার সঙ্গে কুসুম ব্রহ্মচারী ও আরও দুইজন চলিয়া গেল।

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬০।

কাল সন্ধ্যায় দিল্লী এক্স্‌প্রেসে পাটনা হইয়া আজ বেলা ৭॥০ টায় কলিকাতায় পৌঁছিলাম। সকলেই আগড়পাড়া আশ্রমে আসিলেন। রাস্তা হইতে মায়ের খেয়াল হইল—গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মেয়ে জ্যোতি, বিনয় সেন, কানু বসু এবং সুরেন ব্যানার্জিকে দেখিয়া আসিবেন। ইঁহারা সকলেই অসুস্থ এবং আশ্রমে আসিয়া মাতৃদর্শন করিতে অক্ষম; ইঁহারা মাতৃদর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাই মা কৃপা করিয়া সকলকে দর্শন দিয়া আনন্দ দান করিয়া আসিলেম।

মায়ের শরীর ঠিক নাই। অথচ যতক্ষণ সম্ভব সকলকে আনন্দ দিয়াই যাইতেছেন। নিজের শরীরের দিকে দেখিবার সময় কোথায়? সেই ভাবই নাই।

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৬০।

আজ সন্ধ্যায় মা সকলকে নিয়া আগড়পাড়া আশ্রমের উপরের হল-ঘরে বসিয়াছেন। নৈমিষারণ্যের পুরাণ সম্বন্ধে যাহা কথা হইয়াছিল তাহা

বলিলেন। সকলেই আনন্দ পাইলেন। নৈমিষারণ্যের সৎসঙ্গে সাধুদের প্রবচন মায়ের আদেশে মেশিনে উঠানো হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহা সকলকে শোনানো হইতেছে। মা হাসিয়া বলিলেন—'নৈমিষারণ্যের সৎসঙ্গের এইটুকু আনা হইয়াছে।'

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৬০।

আজ মা বিনয়দার (বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়) বাড়ীতে আসিলেন। এখানেই ভোগ হইবে। বিনয়দার বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপে মা বসিয়াছেন। স্বয়ং মা চণ্ডী যেন নিজ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া পূজা হইল। পূজান্তে ভাগবত পাঠ হইতেছিল। ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। বুনি আসিয়া মাল খোঁজ করাতে দেখা গেল মায়ের সব জিনিষের মধ্যে একটি জিনিস নিখোঁজ—একটি বেতের বাক্স, তাহার মধ্যে ভর্ত্তি ছিল রূপার বাসন ও অন্যান্য ছোটখাট দ্রব্যাদি। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়িয়া গেল। কয়েকজন বাহির হইয়া পড়িলেন বাস্‌কেটের সন্ধানে। কোথায় গেল সেই ট্যাক্সি যাহাতে আছে সেই বাস্‌কেট? সকলের মুখে যেন একটু লজ্জিত ও অপ্রস্তুত ভাব। জম-জমাট সৎসঙ্গের মধ্যে মা এই সংবাদে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং বলিলেন—'ঠাকুর! তোমার জিনিস তুমি গ্রহণ করো। যদি না পাওয়া যায় খুব ভাল, ঠাকুর!' আশাতীত ভাবে আধঘন্টার ভিতরে ট্যাক্সিওয়ালা হারানো জিনিসটি লইয়া হাজির। সকলে স্বস্তির শ্বাস ফেলিল। লীলাময়ী মা ড্রাইভারকে ডাকিয়া তাহাকে দিলেন সব-চেয়ে-বড়ো রূপার বাটিটি এবং নিজের মাথার তোয়ালেখানি। ড্রাইভারের মনে কি এক

ভাবের উদয় হইল। সে এসব জাগতিক তুচ্ছ জিনিস গ্রহণ করিতে নারাজ। ইহাও মায়ের খেলা। ড্রাইভার মাকে বলিল—"ইহ চীজ্ নহী চাহিয়ে। দেনা হো তো আসলী চীজ দীজিয়ে।" কিন্তু মা বুঝাইয়া ড্রাইভারকে বলিলেন—'তুমি এই বাটিতে গুরু নানককে ভোগ দিও, আর এই তোয়ালে দিয়ে প্রসাদ ঢেকে দিও।' তখন সে বাটি, তোয়ালে, সন্দেশ ও কমলালেবু লইতে রাজী হইল।

সন্ধ্যাবেলা মা কয়েকজনের বাড়ী ঘুরিয়া, নিউ আলিপুরে মাখনদার বাড়ীতে গেলেন। সেখানে মৌন পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ হইল। তার পরে কোনও কোনও ভক্তের বাড়ীতে পদধূলি দিয়া মা আসিলেন টালিগঞ্জে কনকদার বাড়ীতে। রাত্রিতে মা সেইখানেই রহিলেন, সঙ্গে মাত্র দুইটি মেয়ে। আমরা সকলে আগড়পাড়া চলিয়া আসিলাম।

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬০।

আজ মায়ের ভোগ হইল কনকদার বাড়ীতে। সৎসঙ্গ বেশ জমজমাট ভাবে হইল। ভক্ত সমাগমও কম হয় নাই। আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া মা চারটা/সাড়ে চারটার সময় অমল সেন (গিনির বাবা) ও মোরারজীর বাড়ী ঘুরিয়া, গঙ্গাচরণ বাবুর বাড়ীতে জ্যোতিকে দেখা দিলেন এবং তারপর ভবানীর বাড়ীতে গেলেন। সেখানে মা পঞ্চবটীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটু বসিলেন এবং মৌন পর্য্যন্ত প্রোগ্রাম চলিল। মায়ের পূজা ভোগ ইত্যাদি সব কিছু সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হইল। মৌনের পর শোভাবাজারে জগন্নাথ বাবুর নূতন বাড়ীতে পদধূলি দিয়া মা আগড়পাড়ায় চলিয়া আসিলেন।

এখানে কয়েকদিন থাকিবার কথা হইয়াছে। কুসুমভাই মাখনভাই বিশেষ অনুরোধ করিতেছে। একদিন গিনির বোন্ রুবি ও তার স্বামী বিশ্বনাথ আসিয়া মাকে বলিল বিশ্বনাথ নাকি স্বপ্নে দেখিয়াছে মা তাহাকে বলিতেছেন—'আমার পূজা কর।' সে কিন্তু পূজা ইত্যাদির মধ্যেই নাই, কোনও দিন কোনও পূজা করেও নাই। যাক্ মায়ের যেমন স্বভাব—মা তখনই বলিলেন—'মন্দিরে শিব আছেন, তুমি একদিন আসিয়া শিবের পূজা কর।' তাহারা বলে মায়ের পূজা করিবে। মা বলিলেন—"ভগবান-ই তো! সকলের মধ্যেই তো তিনি। যেরূপে যখন যাহাকে দর্শন দেন, সবই তো এক।" আজ কাল তো প্রায় কাহারও খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির বিচার নাই, তাই মা বলিলেন—"পূজা করিবার পূর্ব্বদিন সংযম করিয়া একবেলা নিরামিষ ভোজন করিবে, মন্ত্রদ্বারা গঙ্গাস্নান করিবে এবং পঞ্চগব্য খাইবে। পরদিন গঙ্গাস্নান করিয়া পূজা করিবে।" তাহাই হইল। কুসুম পূজা করাইল। পরদিন আবার তাহারা মায়ের পূজা করিল। বলিল "মায়ের কথায় শিবের পূজা করিলাম। কিন্তু স্বপ্নে দেখিয়াছি, তাই মাতৃপূজা করিব-ই।" অনেকেই —যাহারা পূজার দিকেও যায় নাই এমন অনেকেও—মায়ের নির্দ্দেশমত নিয়মে শিবের পূজা করিতে চাহিলে কুসুমকে দিয়াই তাহাদের পূজা করাইয়া দিলেন। এই ভাবে শিবের পূজা হইতে লাগিল। মা এইবার এই নিয়ম করিলেন। মাখনভাই, তপনের দাদামহাশয়, আরও অনেকেই এই ভাবে পূজা করিলেন। বাবা ভোলানাথের মূর্ত্তি যে-ঘরে, সেই ঘরেই তিনটি শিব স্থাপিত। রেখা একদিন স্বপ্নে দেখিল ভোলানাথের গলায় সোনার সাপ ইত্যাদি ইত্যাদি।

যূথিকা ভোলানাথজীর শিষ্যা। সে আজ গুরুপূজা করিল। কেহ কেহ শিবপূজা করিলেন। মা মন্দিরে থাকিয়া সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিতেছেন। কীর্ত্তনও চলিতে লাগিল।

কথা হইয়াছে মা ১১।১।৬১ তারিখে তুফানে বেলা প্রায় দশটার সময়ে কাশী রওনা হইবেন। মায়ের শরীর ভাল নয়। তবুও সকলের আনন্দের জন্য মায়ের বিশ্রাম কম-ই হইতেছে। মাকে দর্শন করিতে, মায়ের সঙ্গে 'প্রাইভেট' করিতে লোক আসিতেছে অনবরত—সময় নাই, অসময় নাই। মা যথাসম্ভব সকলের বাসনা পূর্ণ করিতেছেন।

———০———